একাত্তরের রক্তাক্ত চরবাড়ীয়া

আলহাজ্ব আবদুল মন্নান

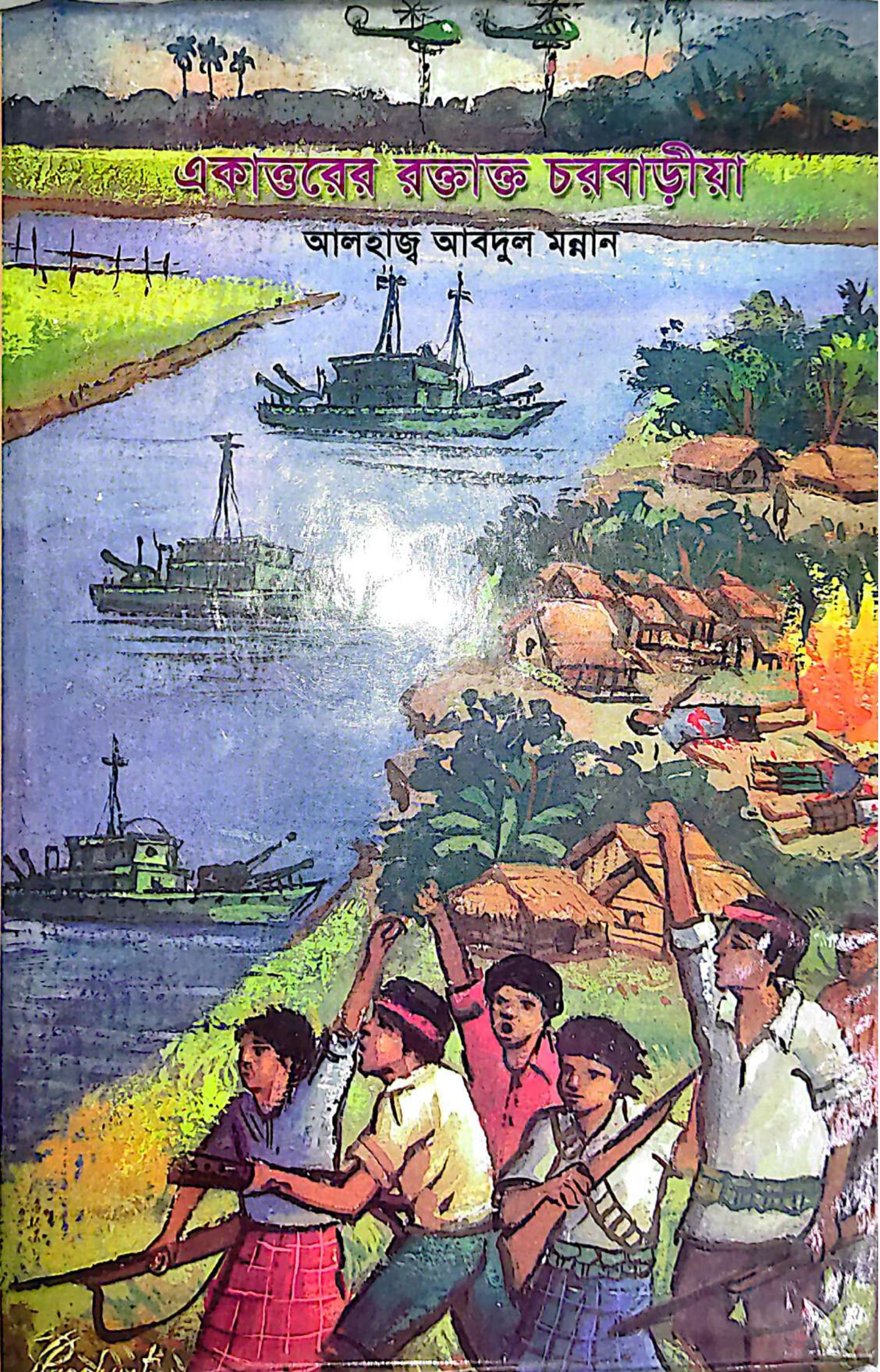

একাত্তরের রক্তাক্ত চরবাড়ীয়া

আলহাজ্ব আবদুল মন্নান

একাত্তরের রক্তাক্ত চরবাড়ীয়া

আলহাজ্ব আবদুল মন্নান

প্রকাশ কাল
১৬ই ডিসেম্বর ১৯৯৮ ইং
২রা পৌষ ১৪০৫ বাং

প্রকাশক
আলমতাজ
শায়েস্তাবাদ সড়ক,
তালতালী, চরবাড়ীয়া, বরিশাল

গ্রন্থ স্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়
লেখক কর্তৃক অলংকৃত
প্রদ্যুৎ কর্তৃক অংকিত

কম্পোজ
লেখক নিজে

মুদ্রণে
মুন্‌শী প্রেস এন্ড পাবলিকেশন
সদর রোড, বরিশাল

মূল্যঃ ১৩০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থানঃ

- বুকভিলা, সদর রোড, বরিশাল।
- অরিয়েন্টাল বুক ডিপো, ৩৬ সদর রোড, বরিশাল।
- বুকভিউ, ১৪৫ নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫।
- সজল মেডিকেল হল, শায়েস্তাবাদ সড়ক, তালতলী, বরিশাল।

উৎসর্গ

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য জীবন দিয়েছেন এদেশেরই জানা-অজানা অসংখ্য মানুষ। সামাজিক বা রাজনৈতিক কোন্দলের কারণে আজ অবহেলিত সে দেশপ্রেমিকদের আত্মাহুতির ইতিহাস ধরে রাখতে পারছে না। পাকবাহিনীর বর্বর হামলায় ২৫শে এপ্রিল ১৯৭১ সালে চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের জনগণ আত্মোৎসর্গ করেছেন। তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে, তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

- লেখক

সূচীপত্র

১. মুক্তিযুদ্ধ ও শহীদদের প্রেক্ষাপটে কিছু কথা ১৩

২. মগ, পর্তুগীজদের অত্যাচারে চরবাড়ীয়া ১৮

৩. প্রাচীন আমল থেকে গ্রাম্য কৃষক ও স্বাধীনতা সংগ্রাম ২৩

৪. ব্রিটিশ, ভারত, পাকিস্তান ৩১

৫. ৭০-এর নির্বাচন ও প্রাসঙ্গিক কথা ৪২

৬. ঘটনাবহুল মার্চ ১৯৭১ ৪৬

৭. স্বাধীনতাযুদ্ধ ঘোষণা ও মুজিবনগর সরকার ৫৬

৮. রক্তাক্ত চরবাড়ীয়া ৬২

৯. ২৬শে এপ্রিল '৭১ হতে বরিশাল ৭৫

১০. বরিশাল মুক্ত ও পাকসেনাদের আত্মসমর্পণ ৮২

১১. ২৫শে এপ্রিল '৭১-এর শহীদ, আহত ও ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকা ৮৮

১২. নবম সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা ১০২

১৩. স্বাধীনতাযুদ্ধে বীরত্বসূচক পুরস্কার ১১৮

১৪. চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃত ও রাজনীতি ১২২

তথ্যপুঞ্জী

১. বরিশালের ইতিহাস (১মও ২য় খন্ড) - জনাব সিরাজউদ্দিন আহমেদ

২. বাখেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস- জনাব মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন

৩. আমি বিজয় দেখেছি- জনাব এম.আর. আক্তার মুকুল

৪. ঐতিহ্যবাহী বরিশাল- জনাব টি.এম. জালাল উদ্দীন

৫. স্মরণিকা- জনাব আরজ আলী মাতুব্বর

৬ আনন্দাকাশ -২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা (বরিশাল)

৭. দৈনিক জনকণ্ঠের বিভিন্ন সংখ্যা

৮. ৯ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্মিলনী '৯৮-এর স্মরণিকা

৯. চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন স্তরের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎকার

"মুখবন্ধ"

আলহাজ্ব আবদুল মন্নান রচিত "একাত্তরের রক্তাক্ত চরবাড়ীয়া"-এর পান্ডুলিপি পাঠ করে আমি আনন্দিত। সল্প পরিসরে স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পরিচিতি তুলে ধরা সহজ সাধ্য নয়। কিন্তু তিনি তা করার চেষ্টা করেছেন এজন্য ধন্যবাদের দাবীদার। ইতোমধ্যে সেক্টর ও জেলাভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচিত হয়েছে কিন্তু ইউনিয়ন ভিত্তিক লেখা এটাই মনে হয় প্রথম।

নব্বই শতাংশ গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে অত্যাচার, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে, বিশেষ করে নদীর তীরবর্তী বাসিন্দাদেরকে। ২৫শে এপ্রিল ১৯৭১ সালে তালতলী নদীর তীরে বসবাসরত চরবাড়ীয়ার দেশপ্রেমিক সর্বস্তরের মানুষ জীবন দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যে অবদান রেখেছেন সেটাই লেখার মূল বিষয়। এ বই হাতে নিলে বোঝা যাবে যে, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়ই সীমাবদ্ধ রাখেন নি লেখক। পটভূমিরূপে এতে উপস্থিত হয়েছে মগ, পর্তুগীজদের অত্যাচার ও প্রাচীন আমল থেকে কৃষক আন্দোলনসহ ব্রিটিশ-ভারত শাসনামলে বাংলার প্রেক্ষাপট।

আলহাজ্ব আবদুল মন্নান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেছেন। এ বিষয়ে লেখার অধিকার তাঁর আছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িত থেকে, যুদ্ধের প্রথম ভাগেই হারিয়েছেন পিতা, পিতামহসহ বহু আত্মীয়-স্বজন। ইতিহাসের পাতায় তাঁদেরকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন তাঁর লেখনির মাধ্যমে।

এই জনপদ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর দূর্বলতা থাকায় প্রচুর পরিশ্রম করে এসব তথ্য সংগ্রহ করে এ বইটি লিখতে সক্ষম হয়েছেন। লেখাদৃষ্টে মনে হয় লেখকের রয়েছে নিজ এলাকার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা বিধায় ইউনিয়নের দূর্লভ তথ্যবহুল শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে তুলে ধরেছেন। অত্যন্ত সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরতে চেয়েছেন সম্ভবতঃ কলেবর বৃদ্ধিজনিত আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধির কথা ভেবেই। স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ব প্রেক্ষাপটসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, শহীদ, আহত ও ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকা সংযোজন হওয়ায় বইটির গুরুত্ববহন করছে। পরবর্তী সংস্করণে জানা-অজানা তথ্য সংযোজিত হবে এমনটি আশা করছি।

লেখক একজন পেশাদার সরকারী চাকরিজীবী। প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা ছাড়াই অন্তরের গভীর ভালোবাসার টানে তিনি বিপুল শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করেছেন। কম্পিউটার কম্পোজ করেছেন তিনি নিজেই-তা দেখে বিস্মিত হয়েছি। তিনি একটি নতুন বলয় উম্মোচন করেছেন "একাত্তরের রক্তাক্ত চরবাড়ীয়া" নামক পুস্তক রচনার মাধ্যমে। আগামী প্রজন্মের জন্য এ ইতিহাস জানা একান্ত প্রয়োজন। ছোট-খাট ত্রুটি-বিচ্যুতি বাদ দিলে বলতেই হয় এরপর যদি কেহ বরিশালের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কিছু লেখতে চায় তাঁর জন্য এই বইটি অপরিহায্য। আমি সর্বান্তকরণে বইটির বহুল প্রচার কামনা করে লেখককে অকৃত্রিম শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সিরাজউদ্দিন আহমেদ

তারিখ ঃ- ২৫শে নভেম্বর ১৯৯৮

ভূমিকা

ইতিহাসবিদ্ ও বিজ্ঞানীদের ধারণামতে পৃথিবীর বয়স বার'শ কোটি বছর। এরই বুকে বাংলাদেশ একদা আসাম উপসাগরের অংশ ছিলো । বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ২ কোটি ৫০ লক্ষ বছর পূর্বে গোটা ভারতই টিথিস সাগরে নিমজ্জিত ছিলো। হিমালয়ের পাদদেশে একদা ঢেউ খেলতো। সময়ের ব্যবধানে বহু প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে আজকের এ বিশাল ভূ-খন্ড। ঢাকার সাথে এক সময়ে স্থলপথে বরিশালের যোগাযোগ ছিলো। সহস্রাধিক বছরের প্রাচীন এ জনপদের কোন অংশ প্রাকৃতিক কারণে নিমজ্জিত হয়েছে সাগরগর্ভে, আবার জেগে উঠেছে সাগরের বুক চিরে। কখনও নদীতে বিলীন হয়ে কখনও আবার নদীর মাঝে চর জেগে ভাঙ্গাগড়ার চিরাচরিত নিয়মে সৃষ্ট বরিশাল শহর-সংলগ্ন চরবাড়ীয়া ইউনিয়ন।

নদীবেষ্টিত এ অঞ্চলের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়-অত্যাচার, শোষণ আর জুলুমের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম ও স্বাধীনতাপ্রিয় উন্নত মানসিকতার দরুন এখানকার অধিবাসীগণ বিভিন্ন জাতির কাছ থেকে কুড়িয়েছে অকুণ্ঠ সুনাম। উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি বরিশাল। ঐশ্বর্য আর সমৃদ্ধির আকর্ষণে এ অঞ্চল আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়ে এসেছে প্রাচীনকাল থেকেই। কিন্তু দস্যুবৃত্তি, শোষণ আর নিপীড়ণের কাছে এরা মাথা নত করে নি কোন দিন। প্রতিটি আন্দোলনেই এলাকার রূপ বদলে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নতুন দেশ ও নতুন মানচিত্র।

অত্যাচার,শোষণ, জুলুম ও নিপীড়ণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়েছে শহর থেকে। কিন্তু সমস্ত অত্যাচার ভোগ করতে হয়েছে জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষকে। অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আত্মাহুতি দিতে হয়েছে নদীবেষ্টিত এলাকার তীরবর্তী সহজ-সরল সাধারণ বাসিন্দাদের।

কালবোশেখী, প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের উন্মত্ততা, মগ, পর্তুগীজদের অসহনীয় লুণ্ঠন, ডাকাতি, নারীনির্যাতন, মোগলদের সময়ে নৌযুদ্ধ, কেল্লা আক্রমণ, হত্যা, পরাজিত সৈন্যদের দস্যুবৃত্তির শিকার হতে হয়েছে নদীর তীরে বসবাসরত সাধারণ পল্লীবাসীদের। বিভিন্ন সময়ে চরমপন্থীদের সন্ত্রাসী আন্দোলনের মাধ্যমে অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ এবং রাজনৈতিক হত্যার শিকার হতে হয়েছে গ্রামবাসীদেরই। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলে এ-দেশের কৃষকদের সম্পদ কেড়ে নেয়া হয়েছে। নির্যাতন করে নীল চাষে বাধ্য করা হয়েছে নিরীহ কৃষকদের।

জমিদারকে দিয়ে হাজার হাজার নিরীহ মানুষের ওপর নির্মম অত্যাচার, বিনা কারণে মানুষকে হত্যা, মসজিদে নামাজ আদায় করার প্রতিবন্ধকতা, জমিদারদের সামনে জুতা পায়ে, ছাতা মাথায় দিয়ে চলাচল করতে না দেয়া, তাদের ইচ্ছায় সর্বসাধারণের অকাতরে জীবনদান, হামাগুড়ি দিয়ে চলতে মানুষকে বাধ্য করা, বৃদ্ধ ও শিশুদের মাথায় পাথর চাপিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা, মেয়েদের অলঙ্কার খুলে নেয়া, উলঙ্গ করে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা, চাবুক মারা এবং ব্যাপকভাবে ধর্ষণ করা, যখন তখন জমিদার ও প্রভাবশালীদের লালসার শিকার হতো শ' শ' সুন্দরী নারী। এরা সবাই গ্রামবাসী।

যুগে যুগে যে-সমস্ত অত্যাচারী রাজা, বাদশা, জমিদার, স্বার্থান্ধ জনপ্রতিনিধি সুসংগঠিত প্রশাসনিক যন্ত্রের সাহায্যে সাধারণ মানুষের ওপর নির্মম, পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। কালপ্রবাহে তারা করুণ পরিণতি ভোগ করে মানবতার শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

অত্যাচার, জুলুম, নিপীড়নের শিকার, লুণ্ঠন, ডাকাতিসহ বিভিন্ন সংগ্রামে জীবন দিয়েছেন চরবাড়ীয়া এলাকার গরীব সহজ-সরল দেশপ্রেমিক মানুষ। মগ, পর্তুগীজদের লুণ্ঠন, ডাকাতি, শায়েস্তাবাদ ও তালতলী নদীতে মোগলদের সাথে নৌযুদ্ধে প্রাণহানীসহ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়েছে। ইংরেজ শাসকগণ নির্যাতন করে নীল চাষ করতে বাধ্য করেছে কাগাশুরা, মুকুন্দপট্টি গ্রামের নিরীহ কৃষকদের। অতীত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ একই সীমারেখার মধ্যে তালতলী নদীর পাশে বসবাসরত চরবাড়ীয়ার ঐশ্বর্য ও বীর্যবান দেশপ্রেমিক সাধারণ বাসিন্দারা পুনর্বার ২৫শে এপ্রিল ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন দিয়ে রক্ত দিয়ে, রেখে গেল স্বাধীনতার ইতিহাসে গ্রামীণ জনপদের নতুন অবদান। শুধু জীবন দিয়ে নয়, পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়েছে অনেককে। জীবনে বাঁচার একমাত্র অবলম্বনটুকু দীর্ঘদিনের কষ্ট সঞ্চিত ধন-সম্পদ, খাদ্য-শস্য এবং অস্থাবর সম্পত্তি গৃহটিকেও বর্বর পাকবাহিনী অগ্নিসংযোগ করে পথের ভিখারী করে নামিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয় নি।

যাঁরা মানুষের মুক্তির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন, পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন, গৃহহীন হয়েছেন, তাঁরা আজ রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে সফলতার স্মরণীয় বরণীয়। যৌবনের তাজা রক্ত ঝরিয়ে তাঁরা এনেছিলেন স্বাধীনতা, রেখে গেছেন প্রেরণা। জাতি আজ তাঁদের কাছে চিরঋণী।

১৯৪৭ সালে এদেশ ভাগ, ১৯৭১-এ ৩০ লাখ শহীদ এবং অসংখ্যক মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে স্বাধীনতার স্বাদ আজ কোথায় ? দেশবাসী কাকে দায়ী করবে ? নবপ্রজন্মের কাছে কি কৈফিয়ত দেব আমরা ? সভ্যতার, ভদ্রতার, সততার ছোঁয়া কবে লাগবে আমাদের এই জনপদে ?

নদীর তীরে এ চরবাড়ীয়ায় বসবাসরত মানুষের এ মহান দেশপ্রেমকে ইতিহাসের পাতায় ধরে রাখার মানসেই এ পুস্তিকাখানা রচনা করা হলো। গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন উৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রেরণা দানই আমার অভীষ্ট লক্ষ্য। স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী, চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের শহীদ ও আহতদের পরিচয়সহ সুধী, গুণীজনদের বিষয়ে কিছু আলোচনার চেষ্টা করেছি মাত্র।

চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের বাসিন্দাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বরাবরই অসচ্ছল থাকায় বহু কষ্টে কেউ কেউ পড়াশুনো করে সরকারী চাকরি করছেন। হাতে গোণা কয়েক ব্যক্তি জীবন-যুদ্ধে শারীরিক পরিশ্রম করে অর্থ সঞ্চয় করে সম্পদশালী হলেও শহরে ঘর-বাড়ী করতে গিয়ে জীবন কাটিয়েছেন, ইউনিয়নবাসীদের জন্য কিছুই করতে পারে নি। অনেকের মন-মানসিকতাও হয়তো ছিলো না কিছু করার। আবার কেউ কেউ সমাজের বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের স্বার্থপরতা ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ কার্যকলাপের শিকার হয়ে এলাকার দিকে ফিরেও তাকায় নি। দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, যে গুণীজন কিছু বেকার যুবক এলাকা থেকে ডেকে নিয়ে জীবিকা নির্বাহের সহায়তা করলেন, তাঁর বাড়ীতে ডাকাতি সংঘটিত হলো। আর তাও করলো এলাকার চিহ্নিত যুবকবৃন্দ একত্র হয়ে। আবার গর্বের সাথে বলতে পারি- স্ব-শিক্ষিত, কৃষি জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত মহান দার্শনিক, চিন্তাবিদ এবং মননশীল লেখক আরজ আলী মাতুব্বরের জন্ম এই ইউনিয়নেই। প্রায় নিঃস্ব মাতুব্বর সাহেব তাঁর যা-কিছু ছিলো তার সবই মানবকল্যাণে দান করেছেন, এমনকি নিজকেও। মানবকল্যাণে ব্যবহারের এর চেয়ে উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে ?

চরবাড়ীয়া সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলার একটি জনপদ। প্রাকৃতিক সম্পদ ও সমহিমায় উজ্জ্বল চরবাড়ীয়ায় যুগে যুগে জন্ম নিয়েছে মহান মানব সন্তানেরা। তাঁরা রেখে গেছেন তাঁদের শৌর্য-বীর্য ও কীর্তির স্বাক্ষর। তবু সময়ের বিবর্তন ও চাহিদার প্রেক্ষাপটে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে সক্ষম হচ্ছে না এ চরবাড়ীয়া। এ জন্য প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে-কোন প্রকার বৈষম্য ভুলে সকলের এগিয়ে এসে হাতে হাত রেখে একযোগে কাজ করার।

তাই আবেদন রাখব, সর্বাধুনিক বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আমরা কত পিছনে। ইতিহাসের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে সামান্য স্বার্থপরতা, প্রতিহিংসা-পরায়ণ ও পরশ্রীকাতরতা পরিহার করে নিজের ও সমাজের উন্নতিকল্পে এগিয়ে এসে সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার শপথ গ্রহণ করি।

অল্প সময়ে সংগ্রহ করতে হয়েছে এ তথ্যাবলী। হয়তো অনেক মূল্যবান তথ্য বাদ পড়েছে, যা উপস্থাপন হলে বইয়ের মান আরো ভালো হতো। তাই পরবর্তী সংস্করণে

সংযোজন, সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধনের ব্যাপারে যে-কোন গঠনমূলক সমালোচনা সাদরে গ্রহীত হবে। এ পুস্তকখানার প্রণেতা হিসেবে তত্ত্বমূলক অবদান আমার কিছুই নেই। তথ্য যা পরিবেশিত হয়েছে তা সবই সংকলন। আমি তার সংগ্রাহক মাত্র। এই বই হতে দেশের তরুণ প্রজন্ম যদি মুক্তিযুদ্ধের সামান্যতম সঠিক ইতিহাস ও গ্রামের নিরীহ জনগণের আত্মত্যাগের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারে তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

বইটি তথ্য সমৃদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত করতে আমাকে আন্তরিকভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন অনেকেই। আলতাফ হোসেন, আবদুল জব্বার, নূরুল ইসলাম মল্লিক ও এ, বি, এম, সৈয়দ আহমদসহ তাঁদের কাছে আমি ঋণী। খুলনা ও বরিশাল বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পরামর্শ ও অনুপ্রেরণার জন্য সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। চূড়ান্ত প্রুফ সংশোধনের নিবিড় সহায়তাদান করেছেন জনাব আবদুল মান্নান হাওলাদার। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ বই রচনায় আমি সিরাজউদ্দীন আহমেদ রচিত "বরিশালের ইতিহাস", সাইফউদ্দীন রচিত "বাখেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস", এম.আর.আখতার মুকুল রচিত "আমি বিজয় দেখেছি", টি.এম জালাল উদ্দীন রচিত "ঐতিহ্যবাহী বরিশাল", আরজ আলী মাতুব্বর রচিত 'স্মরণিকা' গ্রন্থগুলোর সাহায্য গ্রহণ করেছি। তা'ছাড়াও কতগুলো সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকার সাহায্য আমি নিয়েছি। এ সব গ্রন্থ ও পত্রিকাগুলোর ঋণ আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি এবং গ্রন্থগুলোর লেখক, প্রকাশক এবং পত্রিকাগুলোর সম্পাদক ও প্রকাশককে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

স্বনামধন্য সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ্, বিভিন্ন সংগঠনের স্থপিত ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব সিরাজউদ্দিন আহমদ বইটির 'মুখবন্ধ' লিখেছেন। বইটিতে তাঁর এই মূল্যবান মতামত প্রদান করে আন্তরিকতার পরশে আমাকে ধন্য করেছেন। এই আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাঁকে আমি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই।

তারিখঃ- ১৬ই ডিসেম্বর,১৯৯৮
বাংলা ঃ- ২রা পৌষ, ১৪০৫

আলহাজ্ব আবদুল মন্নান

মুক্তিযুদ্ধ ও শহীদদের প্রেক্ষাপটে কিছু কথা

আমরা আজ স্বাধীন। এ স্বাধীনতার মূল্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আমরা সদা জাগ্রত। প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধা নেই। মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার হলো স্বাধীনতা। এই অধিকার আদায়ের সংগ্রামে এদেশের মানুষকে কঠোরতম দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়েছিলো, নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য। আর এ দেশের মানুষের ত্যাগ, রক্ত ও আত্মদানে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, সে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পবিত্রতম দায়িত্ব বহন এবং যথাযোগ্য কর্তব্য পালন করতে হবে এদেশের আপামর জনগণ এবং আগামী প্রজন্মকে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিলো প্রকৃত অর্থে জনযুদ্ধ। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ কোন না কোনভাবে এতে অংশগ্রহণ করেছিলো। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহঙ্কার। স্বাতন্ত্র্য অস্তিত্ব এক ঐতিহ্যগত প্রতীক। অন্তর্নিহিত প্রেরণায় স্বাধীনতাকামী বাঙালির প্রকৃত স্বাধীকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। আর এ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাওয়া স্বাধীনতার পটভূমিতে রয়েছে ভাষা আন্দোলনসহ দীর্ঘকালের সংগ্রাম, আন্দোলন ও মুক্তির অন্বেষা। আজকের তরুণ প্রজন্ম কি জানে জাতিসত্তার ভিত্তিমূলের সে-সব তোলপাড় করা ইতিহাস ? আমাদের অস্তিত্বের শেকড়কে প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরের কানে পৌঁছে দেয়ার জন্য মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার অমূল্য সম্পদকে তাই ধরে রাখতে হবে। এর ইতিহাস, এ চিন্তা-চেতনাকে পৌঁছে দিতে হবে নতুন প্রজন্মের কাছে । আমাদের উত্তরসূরীদের জানা উচিত, কোন্ প্রেক্ষাপটে এবং কিভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত ও সফল হয়েছিলো। সবারই একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা উচিত, এই মুক্তিযুদ্ধে কারা কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো। কাউকে অবজ্ঞা করা নয়, কাউকে খাটো করা নয়, কাউকে আযৌক্তিকভাবে অতিরঞ্জিত করাও নয় । মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে যার যা ভূমিকা, যার যা অবদান, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সেটা তুলে ধরাই প্রকৃত অর্থে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। সত্যিকারের ইতিহাসই হবে আমাদের চিরকালীন গৌরবান্বিত ও মহিমামন্ডিত সম্পদ।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শুধু আমাদের বর্তমান প্রজন্মের জন্য নয়, প্রজন্ম পরম্পর সবার জন্যই তা অত্যন্ত গৌরব ও গর্বের বিষয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জাতীয় জীবনে সার্বক্ষণিক প্রেরণার ইতিহাস। সে ইতিহাস জেনে স্বাধীন জাতি হিসেবে পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে সমমর্যাদায় এগিয়ে চলার, দেশকে উন্নত করে

গড়ে তোলার প্রেরণা। মুক্তিযুদ্ধ সব সময় এ প্রেরণা দিচ্ছে জাতিকে। মুক্তিযুদ্ধেরপূর্বাপর ইতিহাস, এ যুদ্ধে ৩০ লাখ লোকের জীবনদান, অগণিত নারীর লাঞ্ছনা, মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মাহুতি, বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সবই আমাদের ইতিহাসের গৌরবজনক অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এ ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গরূপে এবং নিখুঁতভাবে তুলে ধরতে হবে। এটা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। যে জাতি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ একটি মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত করতে পেরেছে, সে জাতি কেন স্বাধীনতার ২৭ বছরে পদার্পণ করেও স্বাধীনতার চেতনাকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি ? কেন পারেনি স্বাধীনতার সুফলকে জনগণের দোর-গোড়ায় পৌঁছে দিতে ?

আপামর গ্রামবাসীরাও সেদিন অস্ত্র হাতে প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো। আর অন্যরা বিশেষ করে মেয়েরা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যুগিয়েছিলো খাদ্য, কাপড়, ঔষধ ও বাসস্থান। আমাদের অনেক মা-বোন নিজের ইজ্জত, দেশের স্বাধীনতার লাল সূর্যের জন্য হাসিমুখে উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করে নি। নারকীয় ঘটনাবলীর প্রমাণ ও সাক্ষ্য বাংলার ঘরে ঘরে এখনও জাজ্জ্বল্যমান। এমন কোন পরিবার নেই ,এমন কোন ঘর নেই, যেখানে '৭১-এর ক্ষতচিহ্ন নেই। ভাই হারিয়েছে বোনকে, মা হারিয়েছে ছেলেকে, স্ত্রী হারিয়েছে স্বামীকে, কন্যা হারিয়েছে পিতাকে। আর তারই ফসল এ রক্তমাখা মধুর স্বাধীনতা। বিশ্বের সব দেশই তাদের মুক্তিযোদ্ধা ও জাতীয় বীরদের অবদানকে যথাযথ স্মরণীয় করে রাখে। তাঁদের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নানাভাবে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা ছাড়াও যথাযোগ্য মর্যাদায় পুর্ণবাসন করে শ্রদ্ধায় স্মরণীয় করে রাখার রেওয়াজ আছে। স্বাধীনতার কল্যাণে আমাদের আরো উন্নত জীবনবোধে উজ্জীবিত হওয়া স্বাভাবিকভাবে কাম্য ছিলো। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আমাদের আরো মহৎ চিন্তা ও ধর্মে উদ্বুদ্ধ হবার কথা ছিলো ।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালের একাধিক ঘটনাপ্রবাহে এটা বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হয় নি যে, আমাদের জাতীয় জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের কাহিনীকে কেউ কেউ নিছক এক সামরিক কর্মকান্ড বলে প্রমান করার চেষ্টা করছে। অথচ মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি ব্যাপক বিস্তৃত ঘটনা কখনই কেবলমাত্র একটি সামরিক কর্মকান্ডে হয় নি, হতে পারে না। একটি জাতির স্বাধীনতা আন্দোলন এবং সশস্ত্র জনযুদ্ধ সে জাতির রাজনৈতিক এবং একই সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিণতি। এটা বিশ্বাসযোগ্য, অবিভক্ত পাকিস্তানের অশুভ রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর নির্লজ্জ অংশীদারিত্বে যাদের মন-মানসিকতা গড়ে উঠেছিলো, তারাই সুকৌশলে স্বাধীন বাংলাদেশেও নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি গৌরবময় প্রেরণাকে বিকৃত অর্থে উপস্থাপনের চেষ্টা করে ফায়দা লুটতে চাচ্ছে ।

কিন্তু ইতিহাস বলে, বাঙালি হাজার বছরের স্বাধীন জাতি, বাঙালি জাতি বীরের জাতি। যদিও স্বাধীনতার ২৬ বছর পর্যন্ত ঘুমপড়ানি গান গেয়ে আমাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে, আত্মবিকৃত করে রাখার হীন চেষ্টা করা হয়েছে, তবুও মনে রাখতে হবে, এসবই বৃথা চেষ্টা। তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৬৬-এর স্বাধিকার আন্দোলন, '৬৯-এর গণ-আন্দোলন ও সর্বশেষ '৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলন। দীর্ঘকাল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে কাট-ছাট করে বিকৃত করার একটা অপচেষ্টা দেশবাসী লক্ষ্য করছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং লজ্জাষ্কর ব্যাপার। আমাদের মুক্তি সংগ্রামে যার যা অবদান এবং ভূমিকা তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা আমাদের জাতীয় স্বার্থেই গুরুত্বপূর্ণ।

যে মুক্তিযুদ্ধে রক্তাক্ত লড়াই শেষে লাখ লাখ শহীদের অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে মা-বোনদের সম্ভ্রম হানির বেদনাদায়ক ফলশ্রুতিতে যে নতুন দেশ বাংলাদেশ আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি, তাকে ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে দাঁড়াবার সময় তো দেয়নি সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত। একটি নিকৃষ্টতম প্রতিক্রিয়াশীল চক্র দেশকে পুনরায় অন্ধকারের আবর্তে নিক্ষেপ করার জন্য মাকড়সার জাল বুনে চলেছে। নতুন একটি প্রজন্মই বেড়ে উঠলো বিকৃতির ঘেরাজালের মধ্যে। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস তাদের জানতে দেয়া হয় নি। দেশের অনুন্নয়ন নিয়ে তাদের প্রশ্নের সদুত্তরও দেয়া হয় নি। ইতিহাসের সেই কালো অধ্যায়কে ভুলে থাকতে বলা হলো।

অথচ ভাগ্যের কি নিমর্ম পরিহাস, সেদিন সেই নর-পশুরা যাদের মধ্যে অনেকেই তথাকথিত শিক্ষিত, তারা গড়ে তুলেছিলো আলবদর, আসশামস ও রাজাকার বাহিনী। বাংলার সবচেয়ে কলঙ্ক, তাঁর এই কুখ্যাত সন্তানেরাই সেদিন পাকবাহিনীর পক্ষ নিয়ে দেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি সাধন করেছিলো। এ জঘন্য ব্যক্তিরাই সেদিন বাংলা মায়ের সূর্যসন্তান বুদ্ধিজীবীদের নিমর্মভাবে হত্যা করেছিলো। যে ঘাতক দালালদের সহযোগিতায় ও যোগসাজসে মানব ইতিহাসের নিকৃষ্টতম এই হত্যাযজ্ঞ করতে পেরেছে পাক হানাদারবাহিনী, সে চক্র একই কায়দায় মাথা তুলে দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে পর্যন্ত বাঁধাগ্রস্থ করেছে রাজনীতির নামাবলী গায় দিয়ে।

কোন কোন সময়ে সে ঘৃণ্য নর-পশুরাই দেশের সর্বত্র সর্বোচ্চ আসনে আসীন হয়ে পোশাক পাল্টে, বুলি পাল্টে মুক্তিযুদ্ধের গান গায়। অনেকে আবার প্রকাশ্যে বলে-'৭১-এ যা করেছি, ঠিক করেছি। আর আমাদের অনেক মুক্তিযোদ্ধা সব হারিয়ে, জীবন বাচাঁনোর জন্য পথে পথে ভিক্ষা করেন। তাঁদের হাতে হয়তো বা দু'চারটা ফুটো পয়সা ধরিয়ে দিয়ে সেই রাজাকাররা মনে মনে গর্ব করে বলে, দেখ্ তোদের সাধের মুক্তিযুদ্ধের ফল।

ইতিহাসকে অস্বীকার করা আর নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা একই কথা। যে জাতি তার অতীত ভুলে যায়, সে কি করে উন্নতি করবে ? মানুষ শিক্ষা নেয় ইতিহাস থেকে। ইতিহাস উৎসাহ যোগায় ভাল কিছু করার। একটি সাফল্য তাৎক্ষণিক আরেকটি সাফল্যের জন্ম দিতে না পারলেও অনুপ্রেরণা দেয় হাজারটি সাফল্য অর্জনের। সমাজ, শিক্ষা, ক্রীড়া ক্ষেত্রে সব কিছুতেই নাড়া দিতে পারে একটি সাফল্য, পাল্টে দিতে পারে দৃশ্যপট। একটি পথ ধরেই আর একটি সাফল্য জন্ম নেয়। একজনের সাফল্য অনুপ্রাণিত করে অন্য আরও দশজনকে, যা থেকে রচিত হয় সোনালী সাফল্যে সমৃদ্ধ ইতিহাস। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। একটি নির্দিষ্ট সময়ে ইতিহাসই নিদের্শ দেয় কি করতে হবে। অথচ নির্মম সত্য হচ্ছে, আজও মানুষ ক্ষমতার মোহে ইতিহাসকে অস্বীকার করতে চায়। কিন্তু ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতা করে না। আত্মবিশ্বাস ও সত্যনিষ্ঠ আদর্শ চিন্তাই মানব কল্যাণে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস যুগিয়েছিলো জাতিকে।

দেশ মানে তো মানুষ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অর্থই হলো দেশের মানুষের ভালভাবে বেঁচে থাকা। সে উদ্দেশ্যেই মানুষ যুদ্ধ করেছিলো। মূল্যবোধের অর্থ হলো মানবিক উদারতার প্রশস্ততা। কোথায় সে চেতনা, কোথায় সে মূল্যবোধ ? আমরা আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য অন্য দেশের দিকে তাকিয়ে থাকি। বাঙালি জাতি হিসেবে মাথা তুলে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছাশক্তি, সাহস-বিশ্বাস, আস্থা সব কিছু ক্রমশঃ খুইয়ে বসেছি।

আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিলো, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের নতুন প্রজন্মও কম্পিউটার ও উপগ্রহের মাধ্যমে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিনির্ভর সর্বাধুনিক শিক্ষার সুযোগ পাবে। বিরাজমান জরাজীর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার হবে, প্রণীত হবে যুগোপযোগী শিক্ষা, শিল্প ও স্বাস্থ্যনীতি। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আজকের নতুন প্রজন্ম এক কঠিন দুঃসময়ের মুখোমুখি। দেশের শিক্ষাঙ্গণে অব্যবস্থা, শিল্প কারখানা বন্ধ, শ্রমিক অসন্তোষ, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অব্যবস্থাসহ বর্তমান ও নতুন প্রজন্ম তথা বর্তমান বাংলাদেশ এক জটিল ও কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত। আগামী প্রজন্মের নিরাপদ ও বিকশিত জীবন নিশ্চিত করার অপরিহার্য বিষয়টি আজ এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

আমরা কথাবার্তায়, ওঠা-বসায়, আচার-ব্যবহারে, রীতি-নীতি পালনে, চিন্তায় ও প্রকাশে এবং কাজকর্মে সনাতনী ধারায় বিশ্বাসী। আগামী দু'হাজার সালকে বরণ করার জন্য বিশ্বের উন্নত দেশ তো বটেই, এশিয়া-আফ্রিকার একাধিক রাষ্ট্র যারা এ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ঔপনিবেশিক শাসন হতে মুক্তি লাভ করেছে, তাঁরাও ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করার চেষ্টায় রয়েছে। আমরা কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক কূপমন্ডুকই রয়ে গেলাম। এ দেশের কোন ভবিষ্যৎ

আছে বলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীসহ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বহুলাংশই এখন আর বিশ্বাস করে না। এদেশের এক বিশিষ্ট গবেষক লেখক মজার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, ১৯৪৭ সাল থেকে আজ অবধি অর্থাৎ দীর্ঘ পঁঞ্চাশ বছরে যে-সব নেতা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদের বক্তৃতা-বিবৃতি সংগ্রহ করলে দেখা যাবে যে, মূল বক্তব্য ও সারাংশগুলো অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। কালের প্রবাহ ও দেশের রাজনৈতিক অঙ্গণের পরিবর্তনের কারণে বক্তব্যের ভাষা কিছুটা হেরফের হয়েছে মাত্র, রাজনৈতিক ধারা পরিবর্তন হয়নি। আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গণে দেশপ্রেমিক রাজনীতিকদের চরম অভাব। কারণ সমস্যাজর্জরিত, প্রাকৃতিক দুর্যোগের রোষায়িত চাবুকে বিধ্বস্ত, বেকারত্বে ভরা এদেশে মাঠের রাজনীতি বাদ দেয়া সম্ভব নয়। মানুষের সাথে মিশতেই হবে। এখানে পাশ্চাত্য ধাচের রাজনীতি সম্ভব নয়। জনগণের সাথে নিত্য-নিয়ত সেতু বন্ধন গড়তেই হবে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও বলিষ্ঠ জবাবদিহিমূলক সরকারই হচ্ছে এ-সবের বিরুদ্ধে যথার্থ।

সহিষ্ণুতার অভাব, সাধারণ মানুষের প্রতি দায়-বদ্ধতার অভাব এবং একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে আজও দেশ ও নতুন প্রজন্মের প্রতি প্রগাঢ় দায়িত্ববোধের অভাব রাজনীতিতে প্রকট। প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগঠনের অভ্যন্তরে, প্রত্যেক ছাত্র-যুবকসহ বিভিন্ন ফ্রন্টেই তীব্র হয়ে উঠেছে তাই অন্তর্বিরোধ, দলাদলি, সংঘর্ষ এবং ভাঙ্গন। আর প্রধানতঃ এ-সব থেকে ফায়দা লুটছে দেশের চিহ্নিত স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিগুলো।

শিক্ষা কেবল প্রতিষ্ঠান থেকেই নয়। বাস্তবতা থেকেও শিক্ষা লাভ করা যায়। যেমন, ১৯৭১ সালে এদেশের রাজনৈতিক মহল দূরদর্শিতার সাথে রাজনীতি পরিচালনা করার ফলে সর্বসাধারণ বুঝতে পেরেছিলো যে, পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যতীত মুক্তির আর কোন পথ খোলা নেই। ঠিক একই ধারায় বুঝতে হবে একবিংশ শতাব্দী আজ আমাদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত এক সুকঠিন নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে। এই চ্যালেঞ্জের সার্থক মোকাবেলার ওপরই নির্ভর করবে আমাদের সার্বিক জাতীয় উন্নয়ন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রকৃত ও সার্থক বাস্তবায়ন। আমরা স্বভাবতঃই আশা করবো সরকারী দল, অন্য বিরোধী দলগুলো দেশের আপামর জনসাধারণের উন্নতিকল্পে চিহ্নিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে একটা মৌলিক চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। কিন্তু দেখছি না। দেখছি শুধু ক্ষমতার দ্বন্দ্ব।

মগ, পর্তুগীজদের অত্যাচারে চরবাড়ীয়া

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শাহজাহান সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করেন ১৬০৬ সালে । সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম খানকে বাংলার সুবেদার নিয়োগ করেন।। তিনি বার ভূঁইয়াদের দমন করে বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম খান রাজা রামচন্দ্রের রাজ্য বাক্‌লা (বরিশালের আদি নাম) অধিকার করার লক্ষ্যে ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে সেনাপতি সৈয়দ হাকিম, সৈয়দ কাশু, মির্জা নূর উদ্দীন, রাজা শত্রুজিৎ এবং ইসলাম কুলিকে বাক্‌লা রাজা রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে পাঠান। বন্দুকধারী সৈন্য তিন হাজার, হাতি কুড়িটি এবং বড় নৌবহরসহ এক বিপুল বাহিনী অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী চন্দ্রদ্বীপ বাক্‌লার রাজ্য আক্রমণ করেন।

রাজা রামচন্দ্র প্রায় একলাখ সৈন্য নিয়ে মোগলদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পর্তুগীজ সেনাপতি ভারী কামান ও অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে মোগলদের মোকাবেলা করার জন্য ১০ হাজার সেনা নিয়ে এগিয়ে গেলেন। ওলন্দাজ সেনাপতি ফার্নান্ডেজ, মীর বহর, জীবনকৃষ্ণ রায়, রামমোহন প্রমুখ সেনাপতিগণ তাঁদের নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে মোগল বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। রাজা রামচন্দ্র নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। রাজার হস্তীবাহিনী এবং নৌবাহিনী মোগলদের চেয়েও শক্তিশালী ছিলো। সুদক্ষ সেনাপতিগণ জাঁহাপুর, কীর্তনখোলা ও সায়েস্তাবাদ নদীতে মোগল বাহিনীকে উপর্যপরি আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করেন। অশ্বারোহী, হাতি ও পদাতিক বাহিনীর যুদ্ধ হয়েছিলো বাবুগঞ্জ থানার ক্ষুদ্রকাঠি ও খানপুরার নিকটস্থ গ্রামে।

আড়িয়ালখাঁ ও মেঘনা নদী হয়ে মোগলবাহিনী অতি সহজে জাঁহাপুর হয়ে ক্ষুদ্রকাঠিতে পৌঁছে। বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপের বাহিনী ছিলো সাহসী এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রস্তুত। মোগল সেনাপতি ভেবেছিলো, প্রথম দিনের যুদ্ধেই রামচন্দ্র আত্মসমর্পণ করবেন। কিন্তু ৭ দিন পর্যন্ত তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করে অপরাজিত থেকে যায়।

মোগল বাহিনীর রাজা শত্রুজিত গোপনে রামচন্দ্রের মাতাকে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে দূত প্রেরণ করেন। রামচন্দ্রের মাতা মোগলভক্ত ছিলেন এবং যুদ্ধের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি পুত্র রামচন্দ্রকে যুদ্ধ বন্ধের অনুরোধ জানালেন। রামচন্দ্র মাতাকে জানালেন, আমাদের জয় সুনিশ্চিত, তাই মোগলদের নিকট আত্মসমর্পণের প্রশ্নই উঠে না। তাই তিনি যুদ্ধ চালিয়ে

যাবেন। কিন্তু রাজমাতা রামচন্দ্রকে পুনরায় বললেন, যদি যুদ্ধ বন্ধ না করা হয়, তবে তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করবেন। মাতৃভক্ত রামচন্দ্র একপ্রকার নিরুপায় হয়েই মোগলদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং এভাবে এক সপ্তাহব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটে। রাজা রামচন্দ্রকে বন্দী করে ঢাকায় পাঠানো হয় ।

বারভূঁইয়াদের অনেকেই যুদ্ধের পূর্বেই মোগলদের সাথে সন্ধি করেন। বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ রাজা রামচন্দ্র স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছেন। তাঁর আহ্বানে হাজার হাজার জনসাধারণ বাক্‌লার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীতে গিয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। এ যুদ্ধে চরবাড়ীয়া, শায়েস্তাবাদ ও তালতলী নদীর তীরবর্ত্তী সাধারণ মানুষ জীবন দিয়েছেন এবং বহু জনপদের ক্ষতি সাধিত হয়েছে। যুদ্ধের ফলে বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের স্বাধীন হিন্দু রাজাদের তিনশ' বছরের ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে। রাজা রামচন্দ্র ও তাঁর সুদক্ষ সেনাপতিগণ কীর্তনখোলা, শায়েস্তাবাদ ও জাঁহাপুর নদীতে ৭ দিন ধরে মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা বরিশালের ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে বিরাজ করছে।

রামচন্দ্রের পরাজয়ের পর বাক্‌লার হিন্দু সমাজ ভেঙ্গে পড়ে। সম্রাট ও ইসলাম খাঁ শাহী কর্মচারী ও পীর-আউলিয়াদেরকে লাখেরাজ সম্পত্তি দান করেন। অনেক মুসলমান পীর-দরবেশ চন্দ্রদ্বীপে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে আসেন। আরব-পারশ্য থেকে এসে শত শত মুসলমান ভূমি লাভ করে বাক্‌লায় বসতি স্থাপন করে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল বরিশালের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাঁর রাজত্বকালে বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে মুসলমানদের প্রভাব বিস্তার লাভ করে এবং মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ।

রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কীর্তিনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে বসেন। রাজা কীর্তিনারায়ণ বাল্যকাল থেকে উপযুক্ত শিক্ষা ও যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর রাজত্বকালে দিল্লীর শাসক ছিলেন আওরঙ্গজেব। বাংলার সুবেদার ছিলেন নবাব শায়েস্তা খান।

কীর্তিনারায়ণ সিংহাসন আরোহণ করার পরই বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হন। প্রথমেই তাঁর সেনাপতি জনগেরীর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে বরখাস্ত করেন। যার ফলে জনগেরী ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে রাজার সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বিদ্রোহী সৈন্যগণসহ জনগেরী হিজলা, মেহেন্দিগঞ্জ, মুলাদী ও শাহবাজপুর (বর্তমান ভোলা) নদীর তীরবর্ত্তী বাড়ী-ঘর লুণ্ঠন ও হত্যাকান্ড শুরু করেন। এই সংবাদ শুনে রাজা কীর্তিনারায়ণ

জনগেরীকে আক্রমণ করে। মেহেন্দিগঞ্জ থানার মেঘনা নদীসহ শায়েস্তাবাদ নদীতে তিনদিন যাবৎ এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয় । যুদ্ধে বহু পর্তুগীজসৈন্য নিহত এবং বন্দী হবার পর জনগেরী সন্ধি করতে বাধ্য হন। কোনদিন বাক্‌লা রাজ্যে প্রবেশ করবে না বলে অঙ্গীকার করার পর তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়।

এ যুদ্ধে জয়লাভ করায় ঢাকার নবাবসহ দিল্লীর সম্রাট তাঁর বীরত্বে সন্তোষ প্রকাশ এবং ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর আমলেই চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য মগ-পর্তুগীজরা প্রায়ই আক্রমণ ও লুণ্ঠন করতো। তাই তিনি আড়িয়ালখাঁ, কীর্তনখোলা ও সুগন্ধা নদীপথে বিভিন্ন গ্রামে কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করে এ সব দুর্গে সুদক্ষ সেনাবাহিনী মোতায়েন করেন। জনসাধারণের সুবিধার্থে কয়েকটি দীঘি ও পুকুর খনন করেন। যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ ও বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড এবং অদ্ভুত যুদ্ধবিদ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ঢাকার নবাব শায়েস্তা খান কীর্তিনারায়ণকে ঢাকায় আগমনের নির্দেশ দেন। তিনি ঢাকায় গিয়ে নবাবের সাথে পর্তুগীজদের দমনের জন্য বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। তিনি তখন নবাবের সাথেই থাকতেন। একদিন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য তিনি নবাবের তাবুতে গমন করেন। নবাব তখন খাওয়া-দাওয়া করছিলেন। তিনি নাকে কাপড় দিয়ে নবাবের সাথে কথা বলছিলেন। নবাব তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হিন্দু শাস্ত্রে ঘ্রাণে অর্ধভোজন এবং মুসলমানদের খাদ্য গ্রহণ করলে ধর্মচ্যুতি ঘটে। এ কথায় নবাব অসন্তুষ্ট হন। পরের দিন মাংস রান্না করে রাজাকে আবার ডাকলেন। এবার রাজা আসলেই পাশে রান্না করা মাংসের ঢাকনাগুলো উঠান হলো। ঘ্রাণ পেয়েই রাজা নাকে কাপড় দেন। নবাব তখন বললেন, ঘ্রাণে যখন অর্ধভোজন এবং মুসলমানদের খাদ্যের ঘ্রাণ নিলে ধর্মচ্যুত হয়, তাহলে তিনি এখন আর হিন্দু নন, মুসলমান। এ ঘটনায় কীর্তিনারায়ণ খুব অসন্তুষ্ট হলেন। সে মুহূর্তেই তিনি রাজধানীতে ফিরে এলেন এবং তাঁর ছোট ভাইয়ের নিকট রাজকার্য বুঝিয়ে দিয়ে রাজবাড়ী ত্যাগ করে রাজধানীর পাশে এক গ্রামে গৃহ নির্মাণ করে পরবর্তী জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন। কীর্তিনারায়ণ মুসলমান হবার পর তাঁর হিন্দু স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে মুসলমান স্ত্রী গ্রহণ করে মুসলিম হিসাবে জীবন যাপন করে। কীতিনারায়ণ একজন জনদরদী সুশাসক হয়েও ধর্মের কুসংস্কারের কারণে তাঁকে ধর্ম ও রাজ্য ত্যাগ করতে হয়েছিলো। তৎকালীন মানুষের বিশ্বাস যে কতো প্রবল, তার দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন। ১৬২০-২১ খ্রীস্টাব্দে আরাকান রাজা মেং খামাং মেঘনা অতিক্রম করে বাক্‌লা রাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি ভোলা, বরিশাল, মেহেন্দিগঞ্জ, হিজলা ও মুলাদীর হাজার হাজার ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেন এবং অগণিত লোক হত্যা করে। অগণিত নারী নির্যাতন করে বহু সুন্দরী নারীদের বন্দী করে নিয়ে যায়। সংবাদ পেয়ে মোগল সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ

পাঁচ হাজার যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে বাক্‌লা রওয়ানা দেন। এ সংবাদ পেয়ে আরাকান রাজা ভোলা ছেড়ে চলে যান। ইব্রাহিম খাঁ মির্জা বাকীর অধীনে ছ'শ' নৌ-যুদ্ধজাহাজ রেখে ঢাকা চলে যান। রাজা রামচন্দ্র ও কীর্তিনারায়ণ মগ-পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন,কিন্তু স্থায়ীভাবে তাদেরকে প্রতিহত করতে পারেননি।

মগ জলদস্যুদের দমন করার লক্ষ্যে শায়েস্তাবাদের রাজাপুরে বিরাট দুর্গ নির্মাণ করেন। রাজাপুরে ৩৬০টি দীঘি ছিলো। চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের কাগাশুরা গ্রামে একটি প্রাচীন দুর্গ ছিলো। যার নাম ছিলো মঠবাড়ীয়া। এখানে বাক্‌লা রাজ্যের সেনাবাহিনী থাকতো এবং সেনাবহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। ষাট দশকের প্রথম দিকে দুর্গটি নদীতে বিলীন হয়ে যায়। নদী ভাঙ্গনের সময় বহু প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে এখানে। মোগল ও বাক্‌লার সৈন্যবাহিনী একত্রিত হয়ে সায়েস্তাবাদ ও তালতলী সংলগ্ন আড়িয়ালখাঁ নদীতে এক তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধেই মগ জলদস্যুরা পরাজয় বরণ করে বাক্‌লা রাজ্য ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়।সমকালীন ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, মগজাতি চট্টগ্রাম থেকে বাংলার সীমান্ত জাগদিয়া পর্যন্ত আকাশে কোন পাখি ও জঙ্গলে কোন পশুও জীবিত রাখে নি। নদীর উভয় তীরে কোন জনবসতি ছিলো না। লুন্ঠন, হত্যায় জনশূন্য হয়ে পড়েছিলো এ অঞ্চল। ঘরবাড়ীতে বসবাস করে আলো জ্বালাবার কেউ ছিলো না। পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণ ও অত্যাচারের ফলে সমুদ্রোপকূলের অনেক দ্বীপ জনশূন্য হয়ে পড়ে এবং বাঘ, কুমির, শূকর ও বন্য মোরগ ব্যতীত কোন অধিবাসী ছিলো না।

১৬০০ খ্রীস্টাব্দ হতে ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মগ-পর্তুগীজগণ অব্যাহতভাবে বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে নিষ্ঠুর আক্রমণ চালায়। উন্নত জনপদ বাকেরগঞ্জ, হিজলা, মেহেন্দিগঞ্জ প্রভৃতি এলাকা মগ-পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণ, লুন্ঠন ও নির্যাতনের ফলে প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। অনেক পর্যটক এসে এসব এলাকা জনশূন্য দেখেছেন। পর্তুগীজগণ রাজ দরবারে প্রভাবশালী ছিলো। রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিলো; তবুও তারা রাজ্যে অবাধে লুন্ঠন কাজ চালিয়েছে। পর্তুগীজগণ মগদের সাথে একত্রিত হয়ে ১৭ শতকে এ অঞ্চলে ইতিহাসের ঘৃণ্যতম অত্যাচার, লুন্ঠন ও নারী নির্যাতন চালায়। তাদের অত্যাচারের করুণ কাহিনী ভাষায় প্রকাশ করার মত নয় ।

এ অঞ্চলের নর-নারীদের ধরে নিয়ে পর্তুগীজগণ বাউফল থানার দাসেরহাট ও অন্যান্য বন্দরে বিক্রী দিতো। পটুয়াখালীর দাসেরহাট দাস-দাসী বিক্রয়ে জন্য প্রসিদ্ধ ছিলো। নর-নারীদের ধরে নেয়া ও বিক্রীর কাজে সহযোগিতা করতো স্থানীয় কতিপয় বাঙালিরা। বাংলার এই ঘৃণ্য নর-পশুরা মগ-পর্তুগীজদের সাথে একত্রিত হয়ে হাজারহাজার নর-নারীকেধরে নিয়ে জাহাজে করে বিদেশে বিক্রী করতো। তাদেরকে জাহাজের নীচে হাতের

তালু ছিদ্র করে লম্বা বেত ঢুকিয়ে বেঁধে রাখা হতো। পাখির মতো খাবার জন্য তাদের প্রত্যহ চাল ছিটিয়ে দেয়া হতো। সুন্দরী নারীদেরকে বিক্রী করা হতো ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের কাছে ।মগ পর্তুগীজরা বাঁচার প্রয়োজনে ডাকাতি, লুণ্ঠন কাজ শুরু করে, কিন্তু তা একদিন ব্যাপক ব্যবসায় পরিণত হয় । নৌ-যুদ্ধে পারদর্শিতা, বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্রের সম্ভারে তারা অজেয় হয়ে উঠে। বিভিন্ন নৌকা নিয়ে আড়িয়ালখাঁ, কীর্তনখোলা, মেঘনা ও তেতুলিয়া প্রভৃতি নদী চষে বেড়াত। অত্যাচারের ফলে সমাজ জীবন ভেঙ্গে যায়। কথিত আছে, হাট-বাজার বন্ধ হয়ে যায়। সন্ধ্যার সময় মোয়াজ্জেনের আজান শোনা যেত না। কুলবধূরা সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাতো না। জনসাধারণ বনে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াত। এ-অঞ্চলে অনেক গুপ্তধন পাওয়া গিয়েছে। যা ঐ সময়কার মানুষ মগদের ভয়ে স্বর্ণ, রৌপ্য ও টাকা-পয়সা মাটির নীচে পুঁতে রেখেছিলো।

১৭ শতকে বাকেরগঞ্জ "মগের মুল্লুক" বলে পরিচিত ছিলো। আইন-শৃঙ্খলা ও জীবনের নিরাপত্তা বলতে কিছুই ছিলো না। অনেককে জোর করে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হতো। পর্তুগীজ দস্যুরা গর্ব করে বলতো, ধর্ম যাজকেরা দশ বছরে যত খ্রীষ্টান বানাতে পারে নি, তা তারা এক বছরে করেছে। এ অত্যাচারের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন কঠোর ছিলো। যাদের বাড়ীর ওপর দিয়ে মগ হেঁটে যেত বা যারা দস্যুদের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে আসত, তাদের সমাজে গ্রহণ করা হত না। মগদের অত্যাচারের পর হাজার হাজার নারী দীঘিতে ও নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

সম্রাট জাহাঙ্গীর, সম্রাট শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মগ-পর্তুগীজরা বাংলাদেশে অবাধে লুণ্ঠন চালায়। সম্রাট শাহজাহান তাঁর পুত্র সুজাকে বাংলার সুবেদার করে পাঠান। শাহ সুজা বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ থেকে মগ-পর্তুগীজদের বিতাড়িত করার জন্য সুজাবাদ কেল্লা নির্মাণ করেন। শাহ সুজা ও তাঁর ভ্রাতাদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিবাদ শুরু হলে মগদের অত্যাচার আরো বৃদ্ধি পায়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খান ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ থেকে মগদের তাড়িয়ে দেন।

শায়েস্তা খানের সময়ে এ অঞ্চলে মগ-পর্তুগীজদের অত্যাচার বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তবুও তারা ছোট ছোট দলে ১৭৩৭ সাল পর্যন্ত বাক্‌লার অভ্যন্তরে দস্যুবৃত্তি করতো।১৭৪০ সালে আগা বাকের খান বুজুর্গ উমেদপুরের জমিদারী লাভ করে মগদের চিরতরে বিতাড়িত করেন। তার পরে আর মগদের আগমনের কথা শোনা যায় নি।

আওরঙ্গজেবের সময়ে শায়েস্তা খান বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি মগ পর্তুগীজদের দমনের উদ্দেশ্যে বিরাট নৌবাহিনী গঠন করেন। তাঁর নির্দেশে সেনাপতি সংগ্রাম শাহ বাক্‌লায় অনেক দুর্গ নির্মাণ করেন। মেঘনা ও পদ্মার সঙ্গমস্থলে মেহেন্দিগঞ্জ থানার গোবিন্দপুর গ্রামে কেল্লা ছিলো বাংলাদেশের মোগলদের সবচেয়ে বড় নৌ-ঘাঁটি। কয়েকটি দুর্গ নিয়ে এ কেল্লা নির্মাণ করা হয় । কেল্লার ভেতরে ১২৮টি পুকুর ছিলো। প্রায় একশ' বছর পূর্বে এ কেল্লা মেঘনা নদীতে বিলীন হয়ে যায়।

প্রাচীন আমল থেকে গ্রাম্য কৃষক ও স্বাধীনতা সংগ্রাম

রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, সম্পদ প্রভৃতি গড়ে তোলে মানুষ এবং এ মানুষের ইতিহাসই যথার্থ ইতিহাস। প্রাচীন রাজ সভায় কবি-সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁরা শুধু রাজ-রাজার কথাই বলতো বা লিখতো। শ্রমজীবী নিম্নস্তরের জনগণের যে একটা মানবজীবন ছিলো, সংস্কৃত ছিলো, তা ওই সব কবি-সাহিত্যেকের লেখায় স্থান পেতো না। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সাথে যারা জড়িত ছিলো, তারা সমাজে নিম্নস্তরের মানুষ বলে ঘৃণিত ছিলো। কৃষিই ছিলো এদের প্রধান কাজ। যারা একটু জ্ঞানী, শিক্ষিত ছিলো, তারাই ছিলো পুরোহিত বা মোড়ল। পৌরোহিত্য ও বুদ্ধির জোরে উৎপাদনের দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতো তারা। যারা উৎপাদন করতো তারা ছিলো সমাজে ঘৃণিত। ভূমিদাসের মতো কাটতো তাদের সমাজ জীবন।

গ্রামাঞ্চলে বাঁশ, সুপারীগাছ, খড়কুটা, পাতা ও গোল দিয়ে নিম্নশ্রেণীর লোকদের ঘর নির্মাণ হতো। একটু উঁচু শ্রেণীর ধনী লোকেরা চৌচালা ঘর নির্মাণ করতো। তাদের বাড়ীর সামনে কাচারী (বাংলাঘর) ঘর থাকতো। ইটের তৈরি দালান খুব কম ছিলো। নদী ও খালের পানি লবণাক্ত ছিলো। পুকুর ও দীঘি খনন করে পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা হতো। নৌকাই ছিলো যাতায়াতের প্রধান অবলম্বন । ধনী লোকেরা সোনা, রূপা ও তামার পাত্র ব্যবহার করতো। গরীব শ্রেণীর নারীরা কৃষি কাজ করতো। গরীব ও শ্রমজীবী মানুষেরা মাটির পাত্র ব্যবহার করতো। গরীব লোকেরা ভাত, শাক, মরিচ, সামান্য তরকারী, ঝোল খেত। দধি, মিষ্টি জুটত খুবই কম। পান্তা ভাত গরীবদের প্রধান খাদ্য ছিলো।

পুরুষেরা ছোট ধুতি পরতো। যারা মাঠে কাজ করতো, তারা পরতো লেংটি। যারা ধনী জ্ঞানী ছিলো, তাঁরা লম্বা ধুতি পরিধান করতো। ধনী মুসলমানগণ লম্বা কোর্তা ও পাগড়ী পরতো। সমাজের বিত্তবানেরা সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলো।

প্রাচীনকালে মানুষের ভাত-কাপড়ের একটা বড় অভাব ছিলো না। সমাজের বিত্তবানদের জীবনে সুখ-শান্তি ছিলো। ধনীদের মহিলাগণ বাইরে যেতেন না। অলংকার পরে সাজসজ্জা করতে তাঁরা ভালবাসতেন। মেয়েরো সোনা, রূপা ও হাতির দাঁতের অলংকার ব্যবহার করতো। নারী সমাজ অল্প লেখাপড়া শিখতো। নারীরা সুন্দরী ও পর্দানশীন ছিলো । মেয়েদের স্বাধীনতা ছিলো না । দাস প্রথার প্রচলন ছিলো। বিধবা রমনীদের জীবন ছিলো

অভিশপ্ত। বাল্যবিবাহসহ বহুবিবাহের প্রচলন ছিলো। বিধবাদেরকে কোন শুভ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা হতো না।

অপর দিকে সমাজ-জীবনে আরও একটি দিক ছিলো। নিম্নবিত্ত সমাজে দুঃখ-কষ্ট লেগেই থাকতো। "হাড়িতে ভাত নেই"-সংসারের সবকিছুই শূন্যের কোঠায়। নিত্য উপবাস অর্ধাহারে দিন কাটে অথচ সংসারে শিশুর সংখ্যা বেড়ে চলছে। ক্ষুধায় শিশুদের চোখ বসে গেছে। পেট পিঠে লেগে গেছে। ভাঙ্গা কলসী ঘরের এক কোণে মলিন কাঁথা-বালিশ ছেঁড়া, পরিধানের বস্ত্র ছেঁড়া, জীর্ণশীর্ণ ঘর, চাল উড়ছে, বেড়া ভেঙ্গে গেছে।

ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ছিলো নিত্য দিনের ঘটনা। ঘরবাড়ী, ফসল-জনপদ ধ্বংস হয়ে যেত। ঝড়ের পর শ' শ' মানুষ না খেয়ে মরে যেত। ঝড়ের পর মহামারীতে গ্রাম থেকে গ্রাম জনশূন্য হয়ে যেত। তাদের সাহায্য করার মতো কেউ ছিলো না। চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিলো না। কলেরা ও বসন্ত রোগ মহামারী হিসেবে দেখা দিলে কোন কোন গ্রামের সব লোক মারা যেত। অনেক বংশে আলো জ্বালাবার কেউ থাকত না।

গ্রামীণ জীবনে সমৃদ্ধি ও অভাব উভয় ছিলো। তবে গ্রাম ও নগর জীবনে পার্থক্য ছিলো অনেক। শহর জীবন ছিলো ঐশ্বর্য ও বিলাসে ভরপুর। কৃষকদের কষ্টে সঞ্চিত ধন ও বাণিজ্যের আয় দিয়ে নাগরিক জীবন গড়ে ওঠতো। অভিজাত শ্রেণী অবসর সময়ে নৃত্য-গীত উপভোগ করতো। কিন্তু গ্রামের কৃষক-শ্রমিকদের জীবন ছিলো কঠিন। তাদের শুধু ফসল ফলাতে হতো। গ্রামের লাখ লাখ জনগণের জীবনে অবসর ও বিনোদনের সুযোগ ছিলো সীমিত।

সুলতানী আমলে এদেশ ধন-সম্পদে ভরপুর ছিলো। মোগল ও নবাবী আমলে এ সম্পদ আরো বৃদ্ধি পায়। সম্পদের লোভে দেশী-বিদেশী বণিকগণ এদেশে চলে আসেন। মোগল কর্মচারী, জমিদার এবং জলদস্যুরা এ সম্পদ শোষণ ও লুণ্ঠন করে নিয়ে যেত ।

বাক্‌লার অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক ছিলো। প্রধান কৃষিপণ্য ধান। এখানে প্রচুর চাল উৎপন্ন হতো। এলাকা হতে চাল কোলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় রপ্তানী হতো। নারিকেল, সুপারী, ডাল, মসল্লা, তৈলবীজ, পাটসহ প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু উৎপন্ন হতো। খেজুর রস ও ইক্ষু থেকে উৎপন্ন হতো চিনি। ঘরে ঘরে কার্পাস তৈরি হতো। এ এলাকায় প্রচুর লবন উৎপন্ন হতো। কোন কোন স্থানে কাগজ উৎপন্ন হতো। এ অঞ্চলে প্রচুর চুন পাওয়া যেত। এগুলো অন্যান্য অঞ্চলে রপ্তানী করে প্রচুর দেশী-বিদেশী মুদ্রা অর্জিত হতো। সব দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত কম ছিলো। মাসিক এক টাকা আয় হলে একজন লোক দু' বেলা ভালভাবে খেতে পারতো। একজন মজুর মাসিক দেড় টাকা আয় করতো। একখানা মোটা কাপড়ের মূল্য ছিলো আধা

পয়সা। টাকায় ১ মণ ১০ সের উৎকৃষ্ট চাল পাওয়া যেত। এত প্রাচুর্যের মধ্যে কৃষক, জেলে ও তাঁতীদের জীবনযাত্রা উন্নতমানের ছিলো না। লেংটী কাপড়, একখানা কুড়েঁঘর ও আহারের জন্য একখন্ড ভূমি তাদের সম্বল ছিলো। ভিরু ও উদ্যমহীন, চরিত্রহীনতা, মনুষ্যত্বের অভাব, স্বার্থপরতা চরম বিকাশ লাভ করে। সাধারণ মানুষের রাজনীতির বিষয়ে ঔদাসীন্য, অসত্য, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি উচ্চ ও মধ্যবিত্ত লোকদের স্বভাব ছিলো।

মোগল ও নবাবের কর্মচারীগণ এবং জমিদারগণ বিলাস জীবন যাপন করতো। সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তারা কোন পথনির্দেশ দিত না। জমিদারগণ যখন যা ইচ্ছা তাই করতো। অন্যায় কিছু ইচ্ছা বা বাসনা পূর্ণ করতে এদেশের সাধারণ লোকদের জীবন পর্যন্ত দিতে হতো। কথিত আছে এক জমিদারের খেয়াল জাগল, কোচ (চল) দিয়ে কিভাবে মাছ শিকার করা হয়, তা সে কোনদিন দেখেনি। তাই এটা তাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে হবে। আনন্দ উপভোগ করতে হবে। জমিদারের ইচ্ছা মুহূর্তের মধ্যে পাইক পেয়াদা প্রস্তুত করা হলো। একটি খালে যথা নিয়মে কাঠি (পাটের খড়ি) দিয়ে সব কিছু প্রস্তুত হলো। কিন্তু তখন কোন মাছ ওখান দিয়ে যাচ্ছিল না বিধায় জমিদারের শখ পূরণ হচ্ছিলো না। সিদ্ধান্ত হলো, এক গ্রাম্য গরীব কৃষক ডুব দিয়ে মাছের ন্যায় এখান দিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করবে এবং মুহুর্তের মধ্যে মাছ ধরার ন্যায় কোচ দিয়ে কোপ দিয়ে তাকে তোলা হবে। জমিদারের নির্দেশ, তাই মুহূর্তের মধ্যে তা পালন হলো। বিনিময়ে এক সাধারণ কৃষকের কী মর্মান্তিক মৃত্যু হলো। জমিদারের মনোবাসনা পূরণ হলো। এরূপ বহু ঘটনা তখনকার জমিদারের অত্যাচারের নগ্ন দৃষ্টান্ত।

মোগল আমলে বিত্তবানদের নৈতিক চরিত্র উন্নত ছিলো না। কৃষক-শ্রমিক শ্রেণী থেকে তারা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলো। সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তার অভাব ছিলো। খাদ্য দ্রব্য সস্তা হলেও সাধারণ জনগণের দুঃখকষ্ট লেগেই থাকতো। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে হাজার হাজার মানুষ বঙ্গোপসাগরে ভেসে যেত। একদিকে ঘূর্ণিঝড়, অন্যদিকে মগ-পর্তুগীজ ও জলদস্যুদের অত্যাচারে সমাজ জীবনকে বিধ্বস্ত করে ফেলে। আর এই প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে সাধারণ জনগণের বেঁচে থাকতে হয়েছে।

অন্যদিকে ধর্মীয় কুসংস্কার সমাজ জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। পন্ডিতগণ সতর ও আঠার শতকের জ্ঞান ও বিজ্ঞান থেকে বঞ্চিত ছিলো। ইউরোপ যখন মুদ্রণ যন্ত্র উদ্ভাবন করে নতুন নতুন জ্ঞান আহরণে ব্যস্ত, তখন এখানকার সমাজ তালপাতায় বা তুলট কাগজে লেখা-লেখি নিয়ে ব্যস্ত ছিলো। আমেরিকা যখন ব্রটিশের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ করার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলছে, তখন এ এলাকার ধনী ও জমিদারগণ স্বাধীনতা বিকিয়ে

দেবার জন্য ইংরেজ বণিকদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো। নারী আসক্তি ও মদ-জুয়া নিয়ে দিন কাটাত।

১৭৭৭ সালে লুই বান্না নামক একজন ফরাসী এ অঞ্চলে প্রথম নীল চাষ শুরু করে এবং তারপর নীল চাষ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ইংলন্ডের বস্ত্র শিল্পের জন্য রং সরবরাহ হতো এদেশ থেকে। ১৮২৬ সনে বাকেরগঞ্জ নীলচাষ শুরু হয়। কাগাশুরা, মুকুন্দপটি, শায়েস্তাবাদ, কাশিপুর, চরামদ্দি ও বাবৈকরণে নীল চাষ হতো। ষাট দশকেও মুকুন্দপটি গ্রামে নীল কুঠির ধ্বংশাবশেষ পাওয়া গেছে। নীল চাষ এ অঞ্চলের কৃষকদের ভূমিদাসে পরিণত করে। এলাকার কৃষকগণ অলাভজনক নীলচাষের বিরোধীতা করে। কৃষকদের ভয়ে তারা নীলচাষ বাদ দিয়ে পালিয়ে যায়। বিভিন্ন জায়গায় নীল কুঠি ছিলো। বিভিন্নভাবে আক্রমণ করে তাদেরকে তাঁড়িয়ে দেয়। বিদ্রোহী নীলচাষীরা নীলকুঠি আক্রমণ করে এবং কুঠিয়ালদের শিরচ্ছেদ পর্যন্ত করে ফেলে।

১৯৪২-৫২ সনে ভূমি জরিপে দেখা যায় বাকেরগঞ্জ জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিলো। কৃষকগণ ভূমি বিক্রী বা বন্ধক রেখে খাজনা পরিশোধ করতো। তারা ব্যাংক থেকে গ্রহীত লোন, সাংসারিক খরচ ও রাজস্ব দিতে যেয়ে ঋণ গ্রহণ করতো। বাকেরগঞ্জ ঋণের ব্যবস্থা জমজমাট হয়ে উঠে। বাংলা ১২৮০ সনে বরিশালে লোন অফিস প্রতিষ্ঠিত হয় বরিশাল সদর রোডে। এ লোন অফিস দীর্ঘদিন ধরে বরিশালে লোনের ব্যবস্থা করে প্রচুর সম্পদের মালিক হয়। শহরে-বন্দরে শত শত সাহা ও মহাজন ছিলো। তারা দরিদ্র কৃষকদের ঋণ দিয়ে জমি গ্রহণ করতো। সময়মত ঋণ পরিশোধ না করতে পারলে জমি নিলামে বিক্রী করে দিতো। এমনিভাবে গ্রামের জোতদারগণ দরিদ্র কৃষকদের ভূমি বন্ধক ও চুক্তি কবালা রাখতো। তিরিশের দশকে বাংলার কৃষকগণ ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খাদ্য-শস্যের দাম বৃদ্ধি পায়। চালের দাম প্রতিমণ ৫ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮০ টাকায় উন্নীত হয়। খাদ্যের অভাবে মানুষ শহরে ভিড় জমায়। না খেয়ে অনেক মানুষ শহরের রাস্তায় মরে থাকে। এ অঞ্চলে প্রায় ৪০ হাজার মানুষ না খেয়ে মারা যায় এবং সারা বাংলাদেশে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ মারা গেছে। তৎকালীন মুসলিম সরকার দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। দুর্ভিক্ষের পরে দেখা দেয় বস্ত্রের অভাব। সমাজসেবকগণ গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানা খুলে আর্তদের সেবা করে। এহেন দুর্ভিক্ষের ফলে এ অঞ্চলের হাজার হাজার কৃষক ভূমিহীন হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

উপর্যুপরি ঘূর্ণিঝড়, দুর্ভিক্ষ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জমিদারদের অত্যাচার, ইংরেজ সরকারের কোর্ট-কাচারী, পুলিশের শোষণ তিরিশ শতকের প্রথম ভাগে এ অঞ্চলের

অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়। তা'ছাড়া উন্নত জীবন গঠনের চেতনার অনুপস্থিতি, ধর্মীয় কুসংস্কার, বেঁচে থাকার অর্থনীতি, ভাগ্যের উপর নির্ভরশীলতা এ অঞ্চলের সমাজ জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গ্রামীণ জীবনে পরিবর্তনের কিছুটা লক্ষণ দেখা যায়। রাজনীতি ক্ষেত্রে সচেতনতা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিকাশ ঘটাতে শুরু করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা, জমিদারী প্রথা, বাংলার কৃষক-সমাজকে ভূমিদাসে পরিণত করে। জমিদার-তালকুদার ও তাঁদের কর্মচারীদের উৎপীড়ন এ অঞ্চলেই বেশি চলে। কৃষকদের সমাজ-জীবন জমিদারদের নির্দেশে পরিচালিত হতো। তাঁদের কাচারী বা বাড়ীর সামনে দিয়ে জুতা পায় বা ছাতা মাথায় দিয়ে কৃষকরা যেতে পারতো না। জমিদারদের বিনা অনুমতিতে কৃষকরা ছেলে-মেয়েদের বিয়ে, পুকুর খনন, গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি করতে পারতো না। গরীব প্রজাদের স্ত্রী-কন্যার সামাজিক নিরাপত্তা ছিলো না। প্রজাদের সুন্দরী কন্যাদের বিবাহ হলে প্রথম রাত জমিদারের সাথে কাটাতে হতো। কৃষকদের বাড়ীর ফল-ফলাদির উল্লেখযোগ্য অংশ জমিদারদের বাড়ী না পাঠালে তাকে প্রজা বলে গণ্য করা হতো না। খাজনা ছাড়াও জমিদারদের নানা প্রকারের তহুরা দিতে হতো। খাজনা না দিলে কৃষকদের ভিটেমাটি ছাড়া করা হতো। কৃষকগণ যখন দলবদ্ধ হয়ে জমিদারদের নিপীড়ণের প্রতিবাদ করতো, তখন তাদের ওপর নেমে আসতো সীমাহীন অত্যাচার। কথিত আছে,'মেহেন্দিগঞ্জ থানার চাঁদপুর গ্রামের কৃষকনেতা আসু আকন্দ জমিদারদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করলে তাকে ১২৮৬ সনের ১৫ই ফালগুন বন্দী করে 'তেলে ভাজা করে হত্যা করে'। জমিদারদের অন্ধকূপে অনেক নিরীহ কৃষক প্রাণ দিয়েছে।

শায়েস্তাবাদ-নবাবের বিচার করার জুতার নাম ছিলো "জমরুত খাঁ"। বিচারের নামে তারা প্রজাদের জরিমানা করে টাকা আত্মসাৎ করতো। সময়মত খাজনা না দিলে জমিদার- তালুকদারগণ কৃষকদের বসতবাড়ীও নিলামে বিক্রী করতো। প্রজারা গরীব হয়ে জন্মিত এবং ঋণের নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করতো। তাদের সন্তানরা ঋণের বোঝা নিয়ে জন্মিত। জমিদারদের খাজনার জন্য তাদের জমিজমা মহাজনদের নিকট বন্ধক দিতে হতো। কৃষকদের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিলো না। জমিদার-তালুকদার, উকিল-মোক্তার, আমলা, পাইক, পেয়াদা, থানার পুলিশ কৃষকদের "চাষা" "তুই", "তুমি" বলে ডাকতো। যে-কোন মুহূর্তে জমিদাররা কৃষকদের পৈত্রিক ভূমি হতে উৎখাত করতে পারতো।

ঢাকার জমিদার কালী গুহের নায়েব গোমস্তা ধানখালীর চান মিয়ার পরিবারের ৮ জনকে ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করে। কলসকাঠির জমিদারের সীমাহীন অত্যাচার দেখে তাদের তহশীলদার মুন্সী ইয়াসিন হাওলাদার চাকরি থেকে পদত্যাগ করে ১৯২৫ সনে

লিখলেন "জমিদারের দয়া, প্রজার শাসন"। বাকেরগঞ্জের বাগদিয়া গ্রামে তার জন্ম। তাঁর লেখা ও প্রতিবাদের ফলে কৃষকদের মধ্যে নতুন চেতনা সৃষ্টি হলো। কিন্তু নেমে এলো তাঁর ওপর জমিদারের অত্যাচার।

কৃষক বিদ্রোহ ও প্রজা আন্দোলন ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর অর্ধ শতাব্দী ধরে কৃষক সমাজ জমিদারদের অত্যাচার সহ্য করে। মাঝে মাঝে তারা জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু জমিদারগণ লাঠিয়াল বাহিনী ও পুলিশ দিয়ে তা বন্ধ করে দিতো। ১৯ শতকের শেষ ভাগে এ অঞ্চলে প্রজা বিদ্রোহ হয়। কিন্তু জমিদারগণ পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেটের সাহায্যে তাদেরকে দমন করে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ফলে বিশ শতকের তিরিশ দশকের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখা দেয়। শিক্ষিত সম্প্রদায় অধিক সংখ্যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনে জড়িত হয়। বিশেষ করে উকিল-মোক্তারগণ রাজনৈতিক দলগুলো গঠনের নেতৃত্ব দেন। জমিদার-তালুকদারের অনেকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। ছাত্র-যুবকদের মধ্যে যুগান্তর ও অনুশীলন পার্টির আবেদন বেশি ছিলো। তিরিশের দশকের পূর্বে কোন ছাত্র সংগঠন শক্তিশালী ছিলো না।

বিশ শতকের তিরিশ দশক পর্যন্ত কৃষকদের সমস্যার কথা তুলে ধরার কোন সংগঠন বা নেতা ছিলো না। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও বিপ্লবীদল এক্ষেত্রে উদাসীন ছিলো। কারণ, এ সব দলে নেতৃত্বদানকারী প্রায় সবাই জমিদার-তালুকদার পরিবার হতে আগত। রাজনৈতিক ইতিহাসের এমনি সংকটময় মুহূর্তে এ, কে, ফজলুল হক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। তিনি ১৯১৫ সনে প্রজা আন্দোলন শুরু করেন। প্রজা আন্দোলনে আরো এগিয়ে আসেন প্রখ্যাত আইনজীবী হাশেম আলী খানসহ মাজেদ কাজী, বাণীকণ্ঠ সেন, মুন্সী ইয়াসিন আলী হাং প্রমুখ। কৃষক প্রজার মুক্তিদুত হিসেবে রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁদের আর্বিভাব। বরিশাল, আগৈলঝাড়া, পটুয়াখালী ও বরগুনা বিভিন্নস্থানে সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকার নবাবদের জমিদারী প্রজা সম্মেলনের ফলে কৃষকগণ নবাব ও তাঁদের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন। বরিশালে জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রজা আন্দোলন শুরু করে। হাজার হাজার লাঞ্ছিত, নিপীড়িত কৃষক ঐক্যবদ্ধ হলো। শুরু হলো জমিদার-তালুকদারের বিরুদ্ধে বরিশালে দুর্ধষ কৃষক নেতা ও জাগ্রত কৃষকের অবিরাম সংগ্রাম। এ সংগ্রামে কৃষকদের জয় হয়। জমিদারদের হলো পতন। জমিদার-মহাজনদের শোষণে কৃষক সমাজ জর্জরিত ছিলো। গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহী নেতৃত্ব প্রয়োজন ছিলো বজ্র কণ্ঠের।

এ, কে, ফজলুল হক, ও হাশেম আলী খান আহবান জানালেন। গ্রাম-বরিশাল জেগে ওঠলো। কৃষক-প্রজা শ্লোগান তুললো "জমিদারী শোষণ চলবে না, লাঙ্গল যার জমি তার, ঘাম যার দাম তার, জমিদারী প্রথা বাতিল কর।"

১৯২৪ সনে ঢাকায় ঐতিহাসিক প্রজা কন্‌ফারেন্সে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠন করা হয়। ১৯৩৪ সালে ঢাকায় নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির সম্মেলনে কৃষক প্রজা সমিতি গঠন করা হয়। সম্মেলনে এ, কে, ফজলুল হক পার্টির সভাপতি এবং শামছুদ্দিন আহমেদ সম্পাদক নিযুক্ত হন।

কৃষকদের সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় জমিদারী-মহাজনী প্রথা। এ সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো মহাজনী প্রথার উচ্ছেদ। তাই ১৯৩৬ সনে এ, কে, ফজলুল হক বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন-"আজ হতে শুরু হবে বাংলার হাটে-মাঠে-ঘাটে, জলে-স্থলে, দিবা-নিশি প্রজা ও জমিদারের ভীষণতম বিরামহীন সংগ্রাম। আল্লাহর রহমতে আমি অচিরে ঘটাব জমিদারীর অবসান, বুক ফুলিয়ে মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াবে বাংলার ৮ কোটি কৃষক প্রজা। ছিনিয়ে নিবেন তারা তাদের যাবতীয় মানবিক অধিকার, জমিদার ও সরকারের ক্ষমতা নেই কৃষক প্রজাকে আর পায়ের তলে দাবিয়ে রাখে। জাগ্রত জনতার বজ্রহুংকারে জমিদারীর জগদ্দল পাথর ফুৎকারে উড়ে যাবে। আল্লাহর রহমতে কৃষক প্রজার জয় অবশ্যম্ভাবী"।

১৯৩৭ সনের নির্বাচনে এ, কে, ফজলুল হক ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এ, কে, ফজলুল হক কৃষকদের বাড়ী পান্তা ভাত খাওয়া ও বিরোধীদের বাড়ী কবর জিয়ারত করাতে, জনগণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বাকেরগঞ্জে ৯টি মুসলমান আসনে প্রজা সমিতির প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। বরিশালের প্রজা সমিতির নেতৃত্বে কৃষকদের বিরাট বিজয়ের সূচনা হলো। প্রজাস্বত্ব আইন, মহাজনী আইন, ঋণ শালিশী বোর্ড এবং জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য ফ্লাউড কমিশন নিয়োগ প্রভৃতি যুগান্তকারী পদক্ষেপের ফলে কৃষক সমাজ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ পেলো। জমিদার ও জোতদার শ্রেণী মানসিক ও রাজনৈতিকভাবে পরাজিত হলো। ভারতে বৃটিশ সরকারের প্রধান স্তম্ভ ছিলো জমিদার শ্রেণী। তাদের পরাজয়ে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি ধ্বসে পড়লো। কৃষক সচেতন হলো, জেগে ওঠলো স্বাধীনতার শ্লোগান নিয়ে। প্রজা সমিতির সৃষ্টি, জনমত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। প্রজাপার্টি সৃষ্টি, রাজনৈতিক চেতনা কৃষকদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কৃষক প্রজা আন্দোলন।

কৃষকনেতা শেরে-বাংলা এ, কে, ফজলুল হক

ব্রিটিশ, ভারত, পাকিস্তান

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বাঙালির রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থা ছিলো অস্বস্তিকর। বিদেশী, বিভাষী ও বিজাতি শাসনের নানা অধ্যায় বাঙালির দীর্ঘকালের ইতিহাসের পাতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই অঞ্চলের মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী শোষিত হয়েছে বহিরাগতদের দ্বারা। নানা জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্য আসায় সমাজ ইতিহাসের বিপুল উপকার সাধিত হলেও বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাস ও বাস্তব সভ্যতার ক্ষেত্রে তেমন কোন জয়-জয়কর নেই। বাঙালির ইতিহাসে বিদ্রোহ আছে, সংগ্রাম আছে কিন্তু ইতিহাসের বিপুল অংশই বিদেশী শাসন ও শোষণের ঘটনাবলীতে ভরপুর। বাঙালির এ দুঃখ বোধ হয় চিরাচরিত। বাঙালি যখন তার রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রথম পাতাটি ওল্টালে সেখানে সহজেই সে দেখতে পেল তার প্রভু-শাসক, কেউ তার স্বজন নয়। বলতে গেলে, বাঙালি তার নিজের দেশ নিজে শাসন করতে পারে নি।

ভারতবর্ষের সম্পদের প্রাচুর্যের কথা রূপকথার ন্যায় বিশ্বময় পরিচিত ছিলো। অতি প্রাচীনকাল হতে ভারতবর্ষ বহু বিজাতীয়ের আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। শক, হূন, পাঠান, মোগল, মগ প্রভৃতি জাতি যুগে যুগে এদেশে উপস্থিত হয়েছে। ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে পর্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজরাও ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন করেছিলো। আর সর্বশেষ অগমন করে ইংরেজরা। ভারতবর্ষের ন্যায় এক বিরাট দেশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ন্যায় এক বেনিয়া প্রতিষ্ঠানের কুক্ষিগত হলো ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। ইংরেজ রাজত্ব আধুনিক কালের ইতিহাসে অন্যতম ঘটনা। দু'শ বছরের শাসন, শোষণ, নিপীড়ণ, আর নির্যাতনের এক মর্মন্তুদ ইতিহাস। এ সত্যই বিচিত্রতর এক কাহিনী। এছাড়াও দেশ বিজয়ের বিচিত্র আলেখ্য ইতিহাসকে করেছে বৈচিত্র্যময়।

একশ' বছর পর ১৮৫৭ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে শাষণে জর্জরিত ভারতবাসীর ধুমায়িত অসন্তোষ প্রথম প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। ইংরেজ শাসন-তে পরাধীন ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীতে এক অভূতপূর্ব রেনেঁসা বা নবজাগরণের সূচনা ঘটে। শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, সমাজ, বিজ্ঞান, ধর্ম, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে এই নবজাগরণের আলোক শিখা বিচ্ছুরিত হয়। তাই ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রায় একশ' বছর চলে বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা

সংগ্রাম। এক পর্যায়ে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী পাক-ভারত উপমহাদেশকে স্বাধীনতা দিতে সম্মত হলো অনেকটা বাধ্য হয়েই।

১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী লর্ড এ্‌টলী ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। ভারতবর্ষের সর্বশেষ গভর্ণর জেনারেল হিসেবে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি দেখলেন, ভারতবর্ষ সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত প্রভাবের কবলে পতিত। বৃটিশ সরকারের সাথে তিনি পরামর্শ করে গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ পরিকল্পনায় পাকিস্তান প্রস্তাব নীতিগতভাবে গ্রহীত হয়। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ভারতের দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মলাভ করে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর হতেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। যাতে পূর্ব পাকিস্তানের যুব সম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবী এবং সর্বোপরি আপামর জনসাধারণের মধ্যে চরম হতাশার সৃষ্টি হয়। পূর্ব বাংলার জনগণ স্বাধীনতার ফল লাভ হতে ধীরে ধীরে বঞ্চিত হতে থাকে।

পাকিস্তান হাসিলের পর এদেশের মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা অনেকটা বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশ বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান আমলে ২৪টি বছর ছিলো বাঙালিদের দারুণ যন্ত্রণার। বৃটিশদের মতোই পূর্ব পাকিস্তান ছিলো একটা কলোনী। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলার মানুষ ছিলো অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্থ। বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও শাসন ক্ষমতা থেকে শুরু করে সব ক্ষমতা ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের মুখের ভাষা, প্রাণের ভাষা বাংলাকে বিকৃত করার, রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি না দেয়ার নানা রকম ষড়যন্ত্র করতে থাকে। পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন ঘোষণা করেন যে, "উর্দূই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" ঠিক তখনই ভাষা আন্দোলনের ধূম্রজাল সৃষ্টি হয় এবং চারদিকে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উত্থিত হয়। পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৫২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাংলার দামাল ছেলেরা সকল বাঁধা-বিপত্তির পাহাড়কে ভেংগে, সকল ভয়কে উপেক্ষা করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার

দাবীতে রাজপথে নামল। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে মিছিল করলো। সেই মিছিলের উপর নির্বিচারে গুলী চালালো পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী। শহীদ হলেন জব্বার, বরকত, সালাম, রফিকসহ নাম না জানা আরো অনেকে। রাজপথে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে বাংলা ভাষাকে মর্যাদার আসনে আসীন করলেন আমাদের শহীদ ভাইয়েরা। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার এই অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত পরবর্তীকালে বাঙালির রাজনৈতিক কর্মধারার সাথে একীভূত হয়। এ সময় থেকেই বাঙালিরা নিজের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সচেতন হতে শুরু করে। একুশে ফেব্রুয়ারীর চেতনা যে ভাষা আন্দোলন বা সাংস্কৃতিক বিকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো তা নয়, বরং বাঙালিকে সে অন্যায় অবিচার, শোষণ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে বারবার প্রতিবাদী হতে প্রেরণা যুগিয়েছে।

পাকিস্তান দাবি বাংলার মুসলিম সমাজের ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছিলো। সেদিন এ আওয়াজকে যারা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছিলো তার পুরোভাগে ছিলো ছাত্র সমাজ। তাদের উদ্যোগে সেদিন সারা দেশে সৃষ্টি হয়েছিলো এক উন্মাদনা। সে উন্মাদনায় যুক্তি ছিলো না, ছিলো না কোন আবেগ। হিন্দু ও মুসলমান দু'জাতি এই সূত্র ধরে বাঙালি সংস্কৃতিকেও ভাগ করা হয়েছিলো হিন্দু কালচার, মুসলিম কালচার বলে। সেদিনকার উন্মাদনা এই মাত্রায় ছিলো যে, পাকিস্তানের ধারক-বাহক মুসলিম লীগের বিরোধিতা করতে গিয়ে শেরে-বাংলা এ, কে, ফজলুল হক লাঞ্ছিত হয়েছিলেন।

বাঙালিরা পুরাপুরি 'মুসলমান নহে'-এই মনোভাবের ফলে পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শে বাঙালিরা কোনদিন একাত্মতা অনুভব করে নি। বাঙালিরা তাদের ভাষায় সংস্কৃতিকে ভালবাসে, বাঙালিরা ধর্মকে ভালবাসে, কিন্তু ২৩ বছরের ইতিহাসে বাঙালিরা কোনদিন 'প্রকৃত বাঙালি' হয়ে পাকিস্তানী হবার সুযোগ লাভ করে নি। যখনই পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ চরমে উঠেছে এবং শোষণের বিরুদ্ধে যখনই প্রতিবাদ করেছে বাঙালিরা তখনই 'ভারতের চক্রান্ত' বা 'ভারতের চরদের কলাকৌশল' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের উদ্যোক্তারা, রাজনৈতিকরা, স্বায়ত্ব শাসনের আহবায়করা আওয়ামী লীগের 'ছয়দফা' এমনকি শেষ পর্যায়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিকরা পর্যন্ত 'ভারতের চর' বলে চিহ্নিত হয়েছেন।

১৯৫২ সালের ৩০শে জানুয়ারি ঢাকায় দুর্বল চিত্তের বাঙালি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন এক সভায় উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করলেন। যতদুর জানা যায়, খাজা নাজিমউদ্দিন-এর এ বক্তৃতার খসড়া তৈরি করে দিয়েছিলেন পাঞ্জাবী আমলা আজিজ আহমেদ। এরই প্রেক্ষিতেই ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট, ১১ই ফেব্রুয়ারি সারা

বাংলায় আন্দোলনের প্রস্তুতি দিবস এবং ২১ শে ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটের আহবান জানানো হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলে সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ হয়। শাসকচক্র পুলিশ বাহিনীকে বেপরোয়া গুলী চালাতে আদেশ দিলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কাছে কতিপয় যুবক পুলিশের গুলীতে নিহত হয়। তাঁদের রক্তে রঞ্জিত হলো রাজপথ। বাঙালি জাতীয়তাবোধ ও বৈপ্লবিক চেতনার বীজ উপ্ত হয়েছিলো এই অমর একুশে ফেব্রুয়ারিতে। এ আন্দোলন ছিলো সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

১৯৫৪ সালে ২৩শে অক্টোবর বাংলার জনপ্রিয় নেতা এ, কে, ফজলুল হক গণপরিষদে বক্তৃতায় বলেন "কেন্দ্রের নির্দেশ মত পূর্ববাংলা শাসিত হবে তা অসম্ভব ও অসহণীয়। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় সেখানকার সুবিধা তারাই ভোগ করছে। এ অবস্থায় আমি একটি সুপারিশ করতে চাই এবং তা হলো কার্যতঃ আমাদের স্ব-শাসন দিতে হবে। পূর্ববাংলাকে তার ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার দিতে হবে।"

১৯৫৪ সালে নির্বাচনের সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এ, কে, ফজলুল হক এবং মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে একুশ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। নির্বাচনে বিপুল ব্যবধানে বিজয় লাভ করে যুক্তফ্রন্ট এবং মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। নির্বাচনের পর ২রা এপ্রিল কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতা শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হক পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি পূর্ববাংলার দাবী জোরেসোরে তুলে ধরেন। কিন্তু কয়েক দিন যেতে না যেতেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠি এবং মুসলিম লীগের চক্রান্তে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়। পূর্ববাংলায় বসবাসকারী অবাঙালিদের লজ্জাকর ভূমিকা সেদিন স্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রীকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করা হয়।

১৯৫৬ সালে ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের নূতন সংবিধান রচিত হয়। কিন্তু মাত্র দু' বছর পরেই তার সমাধি রচিত হয়। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন এবং পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন। ১৯৫৮ সালের ২৭শে অক্টোবর সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ইসকান্দার মির্জাকে হটিয়ে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করেন। সারা দেশে সামরিক শাসন চালু হয়। সকল রাজনৈতিক দলকে বে-আইনী ঘোষণা করায় দেশে রাজনৈতিক কার্যকলাপের সমাপ্তি ঘটে। ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান শাসন কাঠামো বাংলার সঠিক প্রতিনিধিত্ব না থাকলেও অন্ততঃ দাবি-দাওয়া করার পথ ছিলো উন্মুক্ত।

১৯৬২ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের নামে একটি সংবিধান প্রবর্তন করা হয়। এই সংবিধানে প্রেসিডেন্ট হলো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচিত ৮০,০০০ (আশি হাজার) মেম্বর নিয়ে গঠিত নির্বাচক মন্ডলীর ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। আইয়ুব খান আজীবন প্রেসিডেন্ট ও ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন মৌলিক গণতন্ত্র নামে এক উদ্ভট গণতান্ত্রিক লেবাসে, যা ভেঙ্গে গিয়েছিলো ব্যাপক ছাত্র গণ-আন্দোলনের মুখে।

৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৫৪ তে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পর তা উৎখাত ও ৬২-তে মৌলিক গণতন্ত্র কায়েম-এর প্রেক্ষাপট থেকে বাঙালি জাতির নতুন দেশ গঠনের আন্দোলন শুরু হয়েছিলো তা সংগঠিত রূপ পেয়েছিলো ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ৬ দফা উপস্থাপনের পর ।

১৯৫৮ সাল হ'তে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত আইয়ুবী দশকে বাঙালি গুমরিয়ে মরেছে নানাবিধ নিপীড়নের যাঁতাকলে। সামরিক বাহিনীর দমননীতি, আমলাতন্ত্রের প্রাণহীন শাসন ব্যবস্থা। এ দশকে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাহাড় পরিমাণ বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক দালালদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। বাংলার মাটিতে মীরজাফর সৃষ্টি করে তাদের সহায়তায় বাঙালি জনগণকে শোষণ নিপীড়ন করার কৌশল সৃষ্টি করে। পূর্ব বাংলার গভর্ণর মোনেম খান তাদের প্রতিনিধি হিসেবে বাঙালি স্বার্থবিরোধী চক্রের সর্বশীর্ষে পোঁছে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান একনায়কতন্ত্রে অবতীর্ণ হয়। আর একানায়কতন্ত্রের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিতে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল। এতদিন পর্যন্ত পাকিস্তানের সমর-বিশারদরা বলেছিলো, পূর্ববাংলার নিরাপত্তা নিহিত রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের বাহিনীর উপর। কোনদিন যদি ভারত পূর্ববাংলাকে আক্রমণ করে, তবে পাকিস্তান দিল্লী অধিকার করে পূর্ববাংলাকে রক্ষা করবে। এমন সব আজগুবি ও হাস্যস্পদ যুক্তির অবসান হলো এ যুদ্ধে। পূর্ববাংলা রইলো অরক্ষিত এবং যুদ্ধের পর বাঙালি নতুন জীবনের স্বপ্নে হলো বিভোর। অঙ্কন করলো সে স্বপ্নকে ছিনাইয়া আনবার জন্য সংগ্রামের রূপরেখা। প্রস্তুত হলো ১৯৬৬ সালের ছ'দফা কর্মসূচী। বাস্তব ভিত্তিক ছ'দফার ভিত্তিতে জন্ম হলো "জয়বাংলা" শ্লোগানের।

পূর্ববাংলার জনগণ তাদের প্রত্যাশা আর আকাঙ্খার অপূর্ণতা এবং রাজনৈতিক শাসন আর অর্থনৈতিক শোষণে দীর্ঘদিন ধরে জর্জরিত ছিলো। তারা দেখেছে, পূর্ববাংলার জনসংখ্যা অধিক হলেও রাজধানী করা হয়েছে করাচীতে। তারপর ইসলামাবাদ মনোহর

রাজধানী স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু পূর্ববাংলার শিল্প, কৃষি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ অথবা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কিছুই করা হয় নি।

১৯৬৮ সনের দিকে মিলিটারিরা শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে এবং সেখানে পাঁচ মাস নির্জন কারাবাসে আটক করে রাখে। তাঁর অবস্থান সম্পর্কে কেউ কিছু জানত না। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হলো। অভিযোগ আনা হলো যে ভারতের সঙ্গে যোগসাজনে পূর্ব পাকিস্তানী সৈনিকদের মধ্যে বিদ্রোহ গড়ে তুলে আইয়ুব সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা করছে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আনুষ্ঠানিক শুনানির জন্যে পঁয়ত্রিশ জনের সঙ্গে তাঁকে বের করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তারা জড়িত বলে অভিযোগ আনা হয়।

এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবের জনপ্রিয়তা বিপুলভাবে বেড়ে যায়। এর আগ পর্যন্ত নানা কার্যক্রম সত্ত্বেও তিনি প্রবীণতম নেতা ছিলেন না। এই মামলা তাঁকে বাঙালি জাতির নেতায় পরিণত করলো। তাঁর মুক্তির দাবী তুলে ছাত্ররা প্রচন্ড আন্দোলন গড়ে তুললো। আন্দোলনের ব্যাপকতায় আইয়ুবের শাসনযন্ত্র অচল হয়ে পড়ে এবং মুজিবের বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা তুলে নিতে বাধ্য। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মতো ছাত্র সমাজই আবার আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলো। ঢাকায় প্রগতিশীল ছাত্রনেতা আসাদ পুলিশের গুলীতে নিহত হলে গণ-আন্দোলন রূপায়িত হলো গণঅভ্যূত্থানে। ইতিহাসের অমোঘ বিধান দেরিতে হলেও আত্মপ্রকাশ করে ঝড়ের বেগে এবং নির্মমভাবে।

পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু হলো। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে সামরিক বাহিনী প্রকাশ্য দিবালোকে অধ্যাপক ডঃ শামসুজ্জোহাকে যথাক্রমে ১২ই ও ১৮ই ফ্রেবুয়ারিতে হত্যা করলে গণ-অভ্যূত্থান ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ঢাকায় ব্যাপক সরকারী সম্পত্তি বিনষ্ট এবং দৈনিক পাকিস্তান (দৈনিক বাংলা) ও মর্ণিং নিউজ পত্রিকা অফিস প্রজ্জ্বলিত হলো। সংগ্রামী জনতা কর্তৃক কারফিউ অগ্রাহ্য এবং পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলী বর্ষণ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলার বিচারক মন্ডলীর সভাপতি বিচারক আব্দুর রহমান একবস্ত্রে কোন রকম ঢাকা থেকে লাহোরে পালিয়ে গেলেন।

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের ছ'দফা জাতীয় স্বায়ত্ব শাসনের সংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত হলো। পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণ ছ'দফাকে নিজেদের প্রাণের দাবী

হিসেবে গ্রহণ করলো। এর ফলশ্রুতি হিসেবে জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থীর মিলিত প্রচেষ্টার 'উনসত্তরের আইয়ুব বিরোধী গণঅভ্যুত্থান শুরু হয়।

আমলাশাহী ব্যর্থ হলো। সামরিক কর্তৃত্ব হলো অচল । কেননা এতদিনে বাংলার মানুষ মরতে শিখেছে। আইন শৃঙ্খলার অবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি দেয়ার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। ৬ দফার আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিলো ১৯৬৯ সালে, যার ফলে পতন হলো এককালের পাকিস্তানের তথাকথিত লৌহমানব, স্বঘোষিত ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারির বিকেল নাগাদ শেখ মুজিবুর রহমানসহ তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলার অন্যান্য আসামিরা সামরিক হেফাজত থেকে মুক্তি পেলেন। সেদিনই বিকেলে শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। এ দিনই জনতা কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হলো।

পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ছ'দফা আন্দোলনের মতো এতো দ্রুত আর কোন আন্দোলন জনপ্রিয় হতে পারে নি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ও পরিপক্ব নেতৃত্ব আর সবচেয়ে 'জনপ্রিয় পার্টি' আওয়ামী লীগের গ্রামভিত্তিক ব্যাপক সংগঠন ও লাখ লাখ কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সক্রিয় জনসমর্থনে মাত্র সোয়া পাঁচ বছরের মধ্যে পূর্ববাংলা ছ'দফা থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে ।

গণ-আন্দোলন ১৯৬৯ সালে এক পর্যায়ে গণবিপ্লবের আকার ধারণ করায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান উপায়ন্ত না দেখে গোল টেবিল বৈঠকের আহ্বান করেন। রাওয়ালপিন্ডিতে প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে শেখ মুজিব দলবলসহ যোগদান করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে ছয় দফা দাবির ব্যাপক প্রচারের সুযোগ লাভ ছাড়াও শেখ মুজিব এ বৈঠকে ছ'দফা দাবিতে অটল থাকায় আইয়ুব-মুজিব আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। এর ফল হিসেবে পরবর্তী পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে ইতিহাসের অতলতলে তলিয়ে যান।

১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ ৭-১৫ মিনিটে ইয়াহিয়া খান দ্বিতীয় বার সামরিক শাসন জারি করে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি এ মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন যে, ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক কার্যকলাপের অনুমতি দেয়া হবে এবং এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর সমগ্র

দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশের জন্য একটা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। একই সঙ্গে পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশিক পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জেনারেল ইয়াহিয়া ভাষণেই ওই মুহূর্তে এক ইউনিট ভেংগে দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। ফলে ১৯৬৯ সালের পরবর্তী প্রায় দশ মাস শান্তিপূর্ণভাবেই অতিবাহিত হয়।

নির্বাচনী প্রচার এবং একদিকে ছ'দফার ভিত্তিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদাত্ত আহবানে পথ-প্রান্তর মুখরিত হয়ে ওঠলো। আওয়ামী লীগের প্রকাশিত "পূর্ব বাংলা শশ্মান কেনো"? পোস্টারের ভিত্তিতে কয়েক লাখ ছাত্র-কর্মী দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন ও আঞ্চলিকতার সমর্থনে অসংখ্য জনসভার আয়োজন করলো। পূর্ববাংলার বঞ্চনার জন্য সামগ্রিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদেরকে দায়ী করে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হলো। তাদের বক্তব্যে শ্রেণী-সংগ্রামের কথা অনুপস্থিত দেখে বাঙালি শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, জোতদার, সরকারী কর্মচারী এবং বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশ উৎসাহিত বোধ করলো এবং সক্রিয় সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করলো। কৃষক-শ্রমিক সমাজকে সন্তুষ্ট করার জন্য আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফের কথা থাকায় আওয়ামী লীগ সর্বহারাদের (গরীবদের) সমর্থন সংগ্রহে সক্ষম হলো। মোট কথায়, আওয়ামী লীগ অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবেই ইয়াহিয়া খানের নির্বাচনের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলো। পূর্ব বাংলার সর্বত্র উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তির আবির্ভাব হলো।

এহেন এক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর কালোরাতে পূর্ববাংলার দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে নজীরবিহীন এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানলো, যাতে দশ লাখ লোকের প্রাণহানি এবং তিরিশ লাখ মানুষ গৃহহীন হলো। অসংখ্য পশু মারা গেল, ক্ষতি হলো কোটি কোটি টাকার। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ও ইসলামপন্থী দলগুলোর কেউই দুর্গত এলাকা সফর করলো না। অথচ বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা শেখ মুজিবুর রহমান দূর্গত এলাকায় একটা ভাংগা লঞ্চ নিয়ে এক নাগাড়ে ন'দিন ব্যাপী ঝটিকা সফর করলেন। তিনি খুলনার পাইকগাছা থেকে শুরু করে ভোলার দৌলতখান, তজুমদ্দিন, চরফেশন, গলাচিপা, রাংগাবালি, বড় বাইশদিয়া, চরকাজল ও পানপট্টি এবং নোয়াখালী জেলার হাতিয়া, চরগাজী, চরআবদুল্লাহ, চর আলেকজান্ডার, রামগতি সফর করে স্বহস্তে রিলিফ বন্টন ও জনগণকে সান্ত্বণা প্রদান করেন। অন্যদিকে তিনি আওয়ামী লীগের বিরাট কর্মী বাহিনীকে রিলিফের জন্য কাজের নির্দেশ

দিলেন। ঘূর্ণিঝড় এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহ সংবাদে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে রিলিফ প্রদান করলেও কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে চরম অবহেলা প্রদর্শন করে। নির্বাচন প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন।

দুর্গত এলাকা থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে ১৯৭০ সালের ২৬শে নভেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন। দেশ-বিদেশের দু'শ সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। আওয়ামী লীগ এ উপ-মহাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী পার্টি হিসেবে পরিগণিত হলো। আওয়ামী লীগের প্রতিটি পদক্ষেপই ছিলো অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। দেশে এক বিকল্প সরকার হিসেবে ভূমিকা পালনের মহড়া করছিলো আওয়ামী লীগ। ২৬শে নভেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবর রহমান আড়াই হাজার শব্দের ইংরেজীতে লিখিত বিবৃতি পাঠ করেন এবং পরে সাংবাদিকদের কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দেন। বিবৃতিতে তিনি ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহতার বর্ণনা প্রদান করে বলেন-পটুয়াখালী, ভোলা, নোয়াখালীর কোন কোন এলাকায় ২০ থেকে ২৫ ভাগ জনসংখ্যা মাত্র জীবিত রয়েছে এবং এরা বর্তমানে খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুপথযাত্রী। সময়মতো রিলিফ প্রদান করলে হয়তো কিছু লোককে অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যেতো।

তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন-কেনো কেন্দ্র থেকে যৎকিঞ্চিত রিলিফ আসতে এতো বিলম্ব হলো ? কেন পশ্চিম পাকিস্তানে কয়েক শ' হেলিকপ্টার মওজুদ থাকলেও রিলিফের কাজে হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হলো না ? লিখিত বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, আমরা একটা স্বাধীন দেশের নাগরিকের জন্মগত অধিকার থেকেও বঞ্চিত। সবকিছু সিদ্ধান্ত রাওয়ালপিন্ডি আর ইসলামাবাদে হচ্ছে। সমস্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকার এবং এর ব্যুরোক্রাটসদের কুক্ষিগত। তাই আমি পূর্ববাংলার প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ এবং অবহেলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করতে চাই। এরা হচ্ছে ঘৃণ্য অপরাধী ও ঔপনিবেশবাদের ধ্বজাধারী। তিনি ছ'দফার যৌক্তিকতা বর্ণনা করে উপসংহারে বলেন-জনগণকে ক্ষমতা দখল করতে হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা নিতে হবে। নির্বাচন যদি বানচাল করা হয়, তা হ'লে জাগ্রত জনতার শক্তিতে ক্ষমতা দখল করতে হবে। জনগণ এর মধ্যেই তাদের হৃদয় এবং মন দিয়ে ভোট দিয়েছে। জনতা "শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার" যথেষ্ঠ দেখেছে। জাতীয় সংহতির নামে কেন্দ্রীয় সরকার অমার্জনীয় অপরাধ করেছে। তাই বাংলাদেশের জনসাধারণের পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনের দাবী আর কারো পক্ষে বাতিল করা সম্ভব নয়। ক্ষমতাসীনদের যারা মনে করেন যে, জনতার এই দাবিকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব, তাদের আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, বাংলাদেশ এখন জাগ্রত, যদি নির্বাচনকে বানচাল করা হয়,

তা'হলে সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে নিহত দশ লাখ মানবাত্মার কাছে ঋণী বাংলাদেশের জনসাধারণ আরও দশ লাখ জীবনের চরম মূল্য দিতে প্রস্তুত। এর উদ্দশ্যই হচ্ছে, মুক্ত মানুষের মতো বেঁচে থাকা এবং এর অর্থ হচ্ছে, বাংলাদেশ নিজেরাই তার ভবিষ্যৎ নির্ণায় করবে।

তারপর শেখ মুজিব নির্বাচনী প্রচারের জন্য মাত্র দশ দিনের সময় পেয়েছেন। তিনি উল্কার মতো পূর্ববাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনী অভিযানে ছুটে যায়। তিনি ছ'দফার পক্ষে সোচ্চার হলেন এবং পূর্ব বাংলার প্রতি কেন্দ্রের সীমাহীন লাঞ্ছনা আর সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ের ও কেন্দ্রের উদাসীনতার বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে এ সময় আওয়ামী লীগের প্রচারণা তুংগে ওঠেছিল।

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। পূর্ববাংলার ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের ২৮২টি আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন। ইহা এদেশের রাজনীতিকে বৈপ্লবিক ভাবধারায় প্রভাবান্বিত করে সুদূর-প্রসারী ফল লাভের সবিশেষ সাহায্য করে। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের ফলশ্রুতিই এ নির্বাচন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে বাংলার মানুষ তাঁর নির্বাচনী প্রতীক নৌকায় ভোট দিয়ে এক অভাবনীয় বিজয়ের রায় প্রদান করেন। এ নির্বাচন বস্তুতঃপক্ষে পাকিস্তানের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে এবং পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের ধারণা বিপর্যপ্ত হয়ে পড়ে। সত্তরের নির্বাচন আরো প্রমাণ করলো যে, আওয়ামী লীগই জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। পূর্ববাংলার জনগণের বিজয় দেখে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী হতভম্ব হয়ে পড়ে। নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ হবার পর দেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত প্রবাহিত হলো। বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রবক্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিভাবে পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করে নিজেদের আন্দোলনকে সুদৃঢ় করেছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী যখন আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে টালবাহানা ও ষড়যন্ত্র শুরু করে, ঠিক তখনই স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেয়া হয়। ফলে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালি জাতি পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। স্বাধিকার-পাগল বাঙালি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে সুদীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত করে।

জাতীর জনক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

'৭০-এর নির্বাচন ও প্রাসঙ্গিক কথা

১৯৭০ সালের ৯ই ডিসেম্বর সামরিক প্রহরায় অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন। দক্ষিণ ও বামপন্থী দলগুলো নির্বাচনী ফলাফলে স্তম্ভিত হলো, আর সামরিক জেনারেলরা ভ্রুকুঞ্চিত করলো। সবারই একই প্রশ্ন, ব্যাপার কি ? পশ্চিম পাকিস্তানে একটা আসনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলো কিভাবে। সমগ্র পাকিস্তান ভিত্তিক নির্বাচনী ফলাফল হলো আওয়ামী লীগ-১৬৭, পিপলস পার্টি-৮৮, অন্যান্য ৭টি দল-৪০, স্বতন্ত্র-১৪, জামাতে ইসলামী-৪ সর্বমোট-৩১৩। ইয়াহিয়া খান-এর সামরিক বাহিনীর প্রহরায় অনুষ্ঠিত পূর্ববাংলার নির্বাচনী রায় হলো- আওয়ামী লীগ-১৬৭, পিডিপি-১,স্বতন্ত্র-১, মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী এবং রুশপন্থী ন্যাপ কোন সেটি জয়লাভ করতে পারলো না। আলোচ্য নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ভোটাররা সেদিন কিভাবে ভোট প্রদান করেছিলো, তার শতকরা হার বিশেষ উল্লেখযোগ্য- আওয়ামী লীগ ৮৭%, মুসলিম লীগ এবং জামাতে ইসলামী একত্রে-৯%, ৫ দল ইসলাম পছন্দ জোট- ৯%, রুশপন্থী ন্যাপ ২.২৫% এবং স্বতন্ত্র-১.৭৫%। নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ হবার পর দেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত প্রবাহিত হলো। বাঙালি জাতীয়তাবাদী পাগল সাধারণ জনগণ এককভাবে এ পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছিলেন, তার কিছু তারিখওয়ারী বর্ণনা করা যায়।

১৮ই ডিসেম্বর, শেখ মুজিব বলেন, বাংলাদেশের জনগণের দাবি ছ'দফা এখন বাস্তবায়ন সম্ভব। বিশ্বের কোন শক্তিই এ দাবি রোধ করতে পারবে না। ২০শে ডিসেম্বর ভুট্টো বলেন, পিপলস পার্টির সহযোগিতা ছাড়া সংবিধান প্রণয়ন চলবে না এবং কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে দেয়া হবে না। ২১শে ডিসেম্বর বলেন-পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠদের জোরে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। বিরোধী দলীয় আসনে বসার জন্য পিপলস পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নি। সব ব্যাপারে আমাদের মতামত নিতে হবে এবং ক্ষমতার ভাগ দিতে হবে। ২৪ তারিখে বলেন-পিপল্স পার্টির সহযোগিতা ছাড়া কোন কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা যাবে না এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে কাজ করতে দেয়া হবে না। ২৭ তারিখে বলেন- পিপ্লস পার্টিকে বিরোধী দলীয় আসনে বসাবার যে-কোন প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে।

৩রা জানুয়ারি '৭১ শেখ মুজিব বলেন, ছ'দফা এখন আর পার্টির সম্পত্তি নয়, জনগণের সম্পত্তি। ছ'দফার ও এগারো দফার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত সংবিধান প্রণীত হবে। এ ব্যাপারে কেউ আর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। ৪ঠা জানুয়ারি বলেন-ছ'দফার পক্ষে জনগণের রায় ও গণভোটের ফলাফল নির্বাচিত এম.এন.এ'দের পরিবর্তনের ক্ষমতা নেই। ১১ই জানুয়ারি বলেন-আওয়ামী লীগ একাই কেন্দ্র ও পূর্ব বাংলার মন্ত্রিসভা গঠনে সক্ষম। ছ'দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে জনতার দাবি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ১৩ই জানুয়ারি '৭১ ভুট্টো বলেন-দেশের সংহতি রক্ষাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। একটা সর্বসম্মত সংবিধান প্রণয়ন এখন হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

১৪ই জানুয়ারি ঢাকায় বসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন-সংবিধান প্রণয়ন সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী। যখন তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, আমি আর ক্ষমতায় থাকবো না। শীঘ্র শেখ মুজিবের সরকার হবে।

৯ই ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব বলেন-পাকিস্তানের রাজনীতি, হচ্ছে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাস ঘাতকতার রাজনীতি। পার্লামেন্টের অধিবেশন আহবানে অহেতুক বিলম্ব দুঃখজনক। এটা একটি প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

১৩ই ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন-পাকিস্তানের জন্য ১টি সংবিধান প্রণয়নের জন্য ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ সকাল ৯ ঘটিকায় ঢাকার পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে পাকিস্তান জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহবান করা হলো।

জুলফিকার আলী ভুট্টো পরিষ্কার ভাষায় বলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর দল কিছুতেই ঢাকায় আহুত পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে পারে না। শুধু তাই নয়, তিনি বলেন-পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অধিবেশনে যোগদানের জন্য ঢাকায় গেলে তাদের আর দেশে ফিরতে দেয়া হবে না। আরো ঘোষণা করেন যে, তার দল বিরোধী আসনে বসার জন্য নির্বাচন করে নি। পিপল্‌স পার্টিকে ক্ষমতার অংশ দিতেই হবে, অন্যথায় ৩রা মার্চ পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত রক্তের গংগা প্রবাহিত হবে।

১৫ই ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব বলেন-ছ'দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণীত হবে। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের সংখ্যাধিক্যের রায় মেনে নেয়া বাঞ্ছণীয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করার আহবান জানাচ্ছি। তিনি বলেন-আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া শ্রেয়ঃ মনে করবো, তবুও কোন অবস্থাতেই

আত্মসমর্পণ করবো না। গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেই হবে। একই তারিখে ভুট্টো বলেন- নির্বাচিত সংখ্যাগুরু দল আওয়ামী লীগ প্রকাশ্যে অথবা গোপনে আমাদের কিছুটা 'কনসেশনের' প্রতিশ্রুতি না দেয়া পর্যন্ত পিপল্স পার্টি ঢাকায় ৩রা মার্চের আহুত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে যোগদান করবে না। সংখ্যাগুরু দল কর্তৃক ইতোমধ্যে প্রণীত একটা সংবিধানে কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মতি দেয়ার জন্য আমাদের পার্টির সদস্যদের পক্ষে ঢাকা যাওয়া এবং অপমানিত হয়ে ফিরে আসা সম্ভব নয়।

১৬ই ফেব্রুয়ারি এক সভায় মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসনী বলেন-ভুট্টো কর্তৃক প্রদত্ত পূর্বশর্ত পাকিস্তানের প্রতি হুমকি স্বরূপ। ১৭ তারিখে করাচীতে ভুট্টো বলেন- বর্তমান পরিস্থিতিতে ঢাকায় আসন্ন জাতীয় সংসদের অধিবেশনে যোগদান অর্থহীন। জাতীয় সংসদ এখন একটা "কসাই খানায়" পরিণত হয়েছে। শেখ মুজিব বলেন, বিশ্বের কোন শক্তিই আর বাঙালিদের দাসত্ব শৃংখলে আটকে রাখতে পারবে না। শহীদদের রক্ত আমরা বৃথা যেতে দেব না।

মুজিব ২৪ তারিখে বলেন-কায়েমী স্বার্থের দল ১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলার নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলো। ১৯৫৫ সালে সামরিক শাসন জারি করেছিলো। জাতীয় সংসদের অধিবেশন আরম্ভ হবার পর এসব ষড়যন্ত্রকারীরা আঘাত হানার জন্য অশুভ পাঁয়তারা করছে। ভুট্টো ও তার পিপল্স পার্টি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আসন্ন সংসদ অধিবেশনের স্বাভাবিক কাজকর্মে বাঁধার সৃষ্টি করে শাসনতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর বানচাল করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে।

শেখ মুজিব ২৮শে ফেব্রুয়ারি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এক সমাবেশে বলেন- "আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া শ্রেয়ঃ মনে করবো, তবুও কোন অবস্থাতেই আত্মসমর্পণ করবো না। গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেই হবে।"

জুলফিকার আলী ভুট্টো ১লা মার্চ করাচীতে বলেন-জাতীয় সংসদের অধিবেশন পিছিয়ে দেয়া হোক, না হয় এল.এফ.ও. প্রদত্ত দিনের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে সংবিধান প্রণয়ন করার নির্দিষ্ট বিধি সংশোধন করা হোক। আর পিপল্স পার্টির উপস্থিতি ছাড়া সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে ভয়াবহ গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা হবে এবং পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত জীবনযাত্রা বন্ধ করে দেয়া হবে। একই তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন পাকিস্তানে এখন ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে বিধায় জাতীয় সংসদের আসন্ন অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হলো।

ঐদিন মুজিব বলেন, জাতীয় সংসদের আসন্ন অধিবেশন স্থগিত খুবই দুঃখজনক। আমরা যে-কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সক্ষম এবং ৭ কোটি বাঙালির মুক্তির জন্য আমরা চরম মূল্যদানে প্রস্তুত। ষড়যন্ত্রকারীদের শুভবুদ্ধির উদয় না হলে বাঙালি নতুন ইতিহাস রচনা করবে। আওয়ামী লীগ ১লা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারা দেশব্যাপী হরতাল আহবান করে এবং ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত জনসভায় চূড়ান্ত প্রোগ্রাম ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

ঘটনাবহুল মার্চ ১৯৭১

বহু গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম, আন্দোলন, বহু বেদনা এবং একই সঙ্গে গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতার স্মৃতিবাহী মাস এই মার্চ। মার্চের সঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবনের এত কিছু বিষয় জড়িত, যা চিরকাল আমাদের জাতীয় ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। সকল চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেন বঙ্গবন্ধু। গর্জে ওঠলো তাঁর কণ্ঠ। দিক্‌দর্শন দিলেন তিনি। আন্দোলনের আভাস সুস্পষ্ট কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন। শুরু হলো সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্ব। সেই মাসটি ছিলো উত্তল একাত্তরের অতি বিশিষ্ট এই মাস। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী যে চেতনার জন্ম, যে সংগ্রামের সূচনা, সে চেতনা এবং সংগ্রামের সার্থক ও স্বাভাবিক পরিণতি একাত্তরের মার্চ।

বাঙালি জাতির জীবনে মার্চ এমন এক অবিস্মরণীয় মাস, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সমগ্র জাতির এক অতুলনীয় অনুপম আবেগ। মার্চ এলেই স্মৃতিতে হানা দেয় ২৭ বছর আগের অগ্নিঝরা দিনরাত্রির উত্তাল স্মৃতির স্ফুলিঙ্গগুলো, অসহযোগে আন্দোলনের উত্তাল ঢেউয়ে ভেঙ্গে পড়াতেই ৫৬ হাজার বর্গমাইলের ভূমিতে মার্চ কী বিশাল জোয়ার এনেছিল, তা ভাষায় ব্যক্ত করা দূরহ। দিকে দিকে শ্লোগান-মিছিলের গণজোয়ার। যেন চোখ বন্ধ করা মাত্র সেলুলাডের ফিতায় বন্দী চলচ্চিত্রের মতো সেই সব দৃশ্য একের পর এক চেতনার পর্দা ভেসে ওঠবে। যারা সেই অনুপম দিনরাত্রি দেখে নি, তাদের বোঝানো মুশকিল কী আশ্চর্য দুঃসময় পেরিয়ে আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। হয়ত নতুন প্রজন্মের কাছে সে আশ্চর্য সময়ের বীভৎস চিত্র তুলে ধরা সহজ হতো। যদি দু'যুগ ধরে সে গৌরবময় ইতিহাস মুছে দেবার মতো অবিরাম প্রক্রিয়া না চলতো।

যেখানে ৩রা মার্চ '৭১ নিশ্চিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা, এ অধিবেশন শুরুর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে প্রথম বাঙালি জাতি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার বিষয়টি প্রায় নিশ্চিত, সেখানে যখন ১লা মার্চ দুপুর ১টায় বেতার ভাষণে পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো ঘোষণা করলো যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হলো। তখন বাঙালি জাতি বুঝতে দেরী করে নি, এ আর এক চক্রান্ত। বাঙালিদের কিছুতেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে দেয়া হবে না। পহেলা মার্চ থেকেই সমগ্র পূর্ববাংলার চেহারাই পাল্টে গেলো।

বিভিন্ন জায়গায় সামরিক বাহিনীর সাথে ছাত্র-জনতার খন্ড মিছিলের সংঘর্ষ। রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে অন্ধকারাচ্ছন্নের ছায়া পড়লো। সমগ্র পাকিস্তানে তখন রাজনৈতিক উত্তপ্ত পরিবেশ।

ঐ দিনই শেখ মুজিব বলেন , জাতীয় সংসদের আসন্ন অধিবেশন স্থগিত করা খুবই দুঃখজনক। আমরা যে-কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সক্ষম এবং ৭ কোটি বাঙালির মুক্তির জন্য আমরা চরম মূল্যদানে প্রস্তুত। ষড়যন্ত্রকারীদের শুভবুদ্ধির উদয় না হলে বাঙালি জাতি নতুন ইতিহাস রচনা করবে। আওয়ামী লীগ ১লা মার্চ ঢাকা এবং ৩রা মার্চ সারাদেশব্যাপী হরতাল আহবান করে। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত জনসভায় চূড়ান্ত প্রোগ্রাম ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

১লা ও ২রা মার্চ ঢাকার ফার্মগেটে জনতার উপর গুলীবর্ষণের তীব্র নিন্দা ও অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয় এবং ৭ই মার্চ পর্যন্ত কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

* ৩রা মার্চ থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে ২টা পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ দিবস হরতাল।
* ৩রা মার্চ জাতীয় শোক দিবস এবং পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের জনসভা।
* বেতার ও টেলিভিশনে আন্দোলন সংক্রান্ত সঠিক সংবাদ ও বিবৃতি প্রচারিত না হলে বাঙালি কর্মচারীদের কর্মবিরতি।
* ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বেলা ২টায় জনসভা এবং পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা।

৩রা মার্চ নুরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে ছাত্রলীগ আয়োজিত পল্টন ময়দানের বিশাল জনসভায় বাংলাদেশের মানচিত্র উড়ান হয়। পরিবেশিত হয় প্রস্তাবিত জাতীয় সঙ্গীত। এই জাতীয় সঙ্গীত ও পতাকা বহন করেই গঠিত হয়েছিলো মুজিবনগর সরকার। এই জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্যই শহীদ হয়েছিলো হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ও ৩০ লাখ নিরীহ মানুষ। দু'লাখ মা-বোনরা সম্ভ্রম দিয়েছে। এক কোটি মানুষ শরণার্থী হয়েছিলো প্রতিবেশী ভারতে।

৪ঠা মার্চ সাফল্যজনকভাবে পূর্ণ হরতাল পালনের জন্য শেখ মুজিব সকল সংগ্রামী জনতাকে অভিনন্দন জানান। যে-কোন মূল্যে অধিকার আদায়ের জন্য জনতাকে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন তিনি।

৬ই মার্চ পাকিস্তানের গভর্ণর ভাইস-এ্যাডমিরাল এস.এম. আহসানকে অপসারণ করে লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে নতুন গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে নিজেদের মধ্যে সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। আমি ১০ই মার্চ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বৈঠক আহবান করেছিলাম ; কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এই বৈঠক প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই এই প্রেক্ষাপটে আমি ২৫শে মার্চ ঢাকা জাতীয় সংসদের প্রস্তাবিত অধিবেশন আহবান করলাম।

৬ই মার্চ ইয়াহিয়া খান এক জাতীয় ভাষণে সংসদের অধিবেশন ডাকার জন্য ২৫শে মার্চ ঠিক করলেন। সেই বক্তৃতা ছিলো ধমক, হুমকি ও শাসানিতে পরিপূর্ণ। সারা দেশ তখন তাকিয়ে আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৭ই মার্চ কি নির্দেশ দেন, সেদিকে।

৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দান (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) প্রায় তিরিশ লাখ জনতার ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণীয় বক্তৃতা দেন। এই সভায় বেলা তিনটা দু'মিনিট থেকে তিনটা বিশ মিনিট পর্যন্ত আঠারো মিনিট শেখ মুজিব ভাষণদান করেন। সুন্দর, স্বচ্ছ আর অমন তেজোদ্দীপ্ত বক্তব্য আজ পর্যন্ত উপমহাদেশে আর কোন নেতা কোনদিন দিতে পারেন নি। পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে নব নব ঘটনাপ্রবাহ অব্যাহত থাকলো।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ৭ই মার্চ এক ঐতিহাসিক অবিস্মরণীয় দিন। বিশ শতকের শেষ প্রহরে সাত সমুদ্র পেরিয়ে বিশ্ব ভূখন্ডের কোন প্রান্তে ক্ষুদ্র এই অঞ্চলের শেখ মুজিব নামে সেই নেতা বজ্রকণ্ঠে বলেন-"এরপর যদি একটা গুলী চলে আর, যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে অনুরোধ রইলো- প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দিবে"-সোচ্চার কণ্ঠে বলেন-"আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয়-বাংলা।"

জাতির উদ্দেশ্যে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ সমহিমায় ভাস্বর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা সৃষ্টিকারী ভাষণগুলোর অন্যতম ৭ই মার্চের ভাষণ। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙালি জাতিসত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় মানুষের

মর্যাদা নিয়ে বিশ্বসভায় স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়েছে এই ভাষণে। গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের ১৮৬৩ সালে প্রদত্ত বিখ্যাত গেটির্সবার্গ বক্তৃতার সঙ্গে তুলনীয়। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাতির উদ্দেশ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দিকনির্দেশনামূলক ৭ই মার্চের এ ভাষণ। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের প্রেক্ষাপটে রয়েছে বাঙালি জাতির সুদীর্ঘ আন্দোলন, সংগ্রাম ও রক্তদানের গৌরবময় ইতিহাস। উদার মন ও বিশাল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দেশবাসী তাঁর একান্ত আপসহীন, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের বিশাল জনতার সমক্ষে মুক্তিপাগল দেশবাসীকে 'ভাইয়েরা আমার' বলে সম্বোধন করেন।

এই ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়েই সর্বস্তরের জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো সর্বশক্তি দিয়ে পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলো এদেশের বীর সন্তানেরা। তারা যুদ্ধ করেছিলো, রক্ত দিয়েছিলো এই পবিত্র স্বাধীনতার জন্য। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে জাতি এক স্বাধীনসত্তা নিয়ে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রত্যয়ে। এ দিনে স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েছিলো তাদের চেতনা। এই অবিস্মরণীয় দিনটিকে স্মরণ করেই আপন জাতীয় চেতনায় একাত্ম ও ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো এদেশের মানুষ। জীবন বাজী রেখে অবিনাশী এক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ যে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়েছিলো, তাতে সর্বস্তরের মানুষ অংশ নিয়েছিলো।

এই ভাষণের ফলেই ন'মাসের এক অসম ও বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। বস্তুতঃ এযুদ্ধ তার জীবনশক্তি, নিখাদ স্ব-দেশপ্রেম এবং স্বতন্ত্র জাতীয় চেতনার জাগরণই আমাদের উত্তীর্ণ করে দিয়েছে স্বাধীনতা। বহু যুগ ও শতাব্দীর দাসত্বের শৃংঙ্খল মোচন করে আমরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছি একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতির মর্যাদায়।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক জনসভার পর আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ঐদিন রাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অহিংসভাবে অসহযোগ আন্দোলনের আহবান জানালেন।

৯ই মার্চ টিক্কা খানকে 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি বি, এ, সিদ্দিকী ৯ই মার্চ টিক্কা খানকে শপথ পাঠ করাতে অস্বীকৃতি জানান। ৯ই মার্চ মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি ৭ই মার্চের শেখ মুজিবের আহবান, মুক্তি ও

স্বাধীনতার ডাক সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে বলেন, আগামী ২৫শে মার্চের মধ্যে ৭ কোটি মানুষের দাবি মানা না হলে বঙ্গবন্ধুর সাথে একাত্ম হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

১১ই মার্চ আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে সাফল্যজনকভাবে অব্যাহত রাখার জন্য জনসাধারণকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি দেন। পাকিস্তানের কয়েকটি দলের নেতৃবৃন্দ সরকার গঠন এবং সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবকে দেয়ার আহবান জানান এবং মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের প্রস্তাব দেন।

১৪ই মার্চ করাচিতে জনসভায় ভুট্টো স্পষ্ট ভাষায় বলেন- শেখ মুজিবুর রহমানের দাবি মোতাবেক পার্লামেন্টের বাইরে সংবিধান সংক্রান্ত "সমঝোতা" ছাড়া ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পৃথকভাবে দু'টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। ১৫ই মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন-শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য পাকিস্তানের শাসন কার্য পরিচালনা করা যাবে না। পিপল্স পার্টিকে বাদ দিয়ে কোন সরকার গঠন সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু পার্টি দু'টোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতা আওয়ামী লীগের কাছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা পিপল্স পার্টির নিকট দিতে হবে। এ বক্তব্যের পর সমগ্র পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। ভুট্টোর বক্তব্যের প্রতিবাদ করে পাকিস্তানের অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ বিবৃতি প্রদান করেন। একটা দেশের দু'টি সংখ্যাগুরু পার্টির প্রশ্নই উঠতে পারে না। কেননা পাকিস্তান হচ্ছে একটা দেশ। লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে শেখ মুজিব বিবৃতি প্রদান করেন। এ তারিখেই কড়া নিরাপত্তার মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা আগমন করেন।

ঐতিহাসিক নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগুরু দলের নেতা এবং যার নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানে কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রশাসন পরিচালিত হচ্ছে, সে অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব আর অন্যদিকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার ইয়াহিয়া খানের মধ্যে প্রথম দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো ১৬ই মার্চ। দু'জনেই দুই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কথাবার্তা বলেছেন এবং পরে আলোচনা মুলতবি হয়ে যায়।

১৭ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্বিতীয় বৈঠকে বসেন। এ বৈঠকে উভয় পক্ষের পরামর্শদাতারা যোগদান করেন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের গণতান্ত্রিক রায়ের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং ছ'দফার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত

সংবিধান রচনার যৌক্তিকতা তুলে ধরে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আওয়ামী লীগের যুক্তিপূর্ণ ও স্পষ্ট বক্তব্যে সামরিক জনতার পরামর্শদাতারা হতভম্ব হলেন। বৈঠকে অচলাবস্থায় সৃষ্টি হলো। এই তারিখেই প্রেসিডেন্ট ভবনে রাতে ইয়াহিয়া-টিক্কা খান বৈঠক করেন। বৈঠকে ইয়াহিয়া খান বললেন-"শয়তানটা ঠিক মতো কথাবার্তা বলছে না"। রাত ১০টায় গভর্ণর টিক্কা খান জি,ও,সি, মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজাকে ফোন করে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণে প্রস্তুত হবার নির্দেশ দেন। সামরিক জান্তার জেনারেলদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকে নিরাপরাধ বাঙালি হত্যার নীল নক্সা প্রণীত হলো। ষোল অনুচ্ছেদে পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী এই নীল নকশায় গণহত্যার বিস্তারিত নির্দেশ লিপিবদ্ধ করা হলো। ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা দীর্ঘায়িত হবার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ চূড়ান্ত সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে থাকে। পূর্ববাংলার সর্বত্র শুরু হলো যুবকদের সামরিক ট্রেনিং।

১৯শে মার্চ ইয়াহিয়া এবং শেখ মুজিব-এর মধ্যে ৯০ মিনিটকাল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যার পরে পুনরায় মুজিবের তিন জন পরামর্শদাতা এবং ইয়াহিয়ার পরামর্শদাতাদের পৃথক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সামরিক জান্তা 'জয়বাংলা' শ্লোগানের ব্যাখ্যার কথা জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু বললেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়েও তিনি কলেমা পাঠের সংগে 'জয় বাংলা' উচ্চারণ করবেন। ঐ দিন রাজধানী ঢাকা নগরীতে অসংখ্য প্রতিবাদ সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সামরিক বাহিনী জয়দেবপুরে গুলীবর্ষণ ও কারফিউ জারী করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর বিবৃতিতে বললেন-"সামরিক জান্তা যদি মনে করে থাকে, বুলেট দিয়ে জনগণের সংগ্রাম বন্ধ করতে সক্ষম হবে, তা'হলে তারা আহম্মকের স্বর্গে বাস করছে"।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সংগে চতুর্থ দফা বৈঠক ২০শে মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আওয়ামী লীগের সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহম্মদ এবং ডঃ কামাল হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উভয় পক্ষের পরামর্শদাতারা পৃথক ভাবে বৈঠক করে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

২১শে মার্চ পরামর্শদাতাদের সঙ্গে করে পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় আগমন করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও মুজিব আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি অবহিত হন। তিনি বলেন-সমস্যা সমাধানের জন্য ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা হতে হবে। এ দিনেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তাঁর বাসভবনের সামনে অপেক্ষমান এক বিরাট জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করে বলেন-"সাড়ে সাত কোটি মানুষের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনের গতি কোনক্রমেই মন্থর করা যাবে না।"

২২শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে প্রচারিত এক ঘোষণায় ২৫শে মার্চ পার্লামেন্ট অধিবেশন পুনরায় স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টো বলেন-শেখ মুজিবের সাথে তিনি আরও ফলপ্রসূ এবং সন্তোষজনক আলোচনা করতে আগ্রহী কেননা, সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে প্রথমে তাকে ও শেখ মুজিবকে একমত হতে হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিরাট এক সভায় বলেন-"কোন জাতির পক্ষে আত্মদান ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছাড়া সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। একটা ঐক্যবদ্ধ জাতিকে বেয়োনেট ও বুলেট দিয়ে দাবিয়ে রাখা যায় না।" বিবৃতিতে তিনি বলেন-"লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তুলতে হবে-প্রতিরোধের দূর্গ। আমাদের দাবি ন্যায় সংগত। তাই সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত।" বিদেশী এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেন-"বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের তিনিই হচ্ছেন প্রতিনিধি। তাই একমাত্র তাঁরই শাসন করার অধিকার রয়েছে।"

২৩শে মার্চ ইয়াহিয়া ও মুজিব আলোচনার প্রেক্ষাপটে সকাল সন্ধ্যার দু'দফায় পরামর্শদাতাদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের মধ্যে ছিলেন সর্বজনাব তাজউদ্দিন. সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও ডঃ কামাল হোসেন এবং সামরিক জান্তার পক্ষে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এম, এম, আহম্মদ, বিচারপতি এ, আর, কার্ণেলিয়াস, লেঃ জেনারেল পীরজাদা ও কর্নেল হাসান। পিপলস পার্টির জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ অন্যান্য পার্টির নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করেন। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আলোচনার শুভ পরিণতি হওয়া উচিত বলে অনেকেই সাংবাদিকদের সাথে মন্তব্য করেন। শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন-"আসুন আমরা সবাই ভালোর জন্য প্রার্থনা করি। কিন্তু আমাদের সবাইকে একটা ভয়ংকর কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।"

বিকেলে ধানমন্ডির বাসভবনের সামনে বিরাট জনতার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন-"আমরা তা' বরদাসত করবো না। আমাদের দাবি অত্যন্ত স্পষ্ট ও ন্যায়সংগত। ওদের তা' মেনে নিতে হবে। কোন রকম 'রক্ত চক্ষু' দেখিয়ে লাভ নেই। আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। আমরা কোন শক্তির কাছে মাথা নত করবো না। আমরা পূর্ববাংলার জনগণকে মুক্ত করবোই। আমাদের কেউ কিনতে পারবে না। আন্দোলনও তীব্রতর করার নির্দেশ দেয়ার জন্য অধিকার আদায়ের ভয়াবহ সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। সাত কোটি বাঙালী আর দাস হয়ে থাকবে না।" এ দিন পূর্ববাংলার প্রতিটি গৃহে নতুন জাতীয়

পতাকা ও কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' সংগীত পরিবেশিত হয়।

২৪ শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হয়েছে তার প্রেক্ষাপটে তাদের পরামর্শদাতাদের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে সকাল সন্ধা দু'দফায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আলোচনার কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় নি। ভুট্টো সারাদিন তার পরামর্শদাতাদের নিয়ে হোটেল কক্ষে অস্থিরভাবে কাটালেন। পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং প্রেসিডেন্ট-এর সাথে পৃথক পৃথক সাক্ষাৎ করেন।

২৫ শে মার্চ সকালে জুলফিকার আলী ভুট্টো তার পরামর্শদাতাসহ ইয়াহিয়ার সাথে দীর্ঘ ৪৫ মিনিট ব্যাপী বৈঠক করেন। বৈঠকে লেঃ জেনারেল পীরজাদাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকশেষে ভুট্টো সাংবাদিকদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্ত বলেন। সাংবাদিকগণ তাঁকে প্রশ্ন করেন "তা'হলে আলোচনা ভেংগে গেছে ?" জবাবে ভুট্টো পাশ কাটিয়ে বলেন- আমরা কোন অসুবিধার সৃষ্টি করছি না। স্বায়ত্ত্ব শাসনের প্রশ্ন তুলে বলেন-আওয়ামী লীগ যে ধরণের স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছে তাকে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন বলা চলে না। ওদের দাবি তো স্বায়ত্ত শাসনের চেয়েও বেশী-প্রায় সার্বভৌমত্বের কাছাকাছি। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতা বলেন-জাতীয় পরিষদকে দু'টো ভাগ করা চলবে না। তা'হলে পাকিস্তান দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবে বলে মুসলিম লীগের নেতারা হুসিয়ার উচ্চারণ করেন।

রংপুর, চট্টগ্রামসহ সারা দেশের পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হয়ে পরে। যখন ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনা প্রেক্ষাপটে একটা রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা চলছে, তখন এ ধরণের ঘটনাবলী দুঃখজনকভাবে পরিবেশকে আরো ঘোলাটে করে তুলে। সমস্ত দিন বঙ্গবন্ধু ৩২ নম্বরে বাসভবনে জনতার ঢল নেমে আসে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন-"বিশ্বের কোন শক্তিই পূর্ববাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ন্যায়সংগত এবং আইন সংগত দাবিকে নস্যাৎ করতে পারবে না। স্বাধীনতার দাবিকে শক্তির দাপটে দাবিয়ে রাখার জন্য যদি কেউ রক্তাক্ত চক্ষু প্রদর্শন করে, আমরা তা বরদাশত করবো না এবং তা নিশ্চিহ্ন করে দেবো।"

আনুষ্ঠানিকভাবে যখন ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা ব্যর্থ হয় নি বিধায় নয়া ফর্মূলার প্রেক্ষাপটে ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত একটি প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত বৈঠকে যোগদানের জন্য ২৫ শে মার্চ সমস্ত দিন ধরে বঙ্গবন্ধুর পরামর্শদাতারা আমন্ত্রণের জন্য

অপেক্ষা করলেন। সবাই মনে করেছিলেন, প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে প্রত্যাশিত ফোন আসবে। কিন্তু সবাইর ধারণা উল্টে গিয়ে দিবাগত রাতে ঢাকায় শুরু হলো ইতিহাসের সর্বচেয়ে বর্বরোচিত ও পৈশাচিক হত্যাকান্ড।

২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে আকস্মিকভাবে ইয়াহিয়া করাচীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।

সংগ্রাম, আন্দোলন, ক্রমাগত রক্ত ঝরানো এবং জীবন উৎসর্গ করার ধারাবাহিকতায় এসেছিলো ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন। সে নির্বাচনে এ দেশের মানুষ, এ দেশের স্বার্থে, বাঙালির স্বার্থে যে অভূতপূর্ব ঐক্য দেখিয়েছিলো ব্যালটের মাধ্যমে, তা ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। সে ব্যালটের রায় দেখে ভীত হয়ে পড়েছিল তৎকালিন পাকিস্তানী স্বার্থবাদী মহল ও শাসকগোষ্ঠী। ইতিহাসে আরেক অধ্যায় সৃষ্টি হয় অভূতপূর্ব অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে। এমনভাবে একের পরে এক উজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টির পর আসে পঁচিশে মার্চের রাত।

বাঙালি জাতির অধিকার ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জীবনপণ সংগ্রামের শুভসূচনা হয়েছিলো এই রাতেই। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর ভাষণ, যা বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের দিক নির্দেশনা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত হয়ে আছে। এ সবই দিক নির্দেশনায় তৎকালীন পাকিস্তানী হানাদারবাহিনী উপলব্ধি করেছিলো এ দেশ থেকে তাদের চলে যেতে হবে চিরতরে। একথা স্মরণে রেখেই পাকিস্তানী শাসকচক্র বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার নামে প্রহসণের রাজনীতি করেও যখন বুঝলো বাঙালি জাতির স্বাধিকারের পথ রোধ করা দুঃসাধ্য, তখন ২৫শে মার্চ রাতে বর্বরবাহিনী সৈন্যদের লেলিয়ে দিয়ে বাংলার ঘুমন্ত নিরস্ত্র মানুষকে নির্বিবাদে হত্যা শুরু করে। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বাঙালি জাতিকে চিরতরে বিলীন করার শপথ নিলেন গভর্ণর জেনারেল টিক্কা খান। এ দেশের ঘুমন্ত নিরস্ত্র মানুষের ওপর রাস্তায় ট্যাঙ্ক কামান চালিয়ে বর্বরবাহিনী সাধারণ নাগরিকদের ঘর-বাড়ী, মসজিদ-মন্দির, সংবাদপত্র অফিস, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস, পুলিশ-বিডিআর বাহিনীর ঘাঁটিসহ সর্বত্র আক্রমণ চালায়। হানাদার বাহিনী সেই কালো রাতে বস্তিবাসী থেকে শুরু করে এ দেশের সর্বস্তরের মানুষের উপর আক্রমণ চালায়। হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষ সেই ভয়াল রাতে লাশে পরিণত হয়েছিলো কোন কিছু অনুধাবন উপলব্ধির পূর্বে। সেই ভয়াবহ কালো রাত্রির অন্ধকারে জেনারেল টিক্কা খানের পরিচালনায় বর্তমান রাজধানী ঢাকায় হানাদারবাহিনীর কামানের অবিরত গোলাবর্ষণে আকাশ রক্তিম আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো। বিরামহীন মর্টারের কর্ণবিদারী আওয়াজে রাতের নিস্তব্ধতাকে অশান্ত করে ভীত

সন্ত্রস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো। মানুষ হয়েছিলো বিচলিত ও উদ্বিগ্ন। হানাদার বাহিনীর এই সামরিক অভিযানের নামকরণ করা হয়েছিলো "অপারেশন সার্চলাইট"। ঢাকা নগরীসহ দেশের অন্যান্য শহরে একইভাবে গোলাবর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, হত্যা লুন্ঠন এবং অমানুষিক বর্বরতার কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছিলো। সেই ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণায় মানুষকে সাময়িকভাবে অবিচলিত কণ্ঠরোধ, নির্বাক করে দিয়েছিলো, পঁচিশে মার্চের সেই কলংকময় কালো রাতে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত থেকে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার যে উন্মদনায় মেতেছিলো তার প্রথম ধাক্কায় ঘুমন্ত নিরীহ হাজার হাজার বাঙালির রক্তে লাল হয়েছিলো বাংলার মাটি। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে মানুষের ওপর যে স্ট্রীম রোলার চালাবার হীন চক্রান্ত লিপ্ত হয়, তা বীর বাঙালি অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে ২৬শে মার্চ থেকেই সেনাবাহিনীর "অপারেশন সার্চলাইট" হত্যাযজ্ঞ প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে এদেশের ৭ কোটি মুজিব সৈনিক সে দিন প্রকৃত অর্থেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলো।

২৫শে মার্চ কালের নিয়মেই দিনটি আমাদের কাছে ভয়াল আর বিভীষিকাময় রাতের স্মৃতিবহন করে। মার্চের এ রাত বাংলার মাটিকে রক্তে রঞ্জিত করেছিলো। সে রাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী অন্ধকারে হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিকামী নিরস্ত্র বাঙালি জাতির ওপর। নির্বিবাদে তারা যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলো বিশ্বের ইতিহাসে সে ঘটনা এক কলঙ্কিত অধ্যায় হয়ে আছে। এই কলঙ্ক অধ্যায় একদিকে জাতির কাছে এক ভয়াল ও বিভীষিকাময় 'গণহত্যার' রাত হলেও অন্য দিকে এ রাতের বুক চিরেই বাঙালি জাতি স্বাধীনতা সূর্যের অভ্যুদয় ঘটানোর লক্ষ্যে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী অভিযাত্রা। শেখ মুজিব নির্দেশিত পথে সমগ্র জাতি যখন ঐক্যবদ্ধ, যখন পাকিস্তানী স্বৈরশাসকদের নিগর ভেঙ্গে বাঙালি জাতি স্বাধিকার আন্দোলনে সক্রিয়, তখন পাকিস্তানী শাসক ভুট্টো ইয়াহিয়া চক্র নির্বিবাদে গণহত্যা চালিয়েছিলো। কিন্তু হানাদার বাহিনী এ দেশের মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির পথকে রুদ্ধ করতে পারে নি। ২৫শে মার্চ পাকিস্তানীরা বাঙালি জাতিকে রাতের অন্ধকারেই চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তারা পারে নি, বর্বর হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে মুক্তিকামী মানুষকে প্রতিরোধ করা যায় না। সে কথা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমেই প্রমাণিত হলো।

স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা ও মুজিবনগর সরকার

পাকিস্তানী জেনারেলগণ বাঙালিদের হত্যা করার লক্ষ্যে "অপারেশন সার্জ লাইট" পরিকল্পনা তৈরি করে। ইয়াহিয়া খান অপারেশনের নির্দেশ দিয়ে রাতেই পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর নির্দেশে ২৫শে মার্চ রাত ১২টায় পাকবাহিনী ঢাকায় জনগণের উপর হঠাৎ আক্রমণ করে। পাকসেনাদের হঠাৎ এ আক্রমণের সংবাদ পেয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ২৫শে মার্চ রাতেই বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দেন। তার বার্তার মাধ্যমে সব জায়গায় তাঁর ঘোষণা পাঠিয়ে দেন। তাঁর বার্তায় বলেন-

পাক আর্মি হঠাৎ করে পীলখানার ই.পি.আর. ক্যাম্প ও রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং রাজধানীর জনগণকে হত্যা করছে। ঢাকা চট্টগ্রামে প্রত্যেক রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের রাষ্ট্র সমূহের নিকট সাহায্য কামনা করছি। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরের মত শত্রুর সাথে যুদ্ধ করছে। আমি অনুরোধ করছি এবং আল্লাহর নামে নির্দেশ দিচ্ছি দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করুন। পুলিশ, ই.পি.আর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং আনসারদেরকে আমাদের পার্শ্বে দাঁড়াতে এবং যুদ্ধ করতে বলুন। কোন রকম সন্ধি হবে না। জয় আমাদের হবেই। মাতৃভূমির মাটি হতে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। এ সংবাদ আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী অন্যান্য দেশপ্রেমিক এবং যারা স্বাধীনতাকে ভালবাসে তাদের নিকট পৌঁছে দিন। খোদা আপনাদের সহায় হউন। জয় বাংলা-শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধুর প্রেরিত উল্লেখিত বার্তা যথাসময় চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতা এম.এ. হান্নানের কাছে পৌঁছে। তিনি চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র হতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা সম্বলিত বাণী প্রচার করেন। চট্টগ্রামের পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি ঘটায় অবস্থার মোকাবেলার জন্য স্টাফ আর্টিস্ট জনাব বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে কয়েকজন দুঃসাহসী বেতার কর্মী কালুরঘাটস্থ ট্রান্সমিটার সংগঠিত করে "বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র" স্থাপন করলেন। ২৬শে মার্চ সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে এই ঐতিহাসিক বেতার কেন্দ্রে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ

অনুষ্ঠানেই বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রেরিত স্বাধীনতার বাণী বাংলা অনুবাদ পাঠ করেন অধ্যাপক আবুল কাশেম সন্দ্বীপ। ২৭শে মার্চ এই বিপ্লবী বাংলা রেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেন মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারে মহামান্য প্রেসিডেন্ট)।

২৫শে মার্চ রাতে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার তারবার্তা ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের প্রায় জেলায় পৌঁছে যায়। ঐদিন রাতেই বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করে নিয়ে যায় পাকিস্তানে। ২৬শে মার্চ সকাল ৮টায় বরিশালে নূরুল ইসলাম মঞ্জুর কাছে তারবার্তা পৌঁছে। তিনি পটুয়াখালী, ভোলা, বরগুনা, পিরোজপুর ও ঝালকাঠিতে তারবার্তার কপি পৌঁছে দেন।

২৫শে মার্চ রাতে পাকবাহিনী পীলখানা ও রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করলে ই.পি.আর, পুলিশ প্রতিরোধ করে এবং যুদ্ধ করে শত শত পুলিশ শহীদ হয়। পাকবাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলসমূহ ও শিক্ষকদের বাসগৃহে আক্রমণ করে ছাত্র ও শিক্ষকদের হত্যা করে। ২৫ ও ২৬শে মার্চ ঢাকা শহরে প্রায় ৭ হাজার নাগরিককে হত্যা করে। শহীদ মিনারকে তারা ধ্বংস করে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও যশোর ক্যান্টনমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের অনেককেই হত্যা করে। বরিশাল পটুয়াখালীর শত শত চাকরিরত সৈন্য নিহত হন। বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ বাহিনীর বহু সদস্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে।

২৬শে মার্চ ওয়ার্লেসে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা বার্তা পেয়েই নূরুল ইসলাম মঞ্জু মেজর জলিলকে আনার জন্য উজিরপুরে লোক পাঠান। তিনি এসে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ঐ দিনই আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দদের নিয়ে বরিশালে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। সংগ্রাম পরিষদ সব রকমের অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে এক সুখী, সমৃদ্ধ, সুন্দর সমাজতান্ত্রিক ও শোষণহীন সমাজ কায়েমে অঙ্গীকার করেন। গঠিত সংগ্রাম পরিষদের নিম্নেবর্ণিত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়ঃ-

১.	জনাব আব্দুল মালেক খান	-	সভাপতি
২.	জনাব নূরুল ইসলাম মঞ্জুর	-	বেসামরিক প্রধান
৩.	জনাব মেজর এম.এ. জলিল	-	প্রতিরক্ষা প্রধান
৪.	জনাব হেমায়েত উদ্দিন আহমেদ	-	সমন্বয়কারী
৫.	জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ	-	খাদ্য

৬.	জনাব আমিনুল হক চৌধুরী	-	বিচার
৭.	জনাব শামসুল হক চৌধুরী	-	জ্বালানী
৮.	জনাব আমির হোসেন	-	ত্রাণ
৯.	জনাব ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন	-	তথ্য
১০.	জনাব হাসান ইমাম চৌধুরী	-	সিভিল ডিফেন্স
১১.	জনাব সর্দার জালাল উদ্দিন	-	যোগাযোগ

এছাড়া সকল এম, এন, এ, ও এম, পি, গণ জেলা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেন। তৎকালীন জেলা প্রশাসক আইয়ুবুর রহমান প্রশাসনের দায়িত্বভার সংগ্রাম পরিষদের বেসামরিক প্রধান নূরুল ইসলাম মঞ্জুরকে হস্তান্তর করেন। সকল কর্মচারী তাদের দায়িত্ব সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশে পালন করে। সদর গার্লস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংগ্রাম পরিষদের সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। মেজর জলিল বরিশাল মহিলা কলেজে থাকতেন এবং মহিলা কলেজে সামরিক ঘাঁটির দপ্তর ছিলো। এস,পি ফারুক উদ্দিন আহমেদ ও এ,এস,পি, গোলাম আহমেদ-এর সহায়তায় বরিশাল পুলিশ লাইন থেকে রাইফেল সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ ও বিভিন্ন স্থানে ট্রেনিং ক্যাম্প চালু করা হয়।

২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত বরিশাল ছিলো হানাদারমুক্ত। উপরোক্ত সবাই মিলে সুশৃঙ্খলভাবে বরিশালের প্রশাসন পরিচালনা করেন। আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ (বর্তমানে প্রধান হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ) সে সময় মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।

১০ই এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমেদ স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা বলা হয়। বিবৃতিতে আরও জানানো হয় যে, অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে শপথ গ্রহণ করাবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় পত্র-পত্রিকা ও বেতার ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রে এ সংবাদ প্রকাশিত এবং বেতারে প্রচারিত হয়।

কসবা-আখাউড়া সেক্টরে স্বল্পকালীন স্থায়ী একটি এক কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার সম্বলিত স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র থেকে এগারোই এপ্রিল 'প্রধানমন্ত্রী' তাজউদ্দিন আহমদের একটি রেকর্ডকৃত ভাষণ প্রচারিত হয়। এই বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন

আহমেদ কুমিল্লা-সিলেট এলাকায় মেজর খালেদ মোশাররফ, চট্টগ্রাম-নোয়াখালী এলাকায় মেজর জিয়াউর রহমান, ময়মনসিংহ-টাংগাইল এলাকায় মেজর শফিউল্লাকে মুক্তিযুদ্ধের কর্তৃত্ত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেন।

১৩ই এপ্রিল নির্বাচিত মুজিবনগর সরকারের ছয় সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ও দফতর ঘোষণা করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর "ভবেরপাড়া" গ্রাম। চুয়াডাংগা থেকে ভবেরপাড়া মাত্র ১৮ মাইল দূরে। এ নিঝুম পল্লী গ্রামে ১৭ই এপ্রিল তারিখে নব নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত হন। শতাধিক সাংবাদিক, বেতার ও টিভি প্রতিনিধিদের এই গ্রামে আনা হয়। নব নির্বাচিত সদস্যদের নিয়েই বাংলাদেশ সরকার গঠন করে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেয়া হয়। এলাকার প্রায় ৫ হাজার গ্রামবাসী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলো।

মেহেরপুর ভবেরপাড়া আম্রকাননে দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের উপস্থিতে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র পাঠের পর মন্ত্রী সভার সদস্যদের মধ্যে দপ্তর বন্টন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান............................রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক
সৈয়দ নজরুল ইসলাম.................................. উপ-রাষ্ট্রপতি
তাজউদ্দীন আহমেদ.................................... প্রধানমন্ত্রী
এম.মনসুর আলী... অর্থ-মন্ত্রী
এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান............................স্বরাষ্ট্র,ত্রাণ ও পূণর্বাসন মন্ত্রী
খন্দকার মোস্তাক আহমদ.............................. পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রী

"ভবেরপাড়া" গ্রামে সবাইর উপস্থিতিতে এক নাতিদীর্ঘ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং সর্বাধিনায়ক-এর দায়িত্বপালন করায় আনসারদের, প্রাক্তন পুলিশ ও ই.পি. আর.দের দু'টি পৃথক পৃথক প্লাটুনের কাছে থেকে অভিবাদন গ্রহণ করেন। অভিবাদন অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বরিশালের মাহবুব উদ্দীন আহমেদ বীর বিক্রম। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয় এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা হয়। অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে মুহু মুহু শ্লোগানের মাধ্যমে এলাকা মুখরিত হয়ে উঠে। অনুষ্ঠানে প্রধান সেনাপতি হিসেবে আওয়ামী লীগ দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য, অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ওসমানীর

নাম ঘোষণা করা হয়। "ভবেরপাড়া" গ্রামের নাম পরিবর্তন করে মুজিবনগর করা হয়। বিশ্বের কাছে মুজিবনগর সরকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

১৭ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করে মুজিবনগর সরকার শপথ বাক্য পাঠ করে বিশ্বের কাছে পরিচিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার মেজর জলিলকে নবম সেক্টরের দায়িত্ব প্রদান করেন। ১৭ই এপ্রিল বরিশালে সংগ্রাম পরিষদ ও মুক্তিযোদ্ধাগণ শোভাযাত্রা বাহির করেন এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শপথ গ্রহণ করেন।

ভিন্ন দেশের মাটিতে এক কোটিরও অধিক উদ্বাস্তু সামলানো, প্রধানতঃ একেবারে সামরিক ধারণাবিহীন স্বেচ্ছায় আগমনকারী জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করা এবং সর্বোপরি অভ্যন্তরীণ নানা ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে সিভিল কর্তৃত্বে সার্বিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও তার সফল পরিণতি ঘটানোর কৃতিত্বের অধিকারী এই মুজিবনগর সরকার। বিভিন্ন রণাঙ্গণে মুক্তিযোদ্ধারা নয় মাসব্যাপী যে-সকল বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করেছেন, সে যুদ্ধ কার্যক্রমের পশ্চাতে প্রধান চালিকাশক্তি ছিলো মুজিবনগর সরকার।

<u>একনজরে মুজিবনগর সরকার</u>

স্থাপিত	ঃ	১০ই এপ্রিল ১৯৭১
শপথ গ্রহণ	ঃ	১৭ই এপ্রিল ১৯৭১
অস্থায়ী সচিবালয়	ঃ	মুজিবনগর
ক্যাম্প অফিস	ঃ	৮ থিয়েটার রোড, কোলকাতা
রাষ্ট্রপতি	ঃ	বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান (পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন)
উপ-রাষ্ট্রপতি	ঃ	সৈয়দ নজরুল ইসলাম (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)
প্রধানমন্ত্রী	ঃ	তাজউদ্দীন আহমদ
অর্থমন্ত্রী	ঃ	এম,মনসুর আলী
স্বরাষ্ট্র,এাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী	ঃ	এম,কামরুজ্জামান
পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রী	ঃ	খন্দকার মোশতাক আহমেদ
প্রধান সেনাপতি	ঃ	মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী
চীফ অফ স্টাফ	ঃ	আবদুর রব
বিমান বাহিনী প্রধান	ঃ	এ, কে, খন্দকার

প্রতিরক্ষা সচিব	ঃ	আব্দুস সামাদ
অর্থ সচিব	ঃ	খোন্দকার আসাদুজ্জামান
মন্ত্রীপরিষদ সচিব	ঃ	তওফিক ইমাম
সংস্থাপন সচিব	ঃ	নূরুল কাদের খান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে জোরদার করার নিমিত্তে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ রণাঙ্গণকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করেছিলেন। প্রতিটি সেক্টরে একজন করে অধিনায়ক নিযুক্ত করে ব্যাপকভাবে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। ১১টি সেক্টরের কমান্ডারগণ নিম্নরূপঃ

এক নম্বর সেক্টর	ঃ	মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন) মেজর মোহাম্মদ রফিক (জুন-ডিসেম্বর)
দুই নম্বর সেক্টর	ঃ	মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) মেজর এ.টি.এম.হায়দার(সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)
তিন নম্বর সেক্টর	ঃ	মেজর কে.এম. শফিউল্লাহ(এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) মেজর নুরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)
চার নম্বর সেক্টর	ঃ	মেজর সি.আর. দত্ত
পাঁচ নম্বর সেক্টর	ঃ	মেজর মীর শওকত আলী
ছয় নম্বর সেক্টর	ঃ	উইং কমান্ডার এম. বাশার
সাত নম্বর সেক্টর	ঃ	মেজর কাজী নুরুজ্জামান
আট নম্বর সেক্টর	ঃ	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (আগস্ট) মেজর এম.এ. মঞ্জুর (আগস্ট- ডিসেম্বর)
নয় নম্বর সেক্টর	ঃ	মেজর এম.এ. জলিল
দশ নম্বর সেক্টর	ঃ	মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং প্রাপ্ত নৌ-কমান্ডাররা যখন যে সেক্টরে এ্যাকশন করেছে, তখন সে-সব সেক্টর কমান্ডারদের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করেছেন।
এগারো নম্বর সেক্টর	ঃ	মেজর আবু তাহের (৩রা নভেম্বর পর্যন্ত) ফ্লাইট লে: এম. হামিদুল্লাহ (ডিসেম্বর)

রক্তাক্ত চরবাড়ীয়া

উনিশ শ' একাত্তর সালের ২৫শে মার্চের রাতে বর্বর পাকবহিনী ঢাকায় গণহত্যা শুরু করে। দলে দলে ঢাকা থেকে মানুষ ছুটে চলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। কিছু পথ হেঁটে, কিছু পথ নৌকায়, কিছু পথ লঞ্চে-এমনিভাবে দক্ষিণাঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দারা আসতে থাকে বরিশালে । বরিশাল শহর হ'তে ৩ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত চরবাড়ীয়া ইউনিয়ন। চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের উত্তর পাশে গড়ে ওঠা তালতলীবন্দরে নামে হাজারও মানুষের ঢল। চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে গঠিত হয় সংগ্রাম পরিষদ। তালতলী সংগ্রাম পরিষদের সার্বক্ষণিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন নিবেদিত শতাধিক ছাত্র-যুবক। তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন ডাঃ সৈয়দ জাফর আলী, দলিল উদ্দিন হাওলাদার, কাজী হাবিবুরর রহমান, মোঃ ইসমাইল হোসেন, আব্দুল ওয়াজেদ মিয়া, মোঃ হানিফ হাওলাদার, আবুয়াল ইসলাম খান, জয়নাল মিয়া, আশ্রাব আলী খান ও মাজেদ খান। যুবকবৃন্দ হলো-হারুন, জব্বার, দুলাল, সামচু, আলমগীর মল্লিক, মন্নান, সবুজ, জাহাঙ্গীর, আজাহার, ইউনুচ, নয়ন ও আলম। সংগ্রাম পরিষদ স্থানীয়ভাবে অর্থ সংগ্রহ করে চিড়া, মুড়ি ও গুড় ক্রয় করে কমিটির সভাপতি ডাঃ সৈয়দ জাফর আলীর ফার্মেসীতে জমা করে। পরে সেগুলো বিভিন্ন পথে আসা শরণার্থীদের ভেতর প্রতিদিন বিতরণ করা হয় । কাউকে কাউকে আবার পথ খরচের টাকা দিয়েও সাহায্য করতে হয়েছে। সংবাদ মাধ্যম ছিলো ইসমাইল ও আজাহার খানের দোকানের ৩ ব্যান্ড রেডিওসহ ৩/৪টি রেডিও মাত্র। গ্রামের কৃষকসহ খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ সন্ধ্যায় জমায়েত হতো এই বন্দরে খবর শোনার জন্য। স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান সূচী প্রতিদিন শোনা হতো গোপনে পূর্ব পাশে ইটের ভাটার চৌকিদারের গৃহে বসে ইসমাইলের রেডিওতে। শ্রুত খবর মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হতো সারা ইউনিয়নে।

২৫শে মার্চের পর ঢাকার সাথে সব রকম যোগাযোগই ছিলো বিচ্ছিন্ন। মাঝে মাঝে ঢাকার সাথে শুধু টেলিফোনে যোগাযোগ হতো। টেলিফোনে প্রাপ্ত প্রতিদিনের খবর পাওয়া যেত সন্ধ্যায় শহর থেকে আগত ব্যক্তিদের কাছে। প্রাপ্ত খবর নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হতো স্থানীয় প্রতিটি দোকানে। খবর পাওয়া যেত আজ রাতেই যশোর থেকে পাকবাহিনী

বরিশালে আসবে। আবার শোনা যেত দোয়ারিকা ও শিকারপুরের ফেরী সরিয়ে রাখা হয়েছে, পাকবাহিনী কিছুতেই আসতে পারবে না। মেজর জলিলের নেতৃত্বে শক্তিশালী মুক্তিবাহিনী প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, আসলেই বাঁধা দেওয়া হবে। কেউ বলতো কালকেই নদী পথে বরিশালে সেনাবাহিনী আসছে। তাই প্রতিদিনের এসব গুজব শুনে এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হতে থাকে। আত্মরক্ষার জন্য এলাকার প্রায় প্রতিটি বাড়ীতে ট্রেন্স খনন করা হয়। এরই মাঝে হঠ্যাৎ করে সংবাদ পাওয়া গেল শহরের স্ট্রীমার ঘাটে খুলনা থেকে আগত একজন পাকিস্তানী চর (ওয়ারলেস সেটসহ)-কে আটক করা হয়েছে। বরিশালের অস্থায়ী সামরিক বিচারে ঘোষণা করা হয় চাঁদমারীতে (স্টেডিয়ামের নিকট) প্রকাশ্য জনসমক্ষে তাকে গুলী করে হত্যা করা হবে। হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে ১৭ই এপ্রিল '৭১-এ ফায়ারিং করে হত্যা করা হলো উক্ত এজেন্টকে।

হঠ্যাৎ করে ১৮ই এপ্রিল পাকিস্তানী দু'টি বোমারু বিমান শহরে রকেট ও মেশিনগানের গুলী বর্ষণ করে। ভয়ে মানুষের ছুটাছুটিতে বহু লোক আহত হয়। কীর্ত্তণখোলা নদীতে অবস্থানরত একটি লঞ্চে বোমা পড়ে, লঞ্চটিতে আগুন ধরে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে লঞ্চটি নিমজ্জিত হয়। বিমানের নিক্ষিপ্ত গুলীতে বেল্‌স পার্কে আঃ গণি নামে একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা মৃত্যুবরণ করেন। চাঁদমারীর মাঠে গুলীবিদ্ধ হয়ে একটি গরুও মারা যায়। বোমায় পুলিশ লাইন ও স্টীমার ঘাটের মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্থ্ হয়। বার বার শহরের উপর দিয়ে বিমান উড়ে যাবার সময় বিমান থেকে গুলী, বোমা নিক্ষেপ করায় মানুষের মধ্যে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ফলে সেদিন বিকেল থেকেই শহরের মানুষ ভয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে গ্রামে চলে যেতে থাকে।

২০শে এপ্রিল পুনরায় জঙ্গী বিমানগুলো কোন গোলা বর্ষণ না করেই শহরের নিচু দিয়ে বার বার উড়ে যায়। ফলে পুরো শহরটাই জনশূন্য হয়ে পড়ে। চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের তালতলী এলাকার প্রায় সকল পরিবারের ছেলে-মেয়েসহ মহিলা সদস্যরা তাদের দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। এলাকার প্রায় সকল বাড়ীতেই ট্রেন্স (বাঙ্কার) খনন করা হয় বিমান আক্রমন থেকে আত্মরক্ষার জন্য। পাকসেনাদের তালতলী আসা রুখতে তালতলী বাজারের দক্ষিণ পাশের রাস্তা কেটে শহরে গাড়ী যাতায়াতের পথ বিছিন্ন করা হয়।

মেজর এম, এ, জলিলের নেতৃত্বে বরিশালে মুক্তিবাহিনী সংঘঠিত করা হয়। দু' থেকে আড়াই শ' মুক্তিবাহিনী নিয়ে চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের মহাবাজ উচ্চ বিদ্যালয়ে চালু করা হয় মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প। যার পরিচালনায় ছিলেন ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক, লেঃ ইমাম-

আল-মেহেদী এবং হাবিলদার পঞ্চানন গাজী। সায়েস্তাবাদ স্কুলে ট্রেনিং পরিচালনা করতেন হবিনগর নিবাসী আনসার কমান্ডার আব্দুল ওয়াজেদ হাওলাদার।

নদীপথে পাক বাহিনীর আগমন প্রতিহত করার জন্য শহর থেকে ৫ মাইল দূরে ঝুনাহারে একটি শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে ঝুনাহার ক্রসিং সামনে রেখে চরবাড়ীয়ার ফকির বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার পাশে ব্যাংকার তৈরী করা হয় এবং শায়েস্তাবাদের রাজাপুর ও হবিনগরেও বাঙ্কার তৈরী করা হয়। কিছু হালকা অস্ত্রসহ মুক্তিবাহিনী এসব বাঙ্কারে অবস্থান নেয়। ঝুনাহারের সংযোগ স্থালের দু'পাশে ইরানী ও মাজভী নামের দু'টি বড় স্টীমার নোঙ্গর করে রাখা হয়। এ সব স্টীমারে স্থাপন করা হয় আইডব্লিউটিএ-এর ১টি ওয়ারলেস। সমগ্র বরিশাল ছিলো মুক্তিবাহিনীর অধীনে। মেজর এম,এ, জলিল একটি জীপ গাড়ীতে প্রায়ই তালতলীতে এসে স্পীড বোটে ঐ সব স্থান পরিদর্শন করতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। তখন তাঁর কাঁধে থাকত একটি চায়নিজ রাইফেল।

আজ এলো, কাল এলো এমনিভাবে আতঙ্কের মধ্যে ১টি মাস কেটে গেল। বরিশালকে মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হলো। হঠ্যাৎ ২৫শে এপ্রিল সকালে সংবাদ এলো ঢাকা থেকে গানবোটে করে পাকিস্তানী সৈন্যরা বরিশালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। এমনকি গানবোটগুলো নন্দিরবাজার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সাথে সাথে এ খরব তালতলীতে পৌঁছা মাত্রই এলাকার লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

গানবোটগুলো বরিশাল পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে যখন আস্তে আস্তে বিনা বাধায় ঝুনাহার নদী দিয়ে শায়েস্তাবাদ ও চরবাড়ীয়া অতিক্রম করছিলো ঠিক এমনি সময় শায়েস্তাবাদ ও চরবাড়ীয়ায় অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারা গানবোট লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লে মুহূর্তের মধ্যেই গানবোট থেকে প্রচন্ড শব্দে গুলী এবং সেল মারতে থাকে। গানবোট ঘায়েল করার মত কোন অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের ছিলো না। গানবোট থেকে সায়েস্তাবাদ এবং চরবাড়ীয়া গ্রামাঞ্চলে গোলা বর্ষণ করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রচন্ড গোলার আঘাতে ইরানী ও মাজভী নামের স্টীমার দু'টি ডুবে যায়। স্টীমার দু'টি আজও ঝুনাহারের দু'পাশে ডুবে আছে। প্রচন্ড শব্দ এবং ভারী অস্ত্রের মুখে মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন দিকে ছুটে যায়। নৌবাহিনীর ভারী অস্ত্রের আঘাতে মুক্তিবাহিনীর বাঙ্কার ধ্বংস হয়ে যায়।

পাকিস্তানী সৈন্যরা ঝুনাহারে বাঁধার সম্মুখীন হলে চরবাড়ীয়াকেই তারা প্রাথমিক অপারেশনের স্পট হিসেবে বেছে নেয়। অপারেশন চালানোর জন্য বাঁধাপ্রাপ্ত পাকিস্তানী সৈন্যরা ঢাকায় যোগাযোগ করে এবং সৈন্য বোঝাই দু'টি হেলিকাপ্টার আধা ঘন্টার মধ্যেই

জঙ্গী বিমানের প্রহরায় এখানে অবতরন করে। হেলিকাপ্টারগুলো তালতলীর পূর্ব পাশের ত্রিপল আচ্ছাদিত মাঠে ছত্রী সৈন্য নামিয়ে দেয়। দু'টি জঙ্গী বিমান উপরে টহল দিতে থাকে। একইভাবে তিন তিনবার হেলিকপ্টার থেকে ছত্রীসৈন্য নামানো হয়। নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও স্থলবাহিনীর সমন্বয়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা শক্তি বৃদ্ধি করে এবং তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে তিনটি গানবোট নিয়ে আক্রমণ শুরু করে। যার একটি তালতলীর পূর্বপাশে হাওলাদার বাড়ীর সম্মুখে, অপরটি তালতলীর পশ্চিম পাশের শহীদ আব্দুর রহমান খানের (লেখকের পিতা) বাড়ীর সম্মুখে এবং অন্যটি আরো পশ্চিম পাশের শহীদ মুন্সী আলী আজিম খানের (লেখকের পিতামহ) বাড়ীর সম্মুখে নোঙ্গর করে। বোট থেকে ভারী অস্ত্রসহ সেনাবাহিনী স্থল ভাগে নেমে যায়। তারা যাত্রাপথে যাদেরকে সামনে পেয়েছে তাদেরকেই গুলী করে হত্যা করেছে। মাঝে মাঝে ক্রোলিং করে করে সম্মুখে এগুবার পথে সারাক্ষণ প্রচন্ড গুলী বর্ষণ করে এলাকায় ভীষণ ভীতির সঞ্চার করেছে। অন্যদিকে গানবোটে থেকে যাওয়া কিছু সৈন্য সারাক্ষণ প্রচন্ড শব্দে গোলা বর্ষণ করতে থাকে। ৫/৬ মাইল দূরে গিয়েও এসব গোলার অগ্নিকুন্ডু ও স্ফুলিং পড়তে থাকে। এদেশীয় তাদের দোসরদের মাধ্যমে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে তারা মহাবাজের নাজিরবাড়ী মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হতে থাকে। অবশেষে মুক্তিবাহিনীর সাথে তিন ঘন্টা মরণপণ লড়াই করে। যুদ্ধে ঝুনাহারে মুক্তিবাহিনীর পতন ঘটায় মুক্তিবাহিনীর ঝুনাহার ত্যাগ করার পরও নৌবাহিনী ঝুনাহার অতিক্রম করার সাহস পায় নি। মুক্তিযোদ্ধারা অনেক অস্ত্রসহ কমিশনারচর ও বাবুগঞ্জ গিয়ে আশ্রয় নেয়। পাকসেনারা চরবাড়ীয়া, কাগাশুরা, সাপানিয়া, পুরানপারা হয়ে শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। যা এলাকাবাসী কোন কালেও দেখে নি হঠ্যাৎ করে তা দেখেই চরবাড়ীয়া এলাকা জনশূন্য হয়ে যায়।

বাড়ী বাড়ী যেয়ে যেখানে যাকে যেভাবে পেয়েছে তাকেই নৃসংশভাবে হত্যা করেছে। নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধকে রেহাই দেয় নি। ৯০ বছরের বৃদ্ধাকেও বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। ট্রেঙ্গে আশ্রয় গ্রহণকারী ৭/৮ জনকে ব্রাশ ফায়ার করে একসাথে হত্যা করেছে। পুকুরে আশ্রয় গ্রহণ করা অবস্থায় ৪/৫ জনকে ব্রাশ মেরে হত্যা করেছে। নরপিশাসের দল এমনিভাবে গুলী করেছে যে ট্রেঙ্গের মুখে অবস্থানরত ব্যক্তিসহ মায়ের কোলে ২ বছরের শিশুও গুলীবিদ্ধ হয়ে মায়ের কোলেই মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু দুর্ভাগা অসহায় মা জীবনে বেঁচে গেলেও তাকে সারা জীবন সে স্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছে। এমনও হয়েছে যে, ৮ মাস ৮ দিনের শিশু কোলে থাকাবস্থায় মা-বাবা গুলীবিদ্ধ হয়ে এখনও বেঁচে থাকলেও কোলের শিশুটি চিরতরে কোলেই ঘুমিয়ে গেছে। বর্বর বাহিনীর গুলী থেকে ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে মা গুলীবিদ্ধ হয়ে ছেলের কোলে মারা যায় এবং ছেলে আহত হয়ে আজও বেঁচে আছে। অনেকেই গুলী খেয়ে

আহত হয়ে আজও মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে বেঁচে আছে। পাকবাহিনীকে দেখে দৌঁড় দিলে দূর থেকে লক্ষ্য করে গুলী করে এবং ছটফট করতে করতে মৃত্যুবরণ করে। স্ত্রীকে সামনে রেখে স্বামীকে গুলী করে তৃষ্ণা মিটাতে না পেরে পরে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। মায়ের কোল থেকে ১ বছরের শিশুকে নিয়ে আছড়ে মেরেছে এবং ক্রন্দনরত মায়ের ওপর ব্যভিচারি করেছে। পাকিস্তানী বাহিনীর এ বর্বরতা হালাকু খা ও চেঙ্গীস খানের ন্যায় হত্যা ও ধ্বংসলীলাকে হার মানিয়েছে।

প্রচন্ড শব্দে এবং গুলীর ভয়ে চরবাড়ীয়া এলাকার লোকজন সবকিছু ফেলে পশ্চিম দিকে চলে যায়। কেউ কেউ পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পাষন্ড বর্বর বাহিনী শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয় নি, তারা বাড়ী বাড়ী গিয়ে গৃহে আগুন ধরিয়ে দিলে আগুনের লেলিহান শিখা দূর থেকে দেখা যায়। শত শত খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে এলাকায় ভীষণ ত্রাসের সৃষ্টি করে। এ যেন এক প্রলয়ংকরী হত্যাযজ্ঞ যা চোখে না দেখলে অনুধাবন করা যায় না।

যুদ্ধের প্রথম প্রস্তুতিতেই প্রয়োজন হয় এলাকার ম্যাপ বা মানচিত্র। বর্ব্বর চৌকষ পাকবাহিনীও এলাকার ম্যাপ সংগ্রহে ভুল করে নি। ম্যাপ দেখে দেখে চারদিকে ছড়িয়ে ক্রোলিং করে করে বরিশাল শহরের দিকে তারা এগুতে থাকে। সারাদিন হত্যাযজ্ঞ চালানোর পর বেলাশেষে কিছুটা নিস্ক্রিয় হয়ে পরে। মুসলমানিত্ব প্রমাণের জন্য দিগম্বর করে দেখত আবার কাউকে কলেমা পাঠের শুদ্ধতা দিয়ে যাচাই করে সৈন্যদের মন মতো হলেই হত্যা থেকে রেহাই দেয়া হতো। সন্ধ্যায় গানবোটগুলো একত্র হয়ে এক জায়গায় অবস্থান নেয়। এলাকার বড় বড় ছাগল ধরে নিয়ে রাতে রান্না করে ভুড়িভোজ করেছে। যে গৃহগুলো আগুনে পুড়েনি সে সব ঘরে ঢুকে তল্লাশী করেছে। আবার ঘরে ঘরে ঢুকে চাল-ডাল একত্র করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রেখে যায়। টাকা-পয়সা ও কিছু কিছু মূল্যবান জিনিষপত্রও নিয়ে যায়। সন্ধ্যার পরেও নদীর পাড়ের রাস্তায় টহল অবস্থায় দেখা গেছে। পরের দিন গানবোটগুলো বরিশাল শহরের দিকে চলে যায়। ২৫ শে এপ্রিল এমনিভাবে চরবাড়ীয়ায় ঘটে গেল এক করুণ ও বেদনাদায়ক ঘটনা। গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন দিতে হলো বর্বর পাকবাহিনীর হাতে। ইতিহাসের পাতায় এমনিভাবে এলাকাবাসী জীবন দিয়ে, রক্ত দিয়ে লিখে গেল স্বাধীনতার ইতিহাসে গ্রামীণ জনপদের অবদান।

নদীবেষ্টিত শস্য-শ্যামল বৃক্ষশোভিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চিরসবুজ চরবাড়ীয়ায় বর্ব্বর পাকবাহিনী যে পৈশাচিক নরহত্যাসহ নিষ্ঠুর ও জঘন্যতম ঘটনাবলীর ছাপ রেখে গিয়েছে তারই কিয়দংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

হঠাৎ করে প্রচন্ড গোলাবর্ষণ, সেল ও মর্টারের প্রচন্ড শব্দে উত্তেজিত, উৎকণ্ঠিত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় এলাকার লোকজন দৌঁড়ে সরে গেলেও কিছু কিছু লোক পরিবার-পরিজনকে নিয়ে ট্রেন্সে ও ঘরে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেও পাকিস্তানী বাহিনীর হত্যালীলা থেকে রেহাই পেল না শিশু, মহিলাসহ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অনেকেই।

- ৯০ বছরের ইমান উদ্দিন হাওলাদার অসুস্থ অবস্থায় নিজ ঘরে শুয়েছিলেন। নরপশুরা ঘরে ঢুকেও বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। বিছানা থেকে একাকী ওঠাবসা অসম্ভব ছিলো বলে বাড়ীতে কেয়ার-টেকার হিসেবে থেকে যায় কাবিল খাঁ। নরপশুরা তাকেও গুলী করে হত্যা করে।

- আব্দুর রহমান খানের বাড়ীর পশ্চিম পাশে পুকুরটি ঐ বছর পুনঃখনন করা হয়। সেখানে আশ্রয় নেন সামসুদ্দীন হাওলাদার, আব্দুর রহমান খান, আলী আকবর এবং জবেদ আলী। পাকবাহিনী গানবোট থেকে উঠেই তাদেরকে লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে। সামসুদ্দীন ছিলেন সবার চেয়ে বয়স্ক তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকেন। বিকেল নাগাদ জ্ঞান ফিরে এলে আহত অবস্থায় সরে যেতে সক্ষম হন। আব্দুর রহমান খানকে পরের দিন নিকট আত্মীয়-স্বজন এসে বাড়ীর মধ্যে নিজ হাতে খননকৃত ট্রেন্সে দাফন করেন।

শহীদ আবদুর রহমান খানের সমাধি ❒ ছবি লেখক

তালতলী মসজিদের ইমাম মুন্সী আলী আজীম খান গুলীর শব্দ শুনে তালতলী থেকে নিজ বাড়ীতে ফেরার পর বাড়ীতে কাউকেই না পেয়ে পাশে জামাই বাড়ী চলে যান। সেখানেও কাউকে না পেয়ে ফিরে আসার পথে পাকবাহিনীর সাথে দেখা হয় ; দেখা মাত্রই তাকে গুলী করে। সাথে সাথেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। স্ত্রী একটু দূর থেকে স্বামীর করুণ অবস্থা দেখে তিল ক্ষেতে আশ্রয় নেন। নর-পশুরা গুলী করে দক্ষিণ দিকে চলে গেলে স্ত্রী আমেনা খাতুন রক্তাক্ত স্বামীর কাছে আসে। রক্তঝড়া অবস্থায় স্ত্রীর সাথে কি যেন বলার চেষ্টা করছিলেন, স্ত্রী স্বামীর মাথা কোলে তুলে নিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন আলী আজিম খান। সারাদিন স্ত্রী স্বামীর মৃতদেহের কাছেই বসে রইলেন। প্রচন্ড গোলাগুলীর মাঝে কোন একটি লোকের সাড়া পেল না। সূর্য ডুবু ডুবু গুলির শব্দ কিছুটা থেমে আসে। এমনি সময় আমেনা বেগম অনুমান করলেন বাড়ীতে কে যেন এসেছে। বাড়ীতে ঢুকেই দেখতে পেল দেবর জোনাব আলী খানকে। তিনি পাকবাহিনীর কাছে কয়েক বার ধরা পড়েছিলেন কিন্তু কিছু কিছু উর্দু বলতে পাড়ায় জীবনে রক্ষা পেয়ে যান। কলেমা পাঠ করতে হয়েছে তাঁকে। তারপর গায়ের চাদর দিয়ে হাত পিছমোঁড়া বেঁধে ছেড়ে দেয়। তখনও তিনি জানেন না তাঁর বড় ভাই ও ভাতিজা গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। ভাবীর কাছে বড় ভাইয়ের মৃত্যুর কথা শুনেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তখনও চারদিকে পাকবাহিনী থাকায় শব্দ করে কাঁদতেও পাড়লেন না। দু'জনে বহু কষ্টে ভাইয়ের লাশ ঘরে নিয়ে এলেন। ততক্ষণে প্রায় অন্ধকার নেমে এলো। কোথাও কোন লোকজন নেই, সব নিস্তব্ধ। কিছুতেই বাড়ীতে থাকা ঠিক হবে না ভেবে ভাবীকে তাঁর সাথে নিরাপদ কোথাও চলে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। ভাবী স্বামীকে রেখে কোথাও যেতে নারাজ। নিরুপায় জোনাব আলী খান পাকবাহিনীর ভয়ে অন্যত্র চলে গেলেন।

পর্দানশীল কুরআন পড়ুয়া আমেনা খাতুন স্বামীর শিয়রে বসে সারারাত কুরআন শরীফ পাঠ করলেন। সমস্ত রাত একাকিনী কাটালেন স্বামীর মৃতদেহটিকে নিয়ে। পরের দিন আত্মীয়-স্বজন এসে বাড়ীর পশ্চিম পাশে দাফন করলেন। স্বামীর লাশ নিয়ে সারারাত নির্জন গৃহে অবস্থানের পর থেকেই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটতে থাকে। বিশেষ ব্যথায় গৃহ ত্যাগ করে পাগল বেশে আমেনা বেগম আজ রাস্তায় রাস্তায় ঘুঁড়ে বেড়াচ্ছেন ।

মাত্র কিছু দিন আগে আব্দুল ওহাবের বাড়ীর দক্ষিণ পাশে ১টি নতুন পুকুর খনন করা হয় । নব খননকৃত পুকুরের পাড় বেশ উঁচু বিধায় ওখানেই আশ্রয় নেয় ওহাবসহ আরো বেশ কয়েকজন। হাওলাদার বাড়ীর পাশে রক্ষিত গানবোট রেখে বর্বর পাকবাহিনী এখান দিয়েই মুভ করছিলো। পুকুরের উত্তর পাড়ে জালাল উদ্দিন হাওলাদারকে দেখামাত্র গুলী করে হত্যা করার পর পুকুরের ভেতর অবস্থানরত সবাইকে লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করে।

জালাল উদ্দিনের স্ত্রী লালবরু স্বীয় ছেলে চানকে গুলী থেকে বাঁচাবার জন্য আড়াল করে ধরলে ছেলে চাঁন গুলীবিদ্ধ হয়ে আহত অবস্থায় বেঁচে থাকলেও মা গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যান । আবদুল ওহাব গুলীবিদ্ধ হয়ে সাথে সাথে মারা যান। আব্দুর রশিদ উকিল এবং তাঁর স্ত্রী গুলীবিদ্ধ হয়ে আহত হন কিন্তু কোলে থাকা ৮ মাসের শিশু পলাশ গুলীবিদ্ধ হয়ে কোলেই মারা যান।

- রিক্সা চালক ছত্তার রাড়ী আত্মরক্ষার জন্য নিজ বাড়ীর ঘরের পাশেই খনন করেন বড় এক ট্রেন্স। হঠ্যাৎ প্রচন্ড গোলাগুলীর শব্দ পেয়ে পরিবারের সবাইকে নিয়ে সেখানে আশ্রয় নেন। পাশের বাড়ীর লোকজনসহ একজন ভিখারীও আশ্রয় নেন তাদের সাথে। পাকবাহিনী তাদের রক্ত পিপাসা মেটানোর জন্য ট্রেন্সের মধ্যে ব্রাশ ফায়ার করলে ২ বছরের শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধাসহ মারা গেলেন ৭ জন। তাদের কবর দেবার মত আর কেউই রইলো না। তাই তাদেরকে ওখানেই গণকবর দেয়া হলো। ছত্তারের বংশে বাতি জ্বালাবার মত আর কেউই বেঁচে রইলো না।

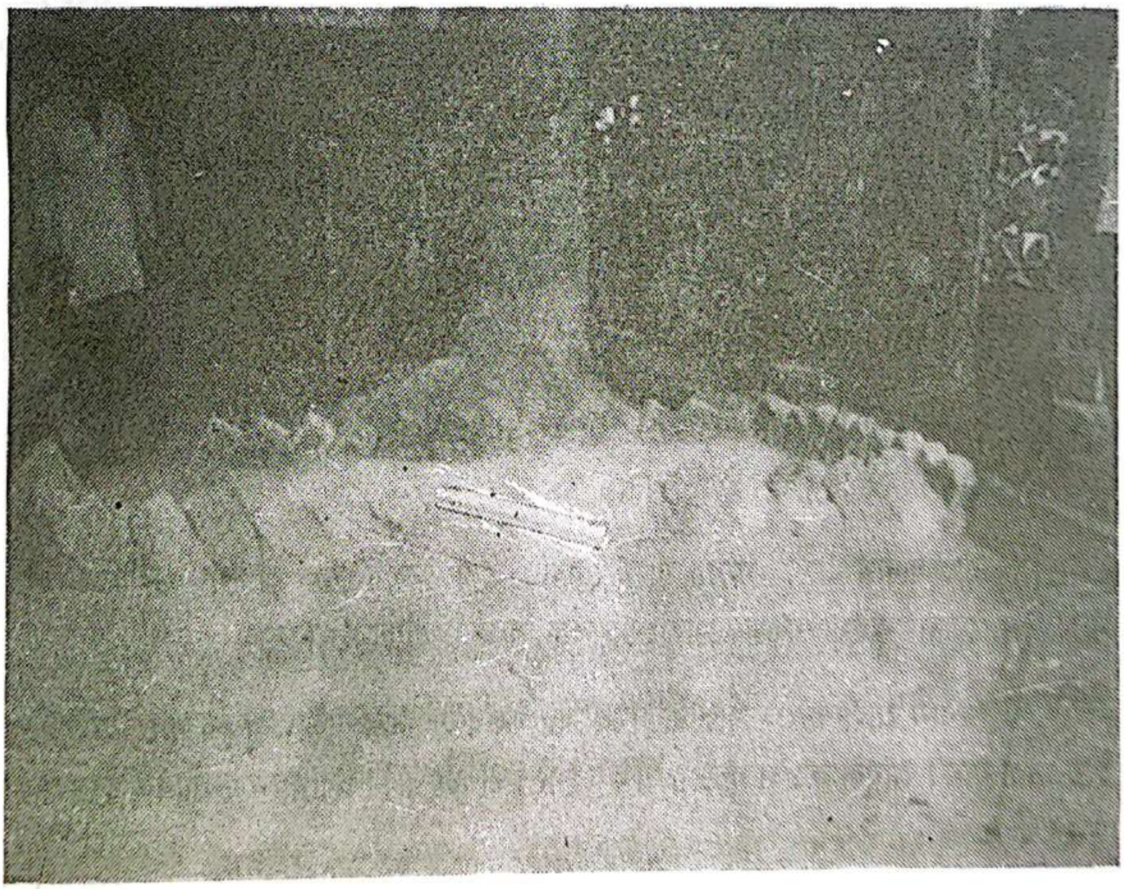

৭জন শহীদের গনকবর ❒ ছবি লেখক

- আব্দুল আজিজ নিজ বাড়ীর সবাইকে নিয়ে আশ্রয় নেন ট্রেঞ্চের মধ্যে। বাড়ীতে লোকজনের শব্দ পেয়ে ট্রেঞ্চের মুখ দিয়ে মাথা উঁচু করার সাথে সাথে গুলী এসে পড়ল ট্রেঞ্চের মুখে। মারা গেল আব্দুল আজিজ। মায়ের কোলে গুলীবিদ্ধ হয়ে আয়নালের দেড় বছরের শিশু কালামও মারা গেল ।

- আত্মরক্ষার জন্য ট্রেঞ্চের মধ্যে পরিবার-পরিজন নিয়ে আশ্রয় নেন জাফর আলী। পাকবাহিনী তাদেরকে দেখে ট্রেন্স লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ে। ১২ বছরের পুত্র নয়ন মারা যান সাথে সাথে এবং পুত্র শাহ আলম আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করে ধুকে ধুকে আজও জীবন কাটাচ্ছে।

- মোঃ শাহজাহান মীর ও মতলেব আর্মিদেরকে দেখে দৌঁড়ে সৈয়দ আশ্রাব আলীর বাড়ীর রান্না ঘরে আশ্রয় নেন। নিষ্ঠুর আর্মি সেখানে গিয়ে তাদেরকে গুলী করে হত্যা করে। জঘন্য আর্মি তাতেই ক্ষান্ত হয় নি। আনন্দ উল্লাসের জন্য বাসগৃহখানাতেও ধরিয়েছে আগুন, আর পৈশাচিকতা নিবারণের জন্য জ্বালিয়েছে রক্তাত্ব দেহ।

- সেতারা ও সাফিয়া বেগম দু'বোন একত্রে সকালে গিয়েছিল পাশের আবদুল মালেক খানের বাড়ীতে। বড় বোনের ২ বছরের ছেলেটি ছিলো তাদের সাথে। হঠ্যাৎ প্রচন্ড গোলাগুলী শুনে সবাই সরে যেতে পাড়লেও ওরা নিরাপদ স্থানে সরতে পাড়ে নি। বর্ব্বর পাকবাহিনীর গুলীর আঘাতে এক জায়গাতেই দু'বোন মারা গেল। ২ বছরের ছেলেটি ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেল। ২ দিন ছেলেটি কাটালো খালাদের মৃতদেহের মাঝে। বাঁচার জন্য খালাদের দুগ্ধ পানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ছিলো শিশু সন্তানটি।

- গর্ভাবস্থায় ময়না বিবি বাড়ীর ট্রেঞ্চের মধ্যে গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যান। তার ডান স্তনটি গুলীর আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

- হাওলাদার বাড়ীর ঘরের সাথে ট্রেঞ্চের মধ্যে আশ্রয় নেয়া অবস্থায় গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যান, মোছাঃ রহিমা বেগম, মোছাঃ চানবরু, বাচ্চু ও হালিমা খাতুন।

- জবান আলী হাওলাদার রাড়ীমহলের গফুর হাং-এর বাড়ীর পুকুর পাড়ে গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যান। আবুল ফজল বাড়ীর দক্ষিণ পাশে বাবুর্চী বাড়ীর বাগানে গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

- বাড়ীর নিকটে গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যান চান শরীফ, আঃ ওয়াজেদ হাং, নিজ বাড়ীর ট্রেঞ্চের গুলীবিদ্ধ হয় মুজাহার আলী হাং, নিজ বাড়ীর শুকনো পুকুরের ভেতর গুলীবিদ্ধ হয়ে

মারা যান হাসান আলী হাং, নিজ বাড়ীতে গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যান আঞ্জুমানেছা ও ছবুরজান বিবি।

- মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার বাটাজোর পুলিশের কাছে অস্ত্রসহ ধরা পড়েন। সাথে ছিলেন পুরানপাড়ার এ.এম.জী. কবীর বুলু। পরবর্তীতে পাকবাহিনীর নির্মম অত্যাচারে বরিশাল হেড- কোয়াটার ওয়াপদা কলোনীতে বসে মারা যান আনোয়ার। তাঁর মৃতদেহটিকেও পাওয়া যায় নি। আহত অবস্থায় বুলু পরবর্তীতে যশোর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে যান।

- আর্মির গাড়ী চালক মালেক গাজী কর্মরত অবস্থায় মারা যান।

- ভারী অস্ত্র ও প্রচন্ড গোলার আঘাতে ঝুনাহার ঘাঁটির মুক্তিযোদ্ধাদের পতন ঘটলে মহাবাজ উচ্চ বিদ্যালয়ে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের সবাই নিরাপদে চলে গেলেও একমাত্র আনসার কমান্ডার আঃ রশিদ হাওলাদার অস্ত্র হাতে রাস্তার পাশে বাঙ্কারে অবস্থান নেন। সাহসী হাওলাদার বাঙ্কার থেকে হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে গুলী করলে সাথে সাথে হেলিকপ্টার পাহাড়ারত বোমারু বিমান থেকে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করলো বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ রশিদকে।

- খন্দকার আতাহার হোসেনকে বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে মল্লিক বাড়ীর পুকুরপাড়ে ব্রাশ ফায়ার করে এবং লাথি মেরে কুয়ার মধ্যে ফেলে দেয়। কুয়ার মধ্যে মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে গেলেও পা দু'টি কেটে তাঁকে পঙ্গুত্ববরণ করতে হয়।

- পুরানপাড়ার ৫ বছরের কহিনুর বেগম এসেছিল বেড়াতে। সবার সাথে আশ্রয় নিয়েছিলো ট্রেঙ্গে, গুলীবিদ্ধ হয়ে আহত অবস্থায় বাড়ী ফিরতে হলো । চরআবদানীর কহিনুর ও আলোয় বেগম এসেছিলো খালাদের বাড়ী, পায়ে গুলীবিদ্ধ হয়ে আহত অবস্থায় ফিরতে হলো বাড়ী।

- আজিমদ্দিন নিজ বাড়ীর আঙ্গীনায়, আনোয়ার হোসেন সাপানিয়া তালুকদার বাড়ীর পাশে গাছের নীচে বসে, হালিমা বেগম নিজ বাড়ীর ট্রেঙ্গে, মোঃ শাহজাহান খান নিজ বাড়ীর ট্রেঙ্গে, সাফিয়া খাতুন ৭ জনের সাথে একত্রে ট্রেঙ্গের মধ্যে, আঃ রশিদ খান সাপানিয়া আকন বাড়ীর সামনে খোলা মাঠে গুলীবিদ্ধ হয়ে আহত হন।

- মোঃ ইসমাইল হোসেন পেটে ও হাতে গুলীবিদ্ধ হয়ে মারাত্মক রক্তাক্ত অবস্থায় ১ দিন অতিবাহিত করেন। পরের দিন বহু কষ্ট করে বাটনা নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে বসে ডাঃ সৈয়দ জাফর আলী প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা প্রদান করেন। সেখান থেকে নৌকায় করে

মেহেন্দিগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে বহু বিপদজনক ঘটনাকে অতিবাহিত করে বরিশাল সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখানে অস্ত্রপচার করে গুলী ওঠানো হয় এবং মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে বেঁচে থাকেন।

- মৃতদেহ ব্যতীত ঐদিন রাতে এলাকায় কেউ ছিলো না। পরের দিন পাকবাহিনীর গানবোটগুলো বরিশালে চলে যাবার পর বাড়ী-ঘরের আড়ালে আড়ালে কিছু নিকট আত্মীয় এসে মৃত লাশগুলো দাফন করেন। অনেককে ২/৩ দিন পরেও দাফন করা হয়েছে। তালতলীর পূর্বপাশে তিল ক্ষেতের মধ্যে ৫/৬টি মৃত্যুদেহ পড়েছিলো। এলাকার কেউই তাদেরকে সনাক্ত করতে পারে নি। সম্ভবতঃ শহর থেকে আগত পথিক ছিলো তারা। মাঠের মাঝ থেকে নিয়ে এতগুলো লাশ দাফন করার সাহস পায় নি কেউ। ৩/৪ দিনের মধ্যে শিয়াল ও কুকুরে লাশের অনেকটা খেয়েছিলো। গন্ধে এলাকার বাতাস ভারী হয়ে গিয়েছিলো। কয়েকটি অপরিচিত লাশকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে।

- যারা গুরুতর আহত হয়েছিলো তাদের ঘটনাগুলো মর্মান্তিক। আহতরা করুণ কণ্ঠে পানি পানি করলেও কেউই এগিয়ে আসার ছিলো না। প্রাথমিক সেবা-শশ্রুষা করার মতও কেউ ছিলো না। নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা হয়েছে অনেকেরই ৮/১০ দিন পরে।

- সকাল ১০টার সময় আত্মরক্ষার জন্য ট্রেন্সের মধ্যে ঢুকে প্রচন্ড গরমের মধ্যে সারাদিন অভূক্ত অবস্থায় কাটিয়েছে অনেকেই। রাতের অন্ধকার নেমে এলে বাড়ীর আড়ালে আড়ালে যে যার মত এলাকা ত্যাগ করে। পাকসেনারা ট্রেন্সের কাছাকাছি এলে ট্রেন্সের মধ্যে ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাচ্চারা কান্নাকাটি করতে থাকে। যখন বাচ্চার কান্না থামানোর সব রকম চেষ্টা ব্যর্থ হয়, পাক সেনাদের হাত থেকে বাচাঁর জন্য মা তখন বাচ্চাটির মুখ চেপে ধরে, ফলে বাচ্চার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, এমন ঘটনাও ঘটেছে বেশ কয়েকটি।

- লোকদের ধরে লুঙ্গি খুলে দেখে নেয় তার খৎনা হয়েছে কিনা- যা মুসলমানিত্বের চিহ্ন। যদি তা না হয় তাহলে তাদের জন্য মৃত্যু প্রায় অনিবার্য ছিলো। যারা উর্দু বুঝত ও বলতে পারতো তাদেরকে কলেমা পাঠ করতে বলতো এবং পড়তে পারলেই তাকে ছেঁড়ে দেয়া হতো।

- প্রচন্ড গোলাগুলীর আওয়াজে যে যেখানে যেমন ছিলো সে অবস্থায়ই জীবন বাঁচানোর জন্য দৌঁড়াতে থাকে। দৌঁড়ে বাঁচতে গিয়ে অনেকেই নিজের ছেলে-মেয়ে, পরিবার-পরিজনকে হারিয়ে ফেলে। শিশু ও বৃদ্ধাদের কতোই না কষ্ট হয়েছে তা না দেখলে বুঝা যায়

না। গর্ভবতী মেয়েদের দৌড়াতে এবং ভয়ে পথিমধ্যেই সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। অসুস্থ বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে কাঁধে তুলে দৌঁড়াতে দেখা গিয়েছে অনেককেই।

- বাড়ী-ঘরগুলো আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। পালানো অবস্থায় অনেকে দেখতে পায় যে, পাকবাহিনী তার ঘরে আগুন দিচ্ছে। আগুন দিয়ে চলে গেলেও কেউ আগুন নিভানোর চেষ্টা করে নি হানাদারদের ভয়ে। নিষ্ঠুরা চলে গেলে দৌঁড়ে জীবনে বাচঁবার চেষ্টা করেছে।

- গুলী ও সেলের আঘাতে অনেক গৃহের দরজা. জানালা ও বেড়া ঝাঁঝড়া হয়ে যায়।
- গুলীতে কয়েকটি গরুও মারা যায় এবং বেশ কয়েকটি গরু-ছাগল খুঁজে পাওয়া যায় নি।
- খড়ের কুঁড়গুলোতে আগুন ধরিয়ে ওরা উল্লাস করতে থাকে। আগুনের শিখা ও ধোঁয়া দেখে এলাকার লোকজনের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।
- এ ভয়াবহ ঘটনার পর এলাকার বেশ কয়েকজন লোক নিখোঁজ হয়ে যান। তাদেরকে অনেক খোঁজ করেও পাওয়া যায় নি।

শহীদ পরিবার, আহত পরিবার ও ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সদস্যবৃন্দের অনেকেই স্বাধীনতার পর মনের দুঃখে সাহায্যের জন্য সরকারের দ্বারস্থ হয় নি। শহীদ পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপনসহ ২০০০/- টাকা করে সাহায্য প্রদান করেছেন বঙ্গবন্ধু সরকার। আহতদেরকে ৫০০/- টাকা করে দিয়েছেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে অনেক পরিবারই এ টাকা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এমনকি সমবেদনা পত্রখানা থেকেও বঞ্চিত হয়েছে অনেকেই। যাদের গৃহ পুড়ে গেছে, তাদেরকে স্থানীয়ভাবে যৎ-সামান্য সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা হলেও লিখিত কোন সরকারী সমবেদনা পত্র আজও তারা পায় নি ।

স্ত্রী স্বামীকে হারিয়ে, স্বামী স্ত্রীকে হারিয়ে, মা তার ছেলেকে হারিয়ে, সন্তান তার বাবা-মাকে হারিয়ে নিঃস্বভাবে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। তাদের পূর্ণবাসনের কোন ব্যবস্থা করা হয় নি আজও। আমেনা বেগম স্বামী হারিয়ে, বিধবা ফুলমোন বিবি একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে নিঃসহায়ভাবে জীবন কাটাচ্ছেন। দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সাহায্যের জন্য। কোথাও কি এতটুকু সাড়া পেয়েছেন ? না এখনও পান নি।

৭ জনকে গণকবর দেয়া হলো। এ গণকবর সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা হলো না ? চরবাড়ীয়া সরকারীভাবে শহীদদের স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হলো না। আজও হলো না কোন শহীদ মিনার তৈরী করা !

শেখ মুজিবুর রহমান

নং, PMRF 6/10/72 -এ1)/604

প্রিয় ~~ভাই~~/বোন,

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনার সুযোগ্য পুত্র/~~পিতা~~/স্বামী/~~মা/স্ত্রী~~ আত্মোৎসর্গ করেছেন। আপনাকে আমি গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক সমবেদনা। আপনার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতিও রইল আমার প্রাণঢালা সহানুভূতি।

এমন নিঃস্বার্থ মহান দেশ-প্রেমিকের ~~পিতা/পুত্র/স্বামী/মা~~/স্ত্রী হওয়ার গৌরব লাভ করে সত্যি আপনি ধন্য হয়েছেন।

'প্রধান মন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল' থেকে আপনার পরিবারের সাহায্যার্থে আপনার সংশ্লিষ্ট মহকুমা প্রশাসকের নিকট ২০০০/- টাকার চেক প্রেরিত হ'ল। চেক নম্বর ২০৪২৮৬।

আমার প্রাণভরা ভালবাসা ও শুভেচ্ছা নিন।

মোসা: রাহেলা খাতুন [illegible]

স্বামী শহীদ মো: আ: রহমান

গ্রাম: + পো: চর বাড়ীয়া

বরিশাল

স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ একজন শহীদের স্ত্রীকে

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক দেয়া সমবেদনা পত্র

২৬শে এপ্রিল'৭১ হতে বরিশাল

পাকিস্তানী সেনারা একাত্তরের ২৪শে এপ্রিল ফরিদপুর মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করে পতন ঘটায়। এ সংবাদ এসে বরিশালে পৌঁছে। যে-কোন মুহূর্তে পাকিস্তানী বাহিনী বরিশাল আক্রমণ করতে পারে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। পাকবাহিনীর ধারণা ছিলো বরিশালে মুক্তিবাহিনীর শক্ত ঘাঁটি রয়েছে। তাই পাকবাহিনী ২৫শে এপ্রিল জলে, স্থলে ও আকাশ পথে ত্রিমুখী আক্রমণ পরিচালনা করে। তালতলী তিন ঘন্টা ভারী অস্ত্রের আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর ব্যাংকার ধ্বংস হয়ে যায় এবং মুক্তিযোদ্ধারা ভারী অস্ত্রের সাথে টিকতে না পেরে পিছু হটে । এদিকে সারাদিন চরবাড়ীয়া হত্যাযজ্ঞ তান্ডবলীলা চালানোর পরও পাকবাহিনী ঝুনাহার ত্যাগ করে বরিশাল যেতে সাহস পায় নি।

সারারাত তালতলী অবস্থান করার পর ২৬শে এপ্রিল সকালে আস্তে আস্তে গানবোটগুলো বরিশালের দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় পাকবাহিনীর ১টি দল কীর্তনখোলা নদীর অপর পাড়ে অবস্থিত চরমোনাই ইউনিয়নে অবতরণ করে । চরমোনাই ইউনিয়নে অসংখ্যক বাড়ী-ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। বরিশাল শহরের লোকজন সংবাদ পেয়ে জনাব হাজী আদম আলীসহ বেশ কিছু মুসলীম লীগের লোকজন পাকিস্তানী পতাকা নিয়ে লঞ্চ ঘাটে পাকসেনাদের অভ্যর্থনা জানান।

২৫শে এপ্রিল তালতলী ও ঝুনাহারে আক্রমণের ঠিক একই সময় পাকবাহিনীর একটি দল স্থলপথে ফরিদপুর ও মাদারীপুর হয়ে বরিশালের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এ দলে ১৫টির মত বিভিন্ন ধরণের গাড়ীসহ সেনাবাহিনীর সুসজ্জিত দল ছিলো। তিনশ' গজ দূরত্ব বজায় রেখে গাড়ীগুলো এগুতে থাকে। মুক্তিবাহিনীর সাথে ভুরঘাটায় প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়। এ যুদ্ধে শতাধিক গ্রামবাসীসহ ৫ জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন। এরপর রাস্তার দু'পাশে ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয় এবং সাধারণ জনগণকে হত্যা করতে থাকে। বাটাজোর ও শিকারপুর বন্দর দু'টি সম্পূর্ণ পুঁড়িয়ে দেয় এবং সন্ধ্যার দিকে বরিশাল পৌঁছে বি.এম. কলেজে অবস্থান নেয়।

বরিশাল জেলা দখল করার পর পাকবাহিনী জল, স্থল ও আকাশপথে ত্রিমুখী আক্রমণ চালায় পটুয়াখালী জেলা শহরে। পটুয়াখালী মহিলা কলেজে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প ছিলো। পাক সেনারা বিমান হতে রকেট ও মেশিনগানের গুলী বর্ষণ করতে থাকলে আতঙ্কগ্রস্থ শহরবাসী পালিয়ে যেতে থাকে। পটুয়াখালী শহরের চারদিক নদী ।

নৌকায় ও সাঁতরিয়ে পলায়নরত লোকদের ওপর বর্বর বা'হিনী গুলী বর্ষণ করতে থাকে। নদীতে সাঁতারকাটা অবস্থায়ও বহু লোক মারা যায়। লোহালিয়া নদীর পানি রক্তাক্ত হয়ে যায়। বিমান থেকে ৩ ঘন্টা যাবত গুলীবর্ষণ করা হয়। হেলিকপ্টার দিয়ে ছত্রী সৈন্য নামান হয় এবং ১ টি দল যায় বরিশাল থেকে স্থলপথে । যাওয়ার পথে রাস্তার দু' ধারের বাড়ী-ঘর পুড়ে ফেলে এবং অগণিত লোককে হত্যা করে। পটুয়াখালী শহর দখল করে ঘরে ঘরে তল্লাশী চালায়। নতুন বাজার এলাকা সম্পূর্ণ পুড়ে ফেলে। ২৬শে এপ্রিল পটুয়াখালী শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। পড়ে থাকা শত শত লাশ পটুয়াখালী এসডিও নিজে দাফনের ব্যবস্থা করে।

পাকসেনারা ২৭শে এপ্রিল ঝালকাঠী শহর দখল করে। ঝালকাঠি বন্দরে অনুরূপভাবে ঘর-বাড়ী পোড়ে এবং অগণিত লোককে হত্যা করে। ৩রা মে পিরোজপুর শহর, ৭ই মে ভোলা ও ৯ই মে বরগুনা শহর পাকবাহিনী দখল করে হত্যা, লুট, নারী নির্যাতন ও ধ্বংসলীলা চালায়।

২৫ ও ২৬শে এপ্রিল তারিখে পাকবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে মুক্তিযোদ্ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলে যান। পাকবাহিনীর লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ, গণহত্যাসহ নারীধর্ষণ স্বচক্ষে দেখে ভয়ে এ অঞ্চলের কৃষক, ছাত্র, যুবক অনেকেই সীমান্ত অতিক্রম করে চলে যায় প্রতিবেশী ভারতে এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ট্রেনিং গ্রহণ করে । কেউ কেউ স্থানীয়ভাবেও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং পাকবাহিনীকে প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টায় পুনরায় সংঘবদ্ধ হতে থাকে। এরই মধ্যে জামায়েত ইসলাম, মুসলিম লীগের কিছু পাকিস্তানীপন্থী লোক আলবদর ও রাজাকার বাহিনীতে যোগদান করে। আলবদর ও রাজাকারের মাধ্যমে স্থানীয় কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি শত্রুতামূলক হত্যাকান্ড পরিচালনা করে। বিভিন্ন প্রকার দালালির মাধ্যমে তারা পাকবাহিনীর সাথে শুরু করে ব্যাপক হত্যাকান্ড। এর ফলে এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি হয়। যে-সব এলাকায় হিন্দুদের বসবাস সে সব এলাকায় দালালদের চক্রান্তের মাধ্যমে পাকসেনারা বিভিন্ন সময় বিভিন্নস্থানে অসংখ্যক অপারেশন পরিচালনা করেন। প্রায় প্রতিদিন ভারী অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে পাকবাহিনী গানবোট, লঞ্চ ও স্পীড বোট নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম আক্রমণ করেছে। নদীর তীরের অসংখ্য বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়। হত্যা করে সরল-সহজ গ্রামবাসীদেরকে।

সতর দশকে মগ ও পর্তুগীজদের আক্রমণে যেভাবে নদী বা খালের নিকটবর্তী এলাকা জনশূন্য হয়েছিলো, ঠিক তেমনিভাবে এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়ে এবং মানুষ সবসময় আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করতো। ২৮শে মে বাখরগঞ্জ জেলার কলসকাঠিসহ পার্শ্ববর্তী

এলাকায় হত্যাকান্ড চালায়। গৌরনদী থানার রাংতা, বেজগাতি, কসবা, বাটাজোর, শোলক, গৈলা, বাকাই, বাকাল, দত্তপাড়া, জলিরপাড়, সুতারবাড়ী, টরকী, বাগদা, চন্দ্রপাড়া গ্রামে পাকবাহিনী আক্রমণ পরিচালনা করে। এসমস্ত এলাকা হানাদার বাহিনী পাখির ন্যায় নির্মমভাবে লোক হত্যা করে। বিখ্যাত সার্কাস-এর মালিক লক্ষণ দাসকে হত্যা করে পাকবাহিনী । এমনকি সার্কাসের হাতিটিকেও গুলী করে হত্যা করে পৈশাচিক আনন্দ লাভ করে পাকসেনারা।

২৪ শে মে পাকবাহিনী উজিরপুর বন্দর আক্রমণ করে এবং অনেককে হত্যা করে। মাধবপাশা নিবাসী সিরাজ মাওলানাকে মুক্তিবাহিনী হত্যা করার পর তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ২০শে মে লঞ্চযোগে পাক-সেনারা গুঠিয়া গিয়ে বিভিন্ন গ্রামে নির্বিচারে হত্যা, লুন্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করে প্রায় ৭শ' লোককে হত্যা করে বরিশাল ফিরে আসে।

১৭ ও ২৪ শে জুলাই মুলাদী থানা আক্রমণ করে অনেক গ্রামবাসীকে হত্যা করে । এ দিন দালালদের সহায়তায় কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

১৫ই নভেম্বর পাক-বাহিনী মেহেন্দীগঞ্জ থানার কালিকাপুর গ্রামের অনেককে হত্যা করে। ঝালকাঠি ছিলো পাকসেনাদের পৈশাচিক হত্যাকান্ডের লীলাভূমি। ২৩শে মে বামনন্দপুর মসজিদে দোয়া ইউনুস পড়ার সময় অনেক মুসল্লীদের হত্যা করে। কুতুবকাঠি, কীর্তিপাশা, গোয়ালকান্দা, পাজিপুথিপাড়া, শ্রীমন্তকাটি ও ভীমরুল গ্রামে কয়েক শ' লোক হত্যা করে।

স্বরূপকাঠি থানায় পাকবাহিনী ঘৃণ্যতম হত্যাকান্ড চালায়। নদী দিয়ে স্পীড বোটে দু'জন পাকসেনা যাওয়ার সময় তাদেরকে মুক্তিবাহিনী আক্রমণ করে হত্যা করে। এর পরেই লঞ্চবোঝাই করে স্বরূপকাঠি পাকসেনারা পৌঁছে। নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু যাকে যে অবস্থায় পেয়েছে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। নদীর দু'তীরের সব ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। আটঘর-কুরিয়ানা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঘাঁটি স্থাপন করে সেখানে অবস্থান করে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া শেষ হলে লোকজন পেয়ারা বাগানে আশ্রয় নেয় কিন্তু পৈশাচিক বাহিনী পেয়ারা বাগান কেটে পরিস্কার করতে থাকে, যাতে লোকজন বাগানেও থাকতে না পারে। আটঘর-কুড়িয়ানা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পিছনে ডোবায় ৪ শ' লোক হত্যা করে পুঁতে রাখে।

১৯৭১ সনের ২৫শে এপ্রিল হ'তে ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বরিশাল জেলার প্রতিটি থানায় অসংখ্য গ্রামে গিয়ে কৃষক, শ্রমিক, যুবক, হিন্দু, আওয়ামী লীগ নেতা, মুক্তিযোদ্ধা ও নিরীহ জনগণকে গুলী করে হত্যা করে। অনেককে ধরে এনে লঞ্চের ভেতর হত্যা করে

নদীতে ফেলে দেয়। বিশ্ব বিবেকের চাপে পাক সরকার জুলাই মাস হতে লাশ মাটি চাপা দেয়া শুরু করে। লম্বা গর্ত করে শ' শ' লাশ এক গর্তে মাটিচাপা দেয়। যাদের হত্যা করা হতো তাদেরকে দিয়েই গর্ত করানো হতো । কখনও আবার জীবিত মাটিচাপা দিয়েছে অনেককে।

২৯ শে মে স্বরূপকাঠি থানার খারাবাক গ্রামে অঞ্জলী রানী কর্মকারকে পাকসেনারা হাত-পা বেঁধে জীবন্ত পুড়ে হত্যা করে। বরিশালের হাটখোলার দিপালীর মা ইজ্জত রক্ষার জন্য মেয়েকে ফেলে পালিয়ে আসে। পাক সেনারা ক্রুদ্ধ হয়ে ৮ মাসের শিশু দিপালী রায়কে পেট চিরে হত্যা করে। পাকসেনাদের এহেন হত্যাকান্ড হিটলারের হত্যাকান্ডকেও হার মানিয়েছে। এ অঞ্চলে বুদ্ধিজীবীসহ প্রায় ৭৫ হাজার লোক নৃঃশংসভাবে পাকবাহিনীর হাতে শাহাদৎ বরণ করেন।

১৭ জন মুক্তিযোদ্ধা

একটি সুশিক্ষিত ও অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ভারী অস্ত্র-শস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের ছিলো না। তাই ২৫ ও ২৬শে এপ্রিল পাক হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখযুদ্ধে টিকতে পারে নি। প্রাথমিকভাবে পরাজয় বরণ করলেও বর্বর পাকবাহিনীর লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, গণহত্যা, নারীধর্ষণ দেখে হাজার হাজার কৃষক, যুবক, ছাত্র, আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, আনসার, পুলিশ ভারতে চলে যান। সেখানে গিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এ অঞ্চলের প্রায় সবাই ভারতে হাসনাবাদে একত্রিত হয়। পুনরায় যুদ্ধ করে পাকবাহিনীর কবল থেকে বরিশালকে মুক্ত করার জন্য ৭ই মে এম.ভি আনোয়ারা ও এম.ভি. সোহাগপুর নামে দু'টি লঞ্চে অস্ত্র বোঝাই করে সুন্দরবনের পথে বরিশাল রওয়ানা দেয়। লঞ্চ দু'টিতে মেজর জলিল, লেঃ নাসির, নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, মহিউদ্দিন আহমেদ, সরদার জালাল উদ্দীন, আ,স,ম ফিরোজ ও কুতুবসহ প্রায় ৪৫ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিলো। একটি ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজ লঞ্চ দু'টোকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। রাতের অন্ধকারে লঞ্চ দু'টো সুন্দরবনের গাবুয়া নদী দিয়ে চলছিলো। রাত ৯টায় খুলনার পাইকগাছা এলাকার বুড়িগোয়ালিনীতে পাকিস্তানী বাহিনীর টহল গানবোট লঞ্চ দু'টি দেখে ফেলে। পাকবাহিনী সার্চলাইট মেরে লঞ্চ দু'টি থামার নির্দেশ দিলেও তা উপেক্ষা করে এগুতে থাকে। পাকবাহিনী লঞ্চ ২টি লক্ষ্য করে অবিরাম গুলি বর্ষন করতে থাকে। লঞ্চ দু'টি হতেও পাল্টা গুলীবর্ষণ করা হয়। অবিরাম গোলা বর্ষণের মধ্যে এক পর্যায় সারেং লঞ্চ দু'টিকে এক চরে ঠেকিয়ে দেয়। গোলার আঘাতে লঞ্চ দু'টি পানিতে ডুবে যায়। সবাই তীরে উঠতে পারলেও রাতের আঁধারে অনেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নূরুল ইসলাম মঞ্জুর এবং মেজর জলিলসহ একটি গ্রুপ ভারতের দিকে যেতে

সক্ষম হয়। বিচ্ছিন্নভাবে দৌঁড়ে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে লেঃ নাসির, সর্দার জালাল উদ্দিন, মহিউদ্দিন আহমেদ,আ,স,ম, ফিরোজসহ ১৯ জন সকালে একত্রিত হয়ে ভারতে চলে যাবার পথ খুঁজতে থাকে। পাইকগাছার মদিনাবাদ গ্রামে অস্ত্রহীন এ মুক্তিযোদ্ধা দলটিকে জামায়েত নেতা ও স্থানীয় শান্তি কমিটির সভাপতি মাওলানা সালামের নেতৃত্বে তার বাহিনী কয়রা ইউপি চেয়ারম্যান কাসেম আলীর বাড়ীতে আটকে রাখে। সেখান থেকে আ.স.ম. ফিরোজ এবং সুরুজ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। মাওলানা সালাম খুলনা গিয়ে মাওলানা ইউসুফের সহায়তায় পাকিস্তানী বাহিনীকে কয়রা নিয়ে যায় । সেনাবাহিনী আটককৃত ১৭ জনকে একটি গানবোটে করে খুলনা নিয়ে আসে। খুলনা পৌঁছার পর গানবোট থেকে নামার সময় হতেই সবাইর ওপর পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হয়। লেঃ নাসিরকে দিয়ে খুলনা বেতার থেকে ভাষণ দিতে বাধ্য করে । খুলনা থেকে চোখ বেঁধে সেনা ট্রাকে যশোর ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয় সবাইকে। যশোর ক্যান্টনমেন্টে সবাইর ওপর দৈহিক ও অমানষিক নির্যাতন করা হয়। লেঃ নাসির পাকিস্তানী সেনাদের নির্যাতনের ফলে মুক্তিবাহিনীর সকল কর্মকান্ডের কথা বলতে বাধ্য হন। পরের রাতেই ১৭ জনকে হেলিকাপ্টারে করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে যায়। তথায় "কুখ্যাত প্রিজনার্স ক্যাম্পে" তাঁদেরকে রাখে।

পাকিস্তানী হানাদারদের পক্ষে বিবৃতি দেয়ার জন্য বিভিন্নভাবে শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। নির্যাতনে মহিউদ্দিন আহম্মদ-এর পাজরের হাড় ভেঙ্গে যায়। তাঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ এনে আদালতে বিচার করে কয়েকজনের ফাঁসীর হুকুম দেয়া হয়। কিন্তু ফাঁসী কার্যকর করার আগেই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় মুক্তি পান সবাই।

বরিশালের পত্রিকার ভূমিকা

পঁচিশে মার্চের ভয়াল কালো রাতে হানাদার পাকবাহিনী এদেশের বুদ্ধিজীবী মানুষের ওপর নির্বিচারে চালায় হত্যাকান্ড। অতর্কিত আক্রমণে ঢাকাসহ দেশের প্রতিটি জেলা ও মহকুমা সদর দফতর যখন নিঃসাড়, তখন প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের সংবাদ প্রকাশনা এবং গণ অসহযোগ আন্দোলিত জনগণকে উদ্দীপ্ত করার কাজে লিপ্ত ছিলো দেশের অভ্যন্তরীণ বা সীমান্ত অঞ্চলের বেশ কিছু সংখ্যক পত্র-পত্রিকা। সেই পত্রিকাগুলোর মধ্যে বরিশালের "বাংলাদেশ" এবং "বিপ্লবী বাংলাদেশ" পত্রিকা দু'টো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসে এক অসমান্য ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলো এ দু'টো পত্রিকা। অবরুদ্ধ গোটা বাংলাদেশে যখন জাতীয় পত্রিকাগুলো মুক্তিযুদ্ধের খবর তেমন দিতে পারছিলো না, মুক্তিযোদ্ধাদের যখন চিহ্নিত করা হচ্ছিলো দুষ্কৃতিকারী বলে, তখন

মুক্তিযোদ্ধারা প্রকাশ করে চলছিলো মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ এবং এ সংক্রান্ত নানাবিদ নিবন্ধ।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদ পত্র "বাংলাদেশ", বাংলাদেশ গেজেটে বা বাংলাদেশের সংবাদপত্র সাময়িকীতে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তাতে বাংলাদেশের প্রথম সংবাদ পত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বরিশাল থেকে প্রকাশিত "বাংলাদেশ" পত্রিকাটিকে। সংবাদ পত্রের ইতিহাসে "বাংলাদেশ"-এর ভূমিকা কম হলেও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদ পত্র হিসেবে এর গুরুত্ব অবশ্যই অপরীসীম। এদেশের মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে এ পত্রিকাটির জন্ম। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন শেষে ডাক এলো স্বাধীনতা সংগ্রামের। ২৫ শে মার্চ রাতে পাকসেনার আক্রমণ চললো সমগ্র বাঙালির ওপর। প্রতিবাদের রণাঙ্গণে পরিণত হলো সমগ্র বাংলাদেশ। বরিশাল তখন শত্রুমুক্ত। বরিশালের জনগণ চেতনার তাড়নায় মরিয়া হয়ে ওঠে। বিভিন্ন স্থান থেকে পাকিস্তানী সেনাদের নির্যাতনের ঘটনা এসে পৌঁছতে থাকে বরিশালে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সংঘবদ্ধ বরিশালবাসীর মনে বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দেয়। মানুষ দিন দিন আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে একটি পত্রিকা প্রকাশ করার। পত্রিকাটি হবে মনোবলহীন মানুষের হাতিয়ার। পত্রিকার নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ'। সম্পাদনায় ছিলেন- এস.এম. ইকবাল। হেলাল উদ্দিন আহমেদ ও মিন্টু বসু। প্রকাশনায়-হারেছ আহমেদ খান, এনায়েত হোসেন মিলন এবং মুকুল দাস।

পত্রিকাটি ছিলো দু'পাতার এবং মূল্য ছিলো পনের পয়সা। দশ হাজার কপি ছাপানো হতো। ১৭ই এপ্রিল সকালে পত্রিকাটি বাজারে ছাড়া হয়।

শিরোনাম স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের বেতার ভাষণ দিয়ে করা হলো। বঙ্গবন্ধুর ছবি দিয়ে তার নিচে "শোন একটি মুজিবরের থেকে" গানটি সংযোজিত করা হলো। প্রথম পাতায় রণাঙ্গণের খবর। রণাঙ্গণের দায়িত্বভার এবং বিশ্বের নেতৃবৃন্দের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বিভিন্ন মন্তব্য নিয়ে শেষ হয় সম্পাদকীয়। পত্রিকার সব কপি এক দিনে বিক্রি হয়ে গেল। রাতের মধ্যেই আরও ৭ হাজার পত্রিকা ছাপার ব্যবস্থা করা হলো। ১৮ই এপ্রিল পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যা বের হবার জন্য সব কিছু প্রস্তুত। সকাল পৌনে এগারোটায় কম্পোজ ও মেকআপ শেষে মেশিনে স্থাপনের জন্য উঠান হয় ঠিক এমনি সময় পাকিস্তানী হানাদারবাহিনী বিমান হামলা চালালো বরিশালের ওপর। বিমান হামলায় সবাই আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে নিরাপদ আশ্রয় চলে যায়। আর ছাপানো সম্ভব হলো না। এমনিভাবেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদ পত্রটির অকালে মৃত্যু ঘটলো।

একাত্তরের বেয়োনেটের ধার আর বারুদের গন্ধ গায়ে মেখে "বিপ্লবী বাংলাদেশ" পত্রিকার জন্ম। বাংলাদেশ একদিকে প্রজ্জ্বলিত অন্যদিকে রণাঙ্গণের প্রতিরোধে মুক্তিযোদ্ধারা সোচ্চার। ঠিক সে মুহূর্তে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মুক্তির আহবান জানিয়ে প্রকাশ হয়েছিলো "বিপ্লবী বাংলাদেশ"। সে দিনের পশ্চিমা অনুশাসনকে ভয় পায় নি। নির্ভয় লেখা হয় সে শাসনের বিরুদ্ধে। একহাতে অস্ত্র আর এক হাতে কলম। এক হাতে করা হয় শত্রু হনন আর একহাতে কলম নিয়ে ডাক দেয়া হয়েছিলো দেশের জন্য লাখ লাখ মা-বোন-ভাইকে। সেদিন মৃত্যুকে কেউ ভয় পায় নি। বিপ্লবী বাংলাদেশের ইতিহাস স্বাধীনতার যুদ্ধের ইতিহাস। বরিশাল হতে সুন্দরবনের নদী-নালা আর দুর্গম পথ অতিক্রম করে ভারতীয় সীমান্ত বন্দর হাসনাবাদ গিয়ে পৌঁছল অনেকেই। মুক্তিযোদ্ধারা হাসনাবাদে গড়ে তুললেন একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন শ' শ' রণাঙ্গণের মুক্তিযোদ্ধারা জড় হতে লাগলেন। পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠির নির্মম অত্যাচার থেকে বাংলা আর বাঙালিকে মুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিলো সবার। জুলাইর শেষ দিকে এই ক্যাম্পে যোগ দেন জনাব নুরুল আলম ফরিদ এবং মোঃ ইউসুফ হোসেন। একটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে আলাপ হলো দু'জনের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পত্রিকা প্রকাশের সব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

ভারতের ক্রান্তি প্রেস থেকে ছাপা হলো পত্রিকা। কিন্তু ছদ্ম নাম দেয়া হলো চাঁপা প্রেস বাংলাদেশ। ৪ঠা আগস্ট 'বিপ্লবী বাংলাদেশ' প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হলো। পত্রিকা প্রথম সংখ্যা ছাপা হয়েছিলো পাঁচ হাজার। সম্পাদক ছিলেন জনাব নুরুল আলম ফরিদ। পত্রিকাটি ছাপা শেষে নূরুল আলম ৯ নম্বর সেক্টেরের প্রশিক্ষণ শিবিরে, অপারেশন ক্যাম্পেসহ বাংলাদেশের মুক্তাঙ্গণে পত্রিকাটি বিতরণের ব্যবস্থা করেন। সমস্ত ক্যাম্পে পত্রিকাটি নিয়ে উল্লাস ধ্বনি হয়।

ইতোমধ্যেই প্রকাশনা ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ মিন্টু বসুকে পাওয়া গেল। তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানেই দ্বিতীয় সংখ্যা ২১শে আগস্ট প্রকাশ করা হলো। তারপর সাপ্তাহিক হিসেবে নিয়মিত প্রকাশ হতে থাকে। ৯ নম্বর সেক্টরে বিপ্লবী বাংলাদেশ নামে পত্রিকাটি স্বাধীনতা যুদ্ধে একটি দূরপাল্লার কামানের চেয়েও বেশী কাজ করেছে। প্রবাসে এ পত্রিকাটির শেষ সংখ্যা বের হয় ২৬শে ডিসেম্বর। পত্রিকার রিপোর্টিং, সম্পাদকীয়,উপ-সম্পাদকীয় লিখে মুক্তিযুদ্ধকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরেছে। সাপ্তাহিক হিসেবে ২১ বছর বের হবার পর ১৯৯১ সালে ৯ই জুলাই থেকে দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশ হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল দিনে যে পত্রিকার জন্ম সে পত্রিকা 'বিপ্লবী বাংলাদেশ' বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে আজও মুক্তিযুদ্ধের মহান আদর্শকে সমুন্নত রেখে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখছে।

বরিশাল মুক্ত ও পাকসেনাদের আত্মসমর্পণ

একাত্তরের এপ্রিল-মে মাস থেকে ঘটনাপ্রবাহের দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এপ্রিল মাসেই মুজিবনগর সরকার সমগ্র রণাংগণকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে ১১ জন সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ করেন। পঁচিশে মার্চ ঢাকায় গণহত্যা শুরু হওয়ার পরেই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জওয়ানরা বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য ঘোষণা করে লড়াই শুরু করে। সশস্ত্র বাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতার জন্য প্রাক্তন ই.পি.আর. ও সশস্ত্র পুলিশের সদস্যরাও এসে যোগ দেয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডারের অধীনে যোগ দিতে শুরু করে। সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈনিকরা দ্রুত হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ দান করেন। সেক্টর কমান্ডাররা নিজেদের এলাকার অবস্থার প্রেক্ষিতে যুদ্ধের কৌশল স্থির করার ব্যাপারে স্থানীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তাই মুক্তিযুদ্ধ বিভিন্ন এলাকার যুদ্ধের ভিন্নভিন্ন রূপে দেখা গিয়েছে। তবে যেসব সেক্টরে কমান্ডাররা যত বেশী গেরিলা পদ্ধতির দিকে বেশী নজর দিয়েছেন তাঁরা ততো বেশী সাফল্য অর্জন করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে বাঙালিরা প্রমাণ করেছে যে, তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদে সক্ষম। আবার গণহত্যা ও অস্ত্রের ভাষায় জবাব অস্ত্র দিয়ে প্রদর্শণেও পারদর্শী। কোন প্রতিবন্ধকতাই আমাদের মুক্তিবাহিনীকে হতোদ্যম করতে পারে নি। ১১টি সেক্টরেই মুক্তিবাহিনীর দামাল ছেলেদের লড়াই-এর কাহিনী আজ সুদীর্ঘ ২৬ বছর পরও লোকগাঁথায় পরিণত হয়েছে।

১১টি সেক্টরের অন্যতম ৯ নম্বর সেক্টর যার ভৌগোলিক অবস্থা বিশেষ কয়েকটি কারণে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ বাংলাদেশের দু'টি সামদ্রিক বন্দরের মধ্যে একটি এ সেক্টরের অন্তর্গত। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক বনভূমি সুন্দরবন এ সেক্টরেই। বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতের বাংলা ভাষা-ভাষী প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ। এ সেক্টরের সীমান্ত সংলগ্ন ও সামুদ্রিক বন্দরের কারণে খুলনা এবং বরিশালের একটি অতিরিক্ত গুরুত্বও ছিলো। ৯ নম্বর সেক্টরে নৌ-কমান্ডাররা অক্টোবর মাসের মধ্যেই মোংলা বন্দর অকেজো করে দেয়। সুন্দরবন একটি দুর্গম বনাঞ্চল যার নিয়ন্ত্রণ প্রায় সব সময়েই মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ছিলো।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কোলকাতা থেকে নবম সেক্টরের কাছাকাছি হওয়ায় এ সেক্টরের কর্মকান্ড খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ পেতো। জুন মাসের দিকে স্বাধীন বাংলা

বেতার কেন্দ্র চালু হবার পরে নবম সেক্টরের খবরাখবর দ্রুত ঐ বেতার মারফত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। নবম সেক্টরের ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে বিচ্ছু বাহিনী গঠন করা হয়। এ সেক্টরে আরও একটি ব্যতিক্রম ছিলো মহিলা গেরিলা সদস্য। বীথি ও যূথী এ দু'জন মহিলা গেরিলা বিভিন্ন অপারেশনে সম্মুখযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলো। গেরিলা ও নৌযুদ্ধ মূলতঃ এ সেক্টরেই অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।

নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশের অভ্যন্তরের চিত্রের কথা উল্লেখ করলে বলা যায় যে, মেজর জেনারেল নিয়াজী পাঁচটি স্থায়ী এবং দু'টি অস্থায়ী কমান্ডের অধীনে তাঁর সমস্ত সেনাবাহিনী ও প্যারা মিলিশিয়াকে মোতায়েন করে নির্দেশ জারি করলেন যে, "কমপক্ষে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ সৈন্য হতাহত না হওয়া পর্যন্ত কোন পজিশন থেকে পশ্চাদপসারণ করা যাবে না। এরপরেও পশ্চাদপসারণ করার আগে সংশ্লিষ্ট জি ও সি-র অনুমতি নিতে হবে"।

অক্টোবর মাস পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষে পাকিস্তানী সেনাবহিনীর বিপুল সংখ্যক অফিসারসহ কয়েক হাজার সেনা নিহত ও আহত হন। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এমন একটা অবস্থা বিরাজ করছিলো যখন সন্ধ্যার পর কোন ব্যাংকার বা ক্যাম্প থেকে পাকিস্তানী সেনাদের বাইরে আসা দুরহ হয়ে পড়ে। কয়েকটি শহর ছাড়া বাকী সমস্ত এলাকাতে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা অবাধে ঘোরাফেরা করতে সক্ষম হন। বরিশাল ও সাতক্ষীরা এলাকাতে দিনের বেলাতেও পাকিস্তানী সেনাদের যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এতে দখলদার বাহিনীর মনোবল দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে।

সাতক্ষীরা, খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালী এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত পাকিস্তানের নবম ডিভিশনে সর্বপ্রথম "ফাটল" সৃষ্টি হয়। নবম সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী সেনাদের ওপর অতর্কিত হামলা অব্যাহত রেখে পাকসেনাদের অবস্থান বিপর্যস্ত করে দেয়।

৯ নম্বর সেক্টরের বীর মুক্তিযোদ্ধারা তুমুল যুদ্ধ করে বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার থানাসমূহ মুক্ত করতে থাকে। প্রচন্ড আক্রমণের ফলে ১৬ই নভেম্বরের মধ্যে প্রায় সব থানা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। ৩০শে নভেম্বরের পর পাকবাহিনী শুধু নিজ নিজ ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান নেয়। ৩রা ডিসেম্বর শুরু হয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। ৫ই ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা সাতক্ষীরা জেলা দখল করে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। নেতৃত্বদানকারী সাব-সেক্টর কমান্ডারসহ অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন.বরিশাল এলাকার।

সারা দেশে মিত্রবাহিনীর প্রচন্ড বিমান হামলা চলতে থাকে। ৬ ও ৭ই ডিসেম্বর রহমতপুর বিমান ঘাঁটিতে দু'টি বোমারু বিমান ব্যাপক বোমা বর্ষণ করে বিমান ঘাঁটি অকেজো করে দেয়। ৭ তারিখ যশোর শহরের পতন ঘটে। যশোর খুলনা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচন্ড আক্রমণের মুখে অনেক পাকসেনা পালায়ন করে লঞ্চযোগে বরিশাল এসে পৌঁছে। ৮ই ডিসেম্বর সকালে হঠাৎ করে বরিশাল শহরে কার্ফু ঘোষণা করে। বরিশাল ওয়াপদা কলোনী থেকে সকল পাকসেনাবাহিনী কয়েকটি লঞ্চযোগে বেলা ১২টায় স্টীমার ঘাট ত্যাগ করে। ১টি লঞ্চে বরিশালের শান্তিকমিটির কয়েকজন সদস্যও ঢাকার উদ্দেশ্যে বরিশাল ত্যাগ করে। শান্তি কমিটির সদস্য শাহজাহান চৌধুরী এদের মধ্যে অন্যতম। বরিশাল স্টীমার ঘাট হতে লঞ্চগুলো ছেড়ে যাবার পরই শহরের কার্ফু শিথিল হয় এবং শহরবাসী জানতে পারে পাকসেনারা বরিশাল থেকে পালিয়ে ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছে। এ সংবাদের সাথে সাথে ঘর থেকে মানুষ রাস্তায় নেমে আসে এবং জয় বাংলা শ্লোগানে শহর মুখরিত করে তুলে। এ সংবাদ মুক্তি বাহিনী এবং মিত্রবাহিনীর কাছে পৌঁছে যায়। বর্বর পাকসেনাবাহী লঞ্চগুলো আস্তে আস্তে চরবাড়ীয়া ও শায়েস্তাবাদ হয়ে মীরগঞ্জ অতিক্রম করতে থাকে। যে পথে ২৫শে এপ্রিল/৭১ তারিখ ঢাকা থেকে বরিশাল আক্রমণ করেছিলো ঠিক একই পথ ধরে পালিয়ে যেতে থাকে। মীরগঞ্জ থেকে একটু সামনে এগুতেই মিত্রবাহিনীর বোমারু বিমান লঞ্চগুলো লক্ষ্য করে বোমা ও গুলী বর্ষণ করতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে লঞ্চগুলোতে আগুন ধরে যায় এবং নদীতে ডুবে যায়। বোমা হামলায় লঞ্চে আগুন ধরার ধোঁয়া তালতলী থেকে দেখা গিয়েছে। পাক সেনারা নদীর পশ্চিম পাড়ে ঠাকুরমল্লিক ও পূর্ব পাড়ে নন্দিরবাজারে উঠার চেষ্টা করে। এ সময়ে হাজার হাজার গ্রামবাসী ও মুক্তিবাহিনী ছুটে আসে। গ্রামবাসীরা গণপিটানি দিয়ে, কুপিয়ে এবং পানিতে চুবিয়ে পাকসেনাদের নির্মমভাবে হত্যা করে। গ্রামের মহিলারাও ঝাড়ুদিয়ে পিটিয়ে মনের কষ্ট প্রশমিত করে। চারদিকে সবাই বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়ে। বিকেলেই মুক্তিযোদ্ধারা বরিশাল শহরে উঠে পড়ে। সকল বাসভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়তে থাকে। পরদিন থেকে মুক্তিযোদ্ধাসহ থানা কমান্ডার ও সাব-সেক্টর কমান্ডারগণ বরিশাল শহরে উঠতে থাকে। কয়েকজন থানা কমান্ডার ও সাব-সেক্টর কমান্ডর তালতলী বন্দরে লঞ্চযোগে আসে এবং এখান দিয়ে অস্ত্র-শস্ত্রসহ বরিশাল শহরে উঠে।

নূরুল ইসলাম মঞ্জু পাঁচ শ' মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ১৭ই এবং ১৮ই ডিসেম্বর সেক্টর কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর এম.এ. জলিল খুলনা হতে লঞ্চযোগে বরিশাল পৌঁছে। তাঁরা পৌঁছার পর বরিশালবাসী প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানান।

ভারতীয় পার্লামেন্টে বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেন ৬ই ডিসেম্বর। এর আগে স্বীকৃতি দেয় প্রতিবেশী ভূটান। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণে পাকসেনাদের ঘাঁটির পতন ঘটতে থাকে। এক এক করে বিভিন্ন জেলা সদরের পতন ঘটায় পাকসেনারা পিছু হটে ঢাকায় জড়ো হতে থাকে। প্রায় সমস্ত জেলা মুক্ত করে মুক্তিবাহিনী ডিসেম্বরের ১৩-১৪ তারিখে ঢাকা শহরের চারিদিকে ঘেরাও করে ফেলে এবং পাক সেনাদের আত্মসমর্পণ করার চাপ সৃষ্টি করে। ১৫ই ডিসেম্বর বিভিন্ন আলোচনার পর হানাদার বাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এ, এ, কে, নিয়াজী আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। ১৬ই ডিসেম্বর বিকেলে পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণের সময় নির্ধারণের পর ১৫ তারিখ বিকেল থেকেই বিমানবাহিনীর হামলা বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়।

এ সময় থেকে বাংলাদেশের অবস্থা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। পশ্চাদপসারণরত পাকিস্তানী সৈন্যরা হাজার হাজার লোক হত্যা করেছে। শহরের উপকণ্ঠে যেখানে সেখানে লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেছে । সর্বশেষ খবর ঢাকায় কারফিউ-এর মধ্যে আল-বদর ও রাজাকার সদস্যরা বাড়ি বাড়ি তল্লাশী করে বুদ্ধিজীবীদের চোখ বেঁধে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। এরপর এদের খবর আর কেউ বলতে পারে নি। এ সব বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক, আইনজীবী, সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাংবাদিক সব ধরণের পেশার ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন। ১৪ ও ১৫ তারিখ এদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। তাই ঢাকায় তখন এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজ করছিল। বিরতিহীন কারফিউ-এর জন্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কোন যোগযোগ ছিল না। কেবল নৃশংস হত্যার খবর পাওয়া যায় চারদিক থেকে। সন্তানহারা পিতা, স্বামীহারা বধু, পিতৃহারা এতিম বাচ্চার ফরিয়াদে খোদার আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠে। ঢাকা নগরীতে প্রায় সবাই পলাতকের ন্যায় জীবন যাপন করেছে।

১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের পূর্ব মুহূর্তে ঢাকা নগরীর অবস্থা বর্ণনা করা সত্যিই দূরূহ ব্যাপার । সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। ১৬ই ডিসেম্বর সকালের দিকে যেখানে ঢাকার পথঘাট ছিলো প্রায় জনশূন্য ; বেলা তিনটা নাগাদ সেখানে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে প্রায় দশ লাখ লোকের জমায়েত হলো। সবাই পরাজিত পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান দেখতে উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে। মাত্র ন'মাস ন'দিন আগে এই রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন,"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" ১৬ই ডিসেম্বর ঠিক সেই জায়গায় পাকিস্তানী সৈন্যরা

আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে। আজ সেখানে আবার জনতার ঢল নেমেছে। চারিদিকে শুধু গগনবিদায়ী "জয়বাংলা" শ্লোগান।

১৬ই ডিসেম্বর বিকাল ৩টায় ভারতীয় কমান্ডার প্রধান লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা কোলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সস্ত্রীক হেলিকপ্টারে তেজঁগা বিমান বন্দরে অবতরণ করলেন। এক হৃদয়স্পর্শী দৃশ্যপটে লেঃ জেনারেল নিয়াজী বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানিয়ে স্যালুট করলেন এবং করমর্দন করলেন অরোরার সাথে। ইতোমধ্যে প্রবাসী গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রতিনিধি হিসেবে বিমানবাহিনীর প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে, খন্দকার হেলিকপ্টারে ঢাকায় এসে হাজির হলেন। দুপুর থেকেই ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ঢাকা নগরীতে প্রবেশ শুরু করে।

পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক সামরিক কমান্ডার লেঃ জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজীকে সাথে নিয়ে ভারতীয় কমান্ডার লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা বিকেল ৪টা নাগাদ রেসকোর্স ময়দানে হাজির হলেন। সাথে এলেন মিত্রবাহিনী ও পূর্ব পাকিস্তানের সকল সামরিক অফিসারবৃন্দ। মুজিবনগরের প্রতিনিধি গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে, খন্দকার এবং কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান কাদের সিদ্দিকী।

নিয়মমাফিক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাকে গার্ড অব-অনার প্রদান করা হয়। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে জেনারেল নিয়াজী ও অন্যান্য সামরিক অফিসারগণ। সে অভূতপূর্ব দৃশ্য যা চোখে না দেখলে বিবরণ দেয়া যায় না। প্রায় দশ লাখ জনতা চিৎকার করে টাইগার নিয়াজীকে তাদের হাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য দাবী জানান কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনী তাকে কঠোর প্রহরায় বেষ্টনী দিয়ে রাখে। ৪-১৫ মিনিটে অরোরা নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাঝ দিয়ে জেনারেল নিয়াজী ও অন্যদের সাথে করে জোর কদমে এগিয়ে আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের মঞ্চে চলে আসেন। চারিদিকে তুমুল হর্ষধ্বনি। মুহু মুহু শ্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত।

বিকেল ৪-৩১ মিনিটের সময়ে পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহনীর পক্ষে লেঃ জেনারেল এ, এ, কে, নিয়াজী আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করলেন। প্রায় দশ লাখ জনতা আর শতাধিক বিদেশী সাংবাদিক এই অনুষ্ঠান অবলোকন করলেন। এরপর দু'পক্ষের সেনাপতিরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আনুষ্ঠানিকতা পালনের জন্য জেনারেল নিয়াজী তাঁর কোমরের বেল্ট থেকে রিভলবারটা আর ইউনিফরমের কাঁধ থেকে লেঃ জেনারেল ব্যাজ দু'টো জগজিৎ সিং অরোরার হাতে দিয়ে কপালের সঙ্গে কপাল ঘষলেন। পরাজিত পাকিস্তানী

বাহিনীর বাকী সমস্ত সদস্য অস্ত্র সমর্পণ ও ব্যাজ খোলার আনুষ্ঠানিকতা পালন করলো। বন্দি হলেন প্রায় ৯৫,৫৪৮ জন পাকিস্তানী সৈন্য।

দেশ-বিদেশের বেতার ও টেলিভিশনে অবিরাম স্বাধীন বাংলাদেশের কথা উচ্চারিত হলো। সারা বাংলাদেশসহ বিজয় মিছিল বের হলো ঢাকার রাস্তায় রাস্তায়, অলিতে-গলিতে। সাড়ে ৭ কোটি বাঙালি স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললো।

ইতি ঘটলো এক নৃশংসতার। উন্মত্ত দুঃশাসন মুছে নতুন পতাকা নিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসেবে জন্ম নিল বাংলাদেশ। স্বাধীনতা অর্জন করতে ৩০ লাখ লোকের প্রাণ দিতে হলো। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন দেশকে স্বাধীনতার জন্য এত প্রাণ দিতে হয় নি। এত ত্যাগ স্বীকার করতে হয় নি। তাই আমাদের স্বাধীনতা এক দিকে আনন্দের, অন্য দিকে তেমন বেদনারও। প্রায় শূন্য থেকে শুরু যে সশস্ত্র সংগ্রাম, তার সফল সমাপ্তি হলো মাত্র ন'মাসে। এমন নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এ ন'মাসের প্রত্যেকটি দিন ছিলো এক একটি ইতিহাস-একটি বিস্ময়।

ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর শীতের পড়ন্ত বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে (বাংলাদেশ সময়) পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর পক্ষে লেঃ জেনারেল এ এ কে নিয়াজী মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করলেন।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বর্বর পাকবাহিনীর হাতে চরবাড়ীয়া ইউনিয়নে নিহত শহীদদের তালিকা

ক্রঃনং	শহীদদের নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা	বয়স	পেশা
১.	শহীদ ইমান উদ্দিন হাওলাদার পিতা- সেফের উদ্দিন হাওলাদার	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর জেলা- বরিশাল	৯০ বছর	কৃষি
২.	শহীদ মুন্সী আলী আজিম খান পিতা-মরহুম নবী খান	গ্রাম- সাপানিয়া পোঃ- চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর জেলা- বরিশাল	৬৫ "	ব্যবসা
৩.	শহীদ আব্দুর রহমান খান পিতা- শহীদ আলী আজিম খান	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর জেলা- বরিশাল	৪৫ "	কৃষি
৪.	শহীদ জবান আলী হাওলাদার পিতা-নঈম উদ্দিন হাওলাদার	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৫০ "	চাকুরী বেসর-কারী
৫.	শহীদ মোঃ জালাল উদ্দিন হাওলাদার পিতা-মরহুম ফয়জদ্দিন হাং	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৫৪ "	চাকরি
৬.	শহীদ মিসেস লালবরু বেগম স্বামী-শহীদ জালাল উদ্দিন হাং	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৪৯ "	গৃহিণী
৭.	শহীদ মোছাঃ রাহিমা বেগম স্বামী- আঃ জব্বার হাওলাদার	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	২২ "	গৃহিণী

ক্রঃ নং	শহীদদের নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা	বয়স	পেশা
৮.	শহীদ মোসাঃ চানবরু স্বামী-আঃ ছত্তার হাওলাদার	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৩০ বছর	গৃহিণী
৯.	শহীদ বাচ্চু পিতা- আঃ ছত্তার হাওলাদার	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	১০ "	শিশু
১০.	শহীদ মোঃ আব্দুল ওহাব পিতা-মৃতঃ হাতেম আলী হাং	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৩৫ "	চাকরি
১১.	শহীদ পলাশ পিতা- অ্যাডভোকেট আব্দুর রশিদ হাওলাদার	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৮ মাস ৮ দিন	শিশু
১২.	শহীদ আবুল ফজল রাড়ী পিতা- জয়নাল আবেদীন রাড়ী	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	২৫ বছর	গৃহস্থালি
১৩.	শহীদ ময়না বিবি স্বামী-আবদুল ওহাব খান	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	১৬ "	গৃহিণী
১৪.	শহীদ মুজাহার আলী হাওলাদার পিতা-নুর মোহাম্মদ খান	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	২৭ "	চাকরি
১৫.	শহীদ হাসান আলী হাওলাদার পিতা-জিন্নাত আলী হাং	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৩৫ "	কৃষি
১৬.	শহীদ ফজলে আলী হাওলাদার পিতা- আঃ লতিফ হাওলাদার	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	২৫ "	-ঐ-
১৭.	শহীদ আবদুস ছত্তার রাড়ী পিতা-আঃ আজিজ রাড়ী	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া	২৫ "	শ্রমিক

ক্রঃ নং	শহীদদের নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা	বয়স	পেশা
১৮.	শহীদ আলফোন্‌নেছা স্বামী-আঃ আজিজ রাড়ী	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৫৫ বছর	বৃদ্ধ
১৯.	শহীদ আব্দুল ওয়াহেদ হাং পিতা- ছবেদ আলী হাং	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৩৫ "	কৃষি
২০.	শহীদ এসাহাক হাওলাদার	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া	২৫ "	শ্রমিক
২১.	শহীদ রিজিয়া বেগম স্বামী-এসাহাক হাং	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	২২ "	গৃহিণী
২২.	শহীদ হুমায়ুন রাড়ী পিতা- আবদুল ছত্তার রাড়ী	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	২ বছর	শিশু
২৩	শহীদ মোসাঃ আঞ্জুমান নেছা স্বামী- মরহুম হোচেন উদ্দিন হাং	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৪৯ "	গৃহিণী
২৪.	শহীদ আব্দুল আজিজ হাওলাদার পিতা- ওফাজ উদ্দিন হাং	গ্রাম-রাড়ীমহল পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৩৮ "	কৃষি
২৫.	শহীদ আবুল কালাম পিতা- আয়নাল আবেদীন হাং	গ্রাম-রাড়ীমহল পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	১৮ মাস	শিশু
২৬.	শহীদ সেতারা বেগম স্বামী-মুনসুর ফকির (লেদা)	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	২২ বছর	গৃহিণী
২৭.	শহীদ সাফিয়া বেগম পিতা- আরজ আলী	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	১৬ "	অবি- বাহিতা

ক্রঃ নং	শহীদদের নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা	বয়স	পেশা
২৮.	শহীদ জবেদ আলী পিতা- আদম আলী	গ্রাম-চরআইচা পোঃ-শায়েস্তাবাদ থানা-বরিশাল সদর	৪০বছর	নৌকা মাঝি
২৯.	শহীদ আব্দুল ওয়াজেদ হাং পিতা- আ: মজিদ হাং	গ্রাম-সাপানিয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	১৫ "	শ্রমিক
৩০.	শহীদ চান শরীফ পিতা- নীল শরিফ	গ্রাম-সাপানিয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৫৫ "	কৃষি
৩১.	শহীদ মোঃ আব্দুল বারী পিতা- আক্রাম আলী হাং	গ্রাম-উলালঘুনী পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৪০ "	চাকরি
৩২.	শহীদ মোঃ আতাহার আলী হাং পিতা- হাশেম আলী হাং	গ্রাম-চর উলালঘুনী পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৩৫ বছর	কৃষি
৩৩.	শহীদ মোঃ সুলতান হাওলাদার পিতা- আবদুল গণি হাং	গ্রাম-চর-উলালঘুণী পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	২৮ "	-ঐ-
৩৪.	শহীদ মোঃ শাহজাহান মীর পিতা- খোরশেদ মীর	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	২৫ "	শ্রমিক
৩৫.	শহীদ মতলেব আলী খান পিতা- সরুব আলী খান	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	২২ "	চাকরি
৩৬.	শহীদ নয়ন হাওলাদার পিতা- জাফর আলী হাং	গ্রাম-বাড়ী মহল পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	১২ "	ছাত্র
৩৭.	শহীদ এ.এফ.এম. আলী আকবর পিতা- আঃ মজিদ মিয়া	বায়তুল আকবর, আমানতগঞ্জ,বরিশাল	৪২ "	চাকরি

ক্রঃ নং	শহীদদের নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা	বয়স	পেশা
৩৮.	শহীদ ছফুরজান বিবি স্বামী- গহের আলী মীর	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৫০ বছর	বৃদ্ধ
৩৯.	শহীদ কাবিল খান	কর্ণকাঠি,বরিশাল	৫০ "	শ্রমিক
৪০.	শহীদ আব্দুর রশিদ হাং পিতা- আফতার উদ্দিন হাং	নুরিয়া স্কুলের পূর্ব দিকে গাজী বাড়ী,ইউনিয়ন- খালেদাবাদ, বরিশাল	৩০ "	আনসার কমান্ডার
৪১.	শহীদ মোঃ আনোয়ার হোসেন পিতা- এন্তাজ উদ্দিন	গ্রাম-হোসনাবাদ পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	২৫ "	অবসর প্রাপ্ত সৈনিক
৪২.	শহীদ আবদুল মালেক গাজী পিতা- রত্তন গাজী	গ্রাম-উলালঘুনী পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	২৮ "	ইপিআর এ কর্মরত
৪৩.	শহীদ রকমত আলী পিতা- মৃত আঃ জব্বার হাং	গ্রাম- পুরানপাড়া পোঃ- চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর,	৪০ বছর	কৃষি
৪৪.	শহীদ মোঃ জালাল আহমেদ পিতা- মৃত আব্দুস সত্তার হাং	গ্রাম- কাগাশুরা পোঃ- চরবাড়ীয়া থানা- বরিশাল সদর	২০ "	শ্রমিক
৪৫.	শহীদ জামাল পিতা- হাসমত আলী	গ্রাম- চরবাড়ীয়া পোঃ- চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	২ বছর ৬ মাস	শিশু
৪৬.	শহীদ মোতালেব হাং পিতা-আদম আলী হাং	গ্রাম-মতাসার পোঃ-চরবাড়ীয়া	৪০ বছর	ই.পি. আর
৪৭.	শহীদ কাজেম আলী	গ্রাম- কেয়াজংগী পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল।	৩৫ "	শ্রমিক

মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে বর্বর পাকবাহিনীর হাতে চরবাড়ীয়া ইউনিয়নে আহতদের তালিকা

ক্র: নং	আহতদের নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা	বয়স	পেশা
১.	জনাব খোন্দকার আতাহার উদ্দিন পিতা- খোন্দকার মোফাজ্জল হোসেন	গ্রাম-রাড়ীমহল পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর জেলা- বরিশাল	৫০ বছর	চাকরি
২.	কহিনুর বেগম	গ্রাম-পুরানপাড়া পোঃ- চরবাড়ীয়া থানা- বরিশাল সদর	৫ "	শিশু
৩.	জনাব আজিমুদ্দিন হাং পিতা- হোচেন উদ্দিন হাং	গ্রাম-পুরানপাড়া পোঃ- চরবাড়ীয়া থানা- বরিশাল সদর	৪০ "	কৃষি
৪.	জনাব মোঃ ইসমাইল হাওলাদার পিতা- হোচেন উদ্দিন হাং	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৩৩ বছর	ব্যবসা
৫.	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন পিতা- হুচান আলী আকন	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	২৪ "	চাকরি
৬.	মোছাঃ হালিমা বেগম স্বামী-মোতাহার উদ্দিন হাং	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৫৫ "	বৃদ্ধা
৭.	জনাব সামসুদ্দিন হাওলাদার পিতা- মফিজউদ্দিন হাং	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৫০ "	ব্যবসা
৮.	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা পিতা-শহীদ মোঃ জালাল উদ্দিন হাং	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	১৭ "	ছাত্র

ক্র: নং	আহতদের নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা	বয়স	পেশা
৯.	জনাব মোঃ শাহজাহান খান পিতা- নুর মোহম্মদ খান	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পো-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৩৫ বছর	চাকরি
১০.	জনাব মোসাঃ সাফিয়া খাতুন স্বামী-শহীদ আঃ ছত্তার রাড়ী	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	২০ "	গৃহিণী
১১.	জনাব মোঃ শাহ আলম পিতা- জাফর আলী হাং	গ্রাম-রাড়ীমহল পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	১০ "	শিশু
১২.	জনাব আবদুর রশিদ খান পিতা-বন্দে আলী খান	গ্রাম-ইছাকাটি পোঃ-কাশিপুর থানা-বরিশাল সদর	৩৫ "	শ্রমিক
১৩.	জনাব মোহাম্মদ আলী বিশ্বাস পিতা- আমিনউদ্দিন বিশ্বাস	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৫০ "	শ্রমিক
১৪.	একজন উদ্বাস্তু	ভাষানচ মেহেন্দিগঞ্জ,বরিশাল	৫০ "	ভিক্ষুক
১৫.	জনাব এ.এম.জি. কবির ভুলু পিতা- আবুল কাসেম মুন্সী	গ্রাম-পুরানপাড়া পাঃ-চরবাড়ীয়া থানা- বরিশাল সদর	২২ বছর	ছাত্র
১৬.	জনাব মিসেস রাবেয়া খাতুন স্বামী- এ্যাডঃ আঃ রশিদ হাং	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	২৯ "	চাকরি
১৭.	এ্যাডভোকেট আব্দুর রশিদ হাওলাদার পিতা- মোন্তাজউদ্দিন হাং	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৩৯ "	সরকারী উকিল
১৮.	মিসেস জরিনা বেগম স্বামিঃ- ছফর আলী হাং	গ্রাম-পুরানপাড়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৩০ "	গৃহিণী

ক্র: নং	আহতদের নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা	বয়স	পেশা
১৯.	মোসাঃ আলেয়া বেগম পিতা- আঃ ওহাব খান	গ্রাম-চরআবদানী পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৬ বছর	শিশু
২০.	মোছাঃ কহিনুর বেগম পিতা- আঃ ওহাব খান	গ্রাম- চরআবদানী পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৩ "	শিশু
২১.	রোজী বেগম পিতা-আঃ ছত্তার হাং	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৬মাস	শিশু
২২.	জনাব ফজলে আলী চৌকিদার পিতা- গফুর চৌকিদার	গ্রাম-উত্তর লামচরী পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৪৫ "	গৃহস্তালী
২৩.	মিসেস কুলছুম বিবি স্বামী- মোতহারউদ্দিন হাং	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৬০ "	বৃদ্ধা
২৪.	জনাব আবদুল মজিদ খান পিতা- বরাণ খান	গ্রাম-হবিনগর পোঃ-সায়েস্তাবাদ থানা-বরিশাল সদর	৩০ "	শ্রমিক

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বর্বর পাকবাহিনীর কর্তৃক চরবাড়ীয়া ইউনিয়নে ক্ষতিগ্রস্থ (বাসগৃহ আগুনে পুড়া) পরিবারের তালিকা

ক্র: নং	ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার প্রধানের নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা	বয়স	পেশা
১.	জনাব সৈজদ্দীন হাওলাদার পিতা-সফিজদ্দীন হাওলাদার	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া	৪৮ বছর	চাকরি
২.	মিসেস আছিয়া খাতুন স্বামী-জিন্নাত আলী হাং	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া	৫০ "	গৃহিনী

ক্র: নং	ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার প্রধানের নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা	বয়স	পেশা
৩.	জনাব নুর মোহম্মদ পিতা- আয়জদ্দিন খান	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৬৫ বছর	হালুটি
৪.	জনাব এসাহাক হাওলাদার	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	২৫"	শ্রমিক
৫.	জনাব আঃ ছত্তার রাড়ী পিতা- আঃ আজিজ রাড়ী	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	২৫ "	শ্রমিক
৬.	জনাব আব্দুছ সালাম পিতা- আঃ আজিজ	গ্রাম-উলালঘুনী পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	২২ "	চাকরি
৭.	জনাব সিরাজুল হক হাং পিতা-বাছের উদ্দিন হাং	গ্রাম-উলালঘুনী পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৫৫ "	চাকরি
৮.	জনাব সৈয়দ আশ্রাব আলী পিতা- এরশাদ আলী	গ্রাম-রাড়ীমহল পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৪০ "	চাকরি
৯.	জনাব আঃ বারেক খান পিতা- আলী আজিম খান	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৪৫ "	শ্রমিক
১০.	জনাব জয়নাল আবেদীন হাওলাদার	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৫০বছর	কৃষি
১১.	মোসাঃ আলমোননেছা স্বামী- রহমান আলী মীর	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৭০ "	বৃদ্ধ

ক্র: নং	ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার প্রধানের নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা	বয়স	পেশা
১২.	জনাব খোরশেদ মীর পিতা- আদম আলী মীর	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া	৫৫ বছর	শ্রমিক
১৩.	জনাব এরশেদ আলী মীর পিতা- সৈয়দ রহম আলী	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া	৪৫ "	শ্রমিক
১৪.	জনাব ওয়াহেদ মীর পিতা- সৈয়দ রহম আলী	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া	৪০ "	শ্রমিক
১৫.	জনাব চান্দে আলী মীর সৈয়দ আদম আলী	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া	৪৫ "	শ্রমিক
১৬.	জনাব সৈয়দ আর্শেদ আলী পিতা- সৈয়দ আদম আলী	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া	৫০ "	কৃষি
১৭.	জনাব মোবারক চাপরাশী পিতা- গগন মিয়া	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া	৬০ "	শ্রমিক
১৮.	জনাব মোঃ ফজর আলী হাং পিতা- কুশাই হাং	গ্রাম-রাড়ীমহল পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৭৫ "	কৃষি
১৯.	জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন পিতা- রেকাত আলী হাং	গ্রাম-রাড়ীমহল পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	২৫ "	কৃষি
২০.	জনাব ওয়াজেদ আলী ফরাজী পিতা- আলিমদ্দিন ফরাজী	গ্রাম-রাড়ীমহল পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৭৪ বছর	কৃষি
২১.	জনাব মোঃ আয়নাল শরীফ পিতা- জেন্নাত শরীফ	গ্রাম-সাপানিয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া	৩৫ "	শ্রমিক
২২.	জনাব মেনাজ উদ্দিন ফরাজী পিতা- সৈজদ্দিন ফরাজী	গ্রাম-সাপানিয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া	৩৫ "	কৃষি
২৩.	জনাব আব্দুর রহমান মোল্লা পিতা-ইঙ্গুল উদ্দিন মোল্লা	গ্রাম-সাপানিয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৬০ "	কৃষি

ক্র: নং	ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার প্রধানের নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা	বয়স	পেশা
২৪.	জনাব আইনউদ্দিন ফকির পিতা-নঈম উদ্দিন ফকির	গ্রাম-সাপানিয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৬০ বছর	কৃষি
২৫.	জনাব মোহন ফকির পিতা- নছরউদ্দিন ফকির	গ্রাম-সাপানিয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৪০ "	শ্রমিক
২৬.	জনাব গগন ফকির পিতা-হামেজ ফকির	গ্রাম-সাপানিয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৫০ "	কৃষি
২৭.	জনাব আদম আলী ফকির পিতা-মোহরউদ্দিন ফকির	গ্রাম-সাপানিয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৩৫ "	শ্রমিক
২৮.	জনাব মহিউদ্দিন আকন পিতা- নঈমউদ্দিন আকন	গ্রাম-সাপানিয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৪৫ "	কৃষি
২৯.	জনাব মোঃ জালালউদ্দিন হাং পিতা-আদম আলী হাং	গ্রাম-সাপানিয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	২৫ "	কৃষি
৩০.	জনাব মতিয়র রহমান আকন পিতা-সফিজউদ্দিন আকন	গ্রাম-সাপানিয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া	২০বছর	কৃষি
৩১.	জনাব আঃ মান্নান আকন পিতা-ইব্রাহিম আকন	গ্রাম-সাপানিয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া	২৫ "	চাকরি
৩২.	জনাব আব্দুস সাত্তার আকন পিতা- ইব্রাহিম আকন	গ্রাম-সাপানিয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া	৪৫ "	কৃষি

ক্র: নং	ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার প্রধানের নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা	বয়স	পেশা
৩৩.	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আকন পিতা-আবছর উদ্দিন আকন	গ্রাম-সাপানিয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	১০ বছর	ছাত্র
৩৪.	জনাব মোঃ আফতার উদ্দিন আকন পিতা- আছর উদ্দিন আকন	গ্রাম-সাপানিয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৫০ "	কৃষি
৩৫.	জনাব মোবারক আলী আকন পিতা-আফতার উদ্দিন আকন	গ্রাম-সাপানিয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৩০ "	কৃষি
৩৬.	জনাব কাশেম তালুকদার পিতা- আঃ আজিজ তালুকদার	গ্রাম-সাপানিয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৪০ "	কৃষি
৩৭.	জনাব আঃ ওহাব তালুকদার পিতা- আঃ আজিজ তালুকদার	গ্রাম-সাপানিয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৩০ "	কৃষি
৩৮.	জনাব আঃ আজিজ তালুকদার পিতা-আহম্মদজান তালুকদার	গ্রাম-সাপানিয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৬০ "	কৃষি
৩৯.	জবান আলী তালুকদার পিতা-মহাম্মদ তালুকদার	গ্রাম-সাপানিয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৫০ "	কৃষি
৪০.	জনাব আক্কেল আলী হাং পিতা-ওয়াজেদ আলী হাং	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া	৩২বছর	কৃষি
৪১.	জনাব শাহাদৎ আলী হাং	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া	৪০ "	কৃষি
৪২.	জনাব আঃ মতলেব হাং পিতা- কাজেম আলী হাং	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৩৪ "	কৃষি

ক্র: নং	ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার প্রধানের নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা	বয়স	পেশা
৪৩.	জনাব আঃ মান্নান হাং (ছেদু) পিতা- কাজেম আলী হাং	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৫০ বছর	কৃষি
৪৪.	জনাব আঃ খালেক হাং পিতা-কাজেম আলী হাং	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া	২৫ "	কৃষি
৪৫	জনাব আলি আজিম খান পিতা-ছলামত খান	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৫৫ "	কৃষি
৪৬.	জনাব ফয়জর আলী (গেদা) পিতা-মেহের আলী	গ্রাম-লামচরী পোঃ-চরবাড়ীয়া	৫৫ "	কৃষি
৪৭.	জনাব নজর আলী চাপরাশী	গ্রাম-লামচরী পোঃ-চরবাড়ীয়া	৩৫ "	কৃষি
৪৮.	জনাব আঃ মান্নান হাং পিতা-কদম আলী হাং	গ্রাম-লামচরী পোঃ-চরবাড়ীয়া	২০ "	কৃষি
৪৯.	জনাব আঃ মজিদ হাং পিতা- কদম আলী হাং	গ্রাম-লামচরী পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৩০ "	কৃষি
৫০.	জনাব সফিজ উদ্দিন সরদার পিতা- মমিন আলী সরদার	গ্রাম-লামচরী পোঃ-চরবাড়ীয়া	৬০বছর	কৃষি
৫১.	জনাব হাশেম সরদার পিতা- আরজ আলী সরদার	গ্রাম-লামচরী পোঃ-চরবাড়ীয়া	৩৫ "	কৃষি
৫২.	জনাব আমজাদ আলী সিকদার পিতা- জবেদ আলী সিকদার	গ্রাম-লামচরী পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৫০ "	কৃষি
৫৩.	মোসাঃ ফুলমোন বিবি স্বামী-স্বরুপ আরী খান	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ- চরবাড়ীয়া	৩৫ "	গৃহিণী
৫৪.	জনাব আঃ রকমত আলী পিতা-আঃ জব্বার হাং	গ্রাম- পুরানপাড়া পোঃ- চরবাড়ীয়া	৪০ "	কৃষি

ক্র: নং	ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার প্রধানের নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা	বয়স	পেশা
৫৫.	জনাব আঃ রব হাওলাদার পিতা-লালু হাং	গ্রাম- পুরানপাড়া পোঃ- চরবাড়ীয়া	৪০	কৃষি
৫৬.	জনাব আঃ হক হাওলাদার পিতা- করিম হাওলাদার	গ্রাম- পুরানপাড়া পোঃ- চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৩৬	কৃষি
৫৭.	জনাব আঃ মজিদ ফরাজী পিতা- হাকিমউদ্দিন ফরাজী	গ্রাম- মতাসার পোঃ-চরবাড়ীয়া	৪৫ "	শ্রমিক
৫৮.	জনাব মোঃ কাদের আকন পিতা-মৃত নুর মহম্মদ আকন	গ্রাম-সাপানিয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া	৩০ "	কৃষি
৫৯.	জনাব কাঞ্চন আলী ফকির পিতা-আক্রাম আলী ফকির	গ্রাম- মতাসর পোঃ-চরবাড়ীয়া	৩৫ "	চাকরি
৬০.	জনাব জয়নাল ফকির পিতা-মৃত কেরামত আলী ফকির	গ্রাম-মতাসর পোঃ-চরবাড়ীয়া থানা-বরিশাল সদর	৪০বছর	ব্যবসা
৬১.	জনাব শহীদ জালাল উদ্দিন পিতা-মৃত ফয়জদ্দিন হাং	গ্রাম- চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া	৫৪ "	চাকরি
৬২.	জনাব জয়নাল আবেদীন হাং পিতা- মৃত নাদের আলী হাং	গ্রাম-চরবাড়ীয়া পোঃ-চরবাড়ীয়া	৫৮ "	কৃষি
৬৩.	জনাব আঃ গণি পিতা- ফয়জদ্দিন	গ্রাম-চরআবদানী পোঃ-চরাবড়ীয়া	৪০ "	ব্যবসা
৬৪.	জনাব আবদুল ওয়াজেদ আলী হাং পিতা-রহমদ্দিন হাং	গ্রাম-চরআবদানী পোঃ- চরাবড়ীয়া থানা- বরিশাল সদর	৫০ "	ব্যবসা
৬৫.	জনাব আবদুল বারেক হাং পিতা- চেরাগ আলী হাং	গ্রাম- রাড়ীমহল পোঃ- চরাবড়ীয়া থানা- বরিশাল সদর	২৫ "	শ্রমিক
৬৬	জনাব জয়নাল আবেদীন পিতা- সৈয়দ আলী রাজ	গ্রাম- রাড়ীমহল পোঃ- চরাবড়ীয়া	১৮ "	শ্রমিক

নবম সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা

নবম সেক্টর কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা
মেজর এম.এ. জলিল

বরিশাল জেলার উজিরপুর থানায় ১৯৪২ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারী বীর মুক্তিযোদ্ধা, নবম সেক্টর কমান্ডার মেজর এম,এ, জলিল জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম আলী মিয়া এবং মাতার নাম রাবেয়া খাতুন।

মেজর এম,এ, জলিল ১৯৬০ সনে মেট্রিক পাশ করে ক্যাডেট হিসেবে তৎকালীন সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সনে কমিশন প্রাপ্ত হন, ১৯৭০ সনে তিনি মেজর পদে পদোন্নতি লাভ করেন। সেনাবাহিনীতে থাকাকালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেন ।

উনিশ শ' একাত্তর সনে ২৫শে মার্চের রাতে বর্ব্বর পাকবাহিনী ঢাকায় গণহত্যা শুরু করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৫শে মার্চ রাতে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা ঘোষণার তারবার্তা ২৬শে মার্চ সকালেই বরিশাল এসে পৌঁছে। মেজর এম,এ, জলিল এ সময় ছুটিতে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে ছিলেন। ঐদিন গ্রামের বাড়ী থেকে মেজর জলিল বরিশাল শহরে চলে আসলে তাঁকে

সংগ্রাম পরিষদের প্রতিরক্ষা প্রধানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বরিশাল ও পটুয়াখালীর সর্বস্তরের জনগণ নিয়ে সর্বত্র সামরিক প্রশিক্ষণ ও পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। তাঁর নেতৃত্বে ২৫ শে এপ্রিল পর্যন্ত বরিশাল মুক্ত অঞ্চল ছিলো।

১৭ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগরে শপথ বাক্য পাঠ করেন। ঐ দিন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার মেজর জলিলকে ৯ নম্বর সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। দায়িত্ব পেয়ে তিনি অস্ত্র সংগ্রহের জন্য বরিশাল ত্যাগ করেন। সাতক্ষীরা সীমান্ত এলাকার হাসনাবাদের টাকিতে নবম সেক্টরের হেড কোয়াটার ছিলো। তিনি বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা, সাতক্ষীরা ও ফরিদপুর জেলা অংশে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত ও গেরিলা বাহিনী গঠন করেন। অসমসাহসিকতা, সুষ্ঠু পরিচালনা ও দৃঢ় মনোবল তাঁর বাহিনীকে শক্তিশালী করেছে। ১১টি সেক্টরের মধ্যে নবম সেক্টরের কমান্ডার মেজর এম,এ, জলিলের কঠোর পরিশ্রম, মেধা, রণকৌশলের প্রশংসা করেছেন সকলে। তাঁর অসমসাহসিকতা ও সম্মুখযুদ্ধের বিরত্বের কাহিনী বিবিসিসহ বিভিন্ন দেশে প্রচার হয়।

১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার সোহরাওয়াদী উদ্যানে মিত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর নিকট পাকিস্তান সরকার ও সেনাবহিনীর পক্ষে লেঃ জেনারেল এ, এ, কে, নিয়াজী আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। ১৭ই ডিসেম্বর খুলনা সার্কিট হাউজ ময়দানে নবম সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল ও মিত্রবাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেনারেল দলবীর সিং-এর নিকট পাকবাহিনীর অধিনায়ক হায়াত মাহমুদ খান আট হাজার সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। বহু মুক্তিযোদ্ধাসহ ১৮ই ডিসেম্বর সেক্টর কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর এম,এ, জলিল খুলনা হতে লঞ্চযোগে বরিশাল পৌঁছে। বরিশালে পৌঁছার পর তাঁদেরকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানান হয়।

১৯৭১ সনের ৩১শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার যশোরে মেজর এম,এ, জলিলকে গ্রেফতার করেণ এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আটক রাখেন। ১৯৭২ সনের ৭ই জুলাই তিনি মুক্তি পান। পরবর্তীতে তিনি সেনাবহিনীর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তিনি প্রথম রাজনৈতিক দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) প্রতিষ্ঠা করেন এবং পার্টির সভাপতির নির্বাচিত হন। তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে একবার তিনি প্রার্থী ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক হিসেবেও পরিচিত। ১৯৮৯ সনের ১৯শে নভেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না............রাজেউন)।

৯নং সেক্টরের অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধার সাথে সেক্টর কমান্ডার মেজর এম, এ, জলিলও বীর মুক্তিযোদ্ধা পদক প্রাপ্ত থেকে বঞ্চিত রয়েছেন।

বর্তমান থানা কমান্ডার

বরিশাল জেলার মুক্তিযোদ্ধা সংসদ-এর কোতয়ালী থানা কমান্ডার মোকলেছুর রহমান ২৬সে অক্টোবর ১৯৫৫ সালে চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের উলালঘুনী (মহাবাজ) জন্ম গ্রহণ করেন। পেশায় একজন ব্যবসায়ী। ১৯৭১ সালে এপ্রিল মাসে মহাবাজ মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন মেহেদীর নেতৃত্বে অস্ত্র চালনা প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। পরে ভারত গমন করে বিহারের চাকুলিয়া ক্যাম্পে আরো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে ৯ নম্বর সেক্টর-এর সাব-সেক্টর কমান্ডার মাহফুজুল আলম বেগ-এর অধীনে যোগদান করেন। তিনি সাতক্ষীরা জেলার বসন্তপুর, পাইকগাছা, দেবহাটা, কালিগঞ্জসহ বিভিন্ন এলাকায় পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ৮ই ডিসেম্বর বরিশাল মুক্ত হলে ১০ই ডিসেম্বর বরিশাল শহরে চলে আসেন এবং ক্যাপ্টেন মাহফুজুল আলম বেগ-এর সাথে ওয়াপদা কলোনিতে রাজাকারদের আত্মসমর্পন করার দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ১৯৯৫ সালে জেলা প্রশাসক, ররিশাল-এর নিকট হ'তে প্রশংসাপত্র লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি, এস, সি মিলয়নায়তনে ১৩ই ডিসেম্বর/৯৮ নবম সেক্টরের ২৭ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে 'সম্মাননা' পদক প্রদান করা হয়, মোখলেছুর রহমান তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি দীর্ঘদিন যাবত মহাবাজ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উলালঘুনি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। বরিশাল পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের নির্বাচিত সভাপতি। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট-এর আজীবন সদস্য। ব্যক্তিজীবনে বিবাহিত এবং ১ ছেলে ও ২ কন্যা সন্তানের পিতা। তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় ইউনিয়নের বেশ কিছু তরুণ বিভিন্ন পেশায় চাকরি লাভ করেছে। বর্তমানে মহাবাজ নিজ বাড়ী বসবাস করছেন।

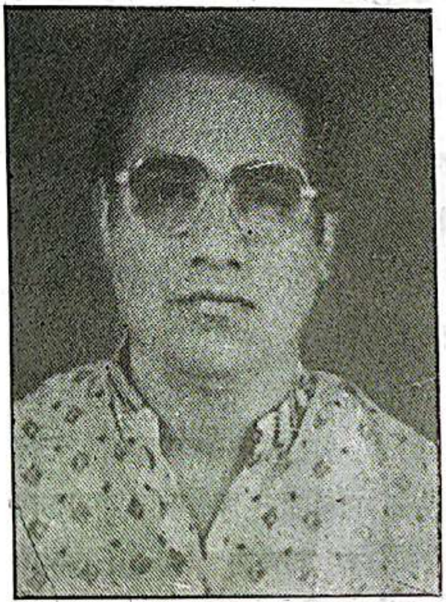
মোকলেছুর রহমান

একজন মুক্তিযোদ্ধা

আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসী অবদানের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা জাতীয় বীর এবং জাতি তাঁদের স্মরণে রাখবে। আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করে যাঁরা দেশবাসীকে স্বাধীন নাগরিক হবার সম্মান দিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমরা চিরঋণী। এমনি একজন মুক্তিযোদ্ধার নাম আবুল কাসেম সিদ্দিকী। পিতার নাম মোঃ ওয়াজেদ আলী হাওলাদার। গ্রাম-উত্তর লামচরী। ৩১শে মার্চ ১৯৫৭ সালে তাঁর জন্ম। ২৫শে এপ্রিল চরবাড়ীয়া বর্বর পাকবাহিনীর হত্যাকান্ড ও ধবংসলীলা দেখে নিজকে আর স্থির রাখতে পারে নি। তাই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাবুগঞ্জের কাদের মাস্টারের সাথে ভারত চলে যান অস্ত্রের প্রশিক্ষণ গ্রহণের নিমিত্তে। বনগাঁ দিয়ে চব্বিশ পরগানার আমলানি ক্যাম্পে গিয়ে প্রথম উঠেন। তারপর কুচবিহারে গিয়ে অস্ত্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে ছুটে এসে ৯ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধে যোগদান করেন। সাথে ছিলেন নিজ বাড়ীর সহপাটী মোঃ শাহজাহান গাজী। তিনি সাতক্ষীরা ও খুলনায় সম্মুখযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হবার পর বিজয় বেশে বাড়ীতে চলে আসেন। মনোনিবেশ করলেন পড়াশুনায়। এস.এস.সি, এইচ, এস, সি এবং বি, এ পাস করলেন কৃতিত্বের সাথে। এরপর বরিশাল ডিজেল পাওয়ার স্টেশনের জনাব জয়নাল ফোরম্যানের জ্যেষ্ঠ কন্যা বকুল বেগমকে জীবন সাথী হিসাবে গ্রহণ করেন।

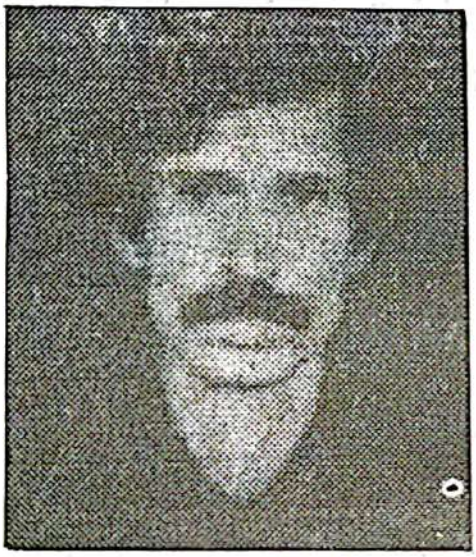

মরহুম আবুল কাশেম সিদ্দিকী

বরিশাল পৌর সভার কার্যসহকারী হিসেবে ২-৯-৮০ ইং তারিখ কর্মজীবন শুরু করেন। ৭-৯-৮৫ সালে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আদেশে মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় ঐ একই পদে আত্মীকরণ স্বাপেক্ষে বদলি করায় মেহিন্দিগঞ্জ উপজেলায় যোগদান করে কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টির সাথে চাকরি করতে থাকেন। ইতোমধ্যে জমজ ২টি সন্তানসহ ৪টি ছেলে সন্তানের জনক হন। জামাল হোসেন খোকা (২০), কামাল হোসেন বাদল (২০), মঈনুল ইসলাম (১৩) এবং রিয়াজুল ইসলাম (১১)।

উত্তর লামচরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর যথেষ্ঠ অবদান আছে এবং ১ জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন বরিশাল জেলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সহ-সভাপতি ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে জড়িত ছিলেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা, সদালাপী, বন্ধুসুলভ সুন্দর মানুষটি ১৯৮৯ সালের ৪ঠা মে বৃহস্পতিবার মাত্র ৩২ বছর বয়সে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোগমন করেন (ইন্না.........রাজেউন)। রেখে গেলেন বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও ৪টি শিশু সন্তান, আত্মীয়স্বজনসহ অসংখ্য বন্ধু। চাকরিকাল মাত্র ৮ বছর হওয়ায় সরকারীভাবে তেমন কোন সাহায্য পাওয়া সম্ভব হয় নি। ৪টি শিশু সন্তানকে নিয়ে কঠিন জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে দুর্বিসহ জীবনযাপন করে আসছেন মিসেস বকুল বেগম। ৪টি ছেলে বর্তমানে কলেজ ও স্কুলে পড়াশুনা করছে। পড়াশুনার খরচ, সংসার পরিচালনা নিয়ে বহু কষ্টে জীবন কাটাচ্ছেন একজন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী।

যুদ্ধাহত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর ইতিহাস, এ যুদ্ধে ৩০ লাখ লোকের জীবনদান অগণিত নারীর লাঞ্ছনা, বীরত্বপুর্ণ সংগ্রাম, মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মহুতি, যুদ্ধাহত করুণ কাহিনী সবই আমাদের ইতিহাসের গৌরবজনক অধ্যায়ের অন্তর্ভূক্ত। সেদিন যাঁরা অস্ত্রহাতে প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই বর্বর পাকবাহিনী নর-পশুদের হাতে ধরা পড়ে নৃশংসভাবে জীবন দান করেছেন। আবার কেউ ধরা পরে নৃশংস অত্যাচারের পরও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আজও ধুঁকে ধুঁকে জীবনযুদ্ধে বেঁচে আছেন। চরবাড়ীয়ার কৃতি সন্তান '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা বর্তমানে বরিশাল জেলা ডেপুটি কমান্ডার এ, এম, জি, কবীর বুলু-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ সালের ৩১ শে মার্চ পুরানপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতার নাম মোঃ আবুল কাশেম মুন্সী। পিতা পেশায় একজন দলিল লেখক। সমাজসেবক হিসেবেও তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য।

বুলু ১৯৬৭ সালে শ্রী শ্রী চৈতন্য গোবিন্দমোহন বিদ্যালয় হতে এস, এস, সি, ১৯৬৭ সালে বি, এম, কলেজ হতে এইচ, এস, সি, ১৯৭২ সালে বি.এ. এবং ১৯৭৫ সালে এম, পাস করেন। বি, এম, কলেজে ইউ, ও, টি, সি'র সাজেন্ট ছিলেন। ১৯৭৬ সালে সারা বাংলাদেশের ক্যাডেট এডজুটেন্ট নির্বাচিত হন। যেমন খুশী সাজো, ভার উত্তোলন, সাঁতার, দৌড় এবং ব্যাটমিন্টনে কলেজের একজন কৃতিত্ব অর্জনকারী খেলোয়াড় ছিলেন। কলেজে একবার কমনরুমের সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। জি, এস,- এর জন্য একবার কম্পিট

করে ৭ ভোটে পরাজিত হন। '৬৯-এর গণ-আন্দোলনে বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বুলু ১৯৭১ সালে কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং পাক-বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যে নির্জাতন ভোগ করেছেন সে কাহিনী যখন বর্ণনা করেন, সে এক বেদনাদায়ক করুণ কাহিনী। বর্ণনার আবেগে মাঝে মাঝে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। তখন সম্মুখে কোন দর্শক থাকলে সেও তাঁর চোখের পানি সংবরণ করতে পারে না। '৭১-এর সেই নির্মম অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত হয়েও আজো তাঁর যৌবনতৃপ্ত দেহটির ঋজুতা দর্শক মাত্রের দৃষ্টি আর্কষণ করে।

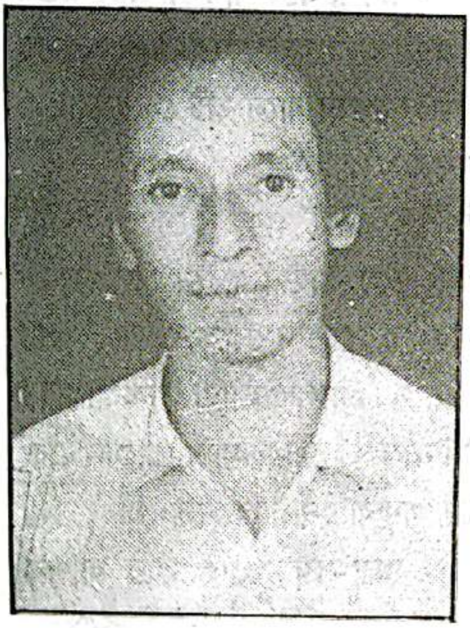

এ, এম, জি, কবীর বুলু

'৭১-এর যুদ্ধের অযুত সংগ্রামী কত জনের কাহিনী অন্তরঙ্গভাবে আমরা জানি। সে কাহিনী সংগ্রহের তেমন জাতীয় প্রচেষ্টা কোথায় ? অথচ '৭১-এর সেই কাহিনীতেই আমাদের জীবন। তার বিবরণেই আমাদের মৃত্যু। এ সত্য তর্কের কোন অবকাশ নেই। কোন বিতর্ক হতে পারে না। '৭১-এর মার্চের পরে বরিশালে পাক হানাদার বাহিনীর মোকাবেলার এক পর্যায়ে গ্রেপ্তার হয়ে যাবার এবং তাৎ পরবর্তীতে তাঁর উপর হানাদার বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলোঃ-

২৫শে মার্চ '৭১ ঢাকায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অতর্কিতে নিরীহ বাঙালীদের উপর আক্রমণ করে গণহত্যা শুরু করে। এ সংবাদ বরিশাল আসার সাথে সাথে নুরুল ইসলাম মঞ্জু ও মেজর জলিল-এর উদ্যেগে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়। তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রথমেই বি, এম, কলেজের ইউ, ও, টি, সি'র সার্জেন্ট বুলু মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেন। তাঁর চার্জে ইউ, ও, টি, সি'র কিছু অস্ত্র ছিলো। বি, এম, কলেজের স্ট্রাং রুমের তালা শাবল দিয়ে না ভাঙ্গতে পারায় ভেন্টিলেটরের গ্লাস ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়। অস্ত্রগুলো দিয়ে বেল্‌স পার্কে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ১৭ই এপ্রিল বরিশালে পাকিস্তানী ফাইটার বেল্‌স পার্কে ব্রাশ ফায়ার ও বোম্বিং করে। বেল্‌স পার্কে ব্রাশ ফায়ারে ১ জন (আবদুল গণি) মৃত্যুবরণ করে এরই মধ্য থেকে কোন রকম জীবন নিয়ে বেঁচে আসেন বুলু। বাসায় এসে মা, বাবা ও আত্মীয়-স্বজনদের নিকট হতে বিদায় নিয়ে কাশিপুর মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং

ক্যাম্পে অবস্থান করেন। ওখানে তাঁর কাছাকাছি ছিলেন ক্যাপ্টেন বেগ এবং তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী।

২৫শে এপ্রিল পাকিস্তানী স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী সংঘবদ্ধভাবে বরিশাল আক্রমণ করে। চরবাড়ীয়ায় ব্যাপক হত্যাকান্ড চালায়, শ' শ' ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। তখন কাশিপুর ছেড়ে মাধবপাশায় জমিদার বাড়ীতে এসে দু'দিন থাকেন। ওখান থেকে বানরীপাড়া এবং বানরীপাড়া থেকে আটঘর-কুড়িয়ানা। আটঘর-কুড়িয়ানা অবস্থানের পর বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগের চেষ্টা করেন।

বানরীপাড়া কিছু পাকিস্তানী আর্মি এসে চলে গেছে এবং বানরীপাড়া থানা থেকে তাদের ডাব খাইয়ে খাতিরও দেখানো হয়েছে। একথা শুনে তাঁদের মনে প্রতিশোধের আগুন জাগলো। তাই এক রাতে ৭ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল থানা অপারেশন করে সমস্ত অস্ত্রসহ অসংখ্য গুলী সংগ্রহ করে দলকে শক্তিশালী করা হয়। বীথি ও শোভা নামে ২টি মেয়েসহ ৩৫ জনের একটিদল আটঘর-কুড়িয়ানা একটি স্কুলে অবস্থান করতে থাকেন।

কয়েক দিন পর খবর পান ঝালকাঠির বাউকাঠিতে একটি লঞ্চে করে পাকিস্তানী আর্মি এসে গ্রামের লোকজনকে হত্যা করছে এবং একটি স্কুলে আগুন ধরিয়ে দেয়। সাথে সাথে তাঁদের দল পাকবাহিনীকে ঘেরাও করে। পাক বাহিনীর সাথে দু' থেকে আড়াই ঘন্টা গুলী বিনিময় হয়। পাকবাহিনী পিছু হটে বরিশাল চলে আসে। গোলাগুলীতে পাকবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি করতে সক্ষম হন। জুন মাসের দিকে ক্যাপ্টেন বেগ, তোফাজ্জল হোসেন এবং বুলু মিলে সিদ্ধান্ত নেন যে, হেভী কোন অস্ত্র নেই যা দিয়ে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে মোকাবেলা করা যায়। তাই তাঁদের আরো সংঘটিত হতে হবে এবং অস্ত্র-সস্ত্র সংগ্রহ করে ব্যাপক অপারেশনে অংশগ্রহণ করতে হবে।

এ সিদ্ধান্তের পর বুলু তাঁর দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে বহু বিপদজনক মুহূর্তকে অতিক্রম করে গৌরনদী দেশের বাড়ী গিয়ে পৌঁছেন। তাঁর সাথে ১ টি স্টেনগান এবং কিছু গুলী ও গ্রেনেট ছিলো। গৌরনদীর সেরাল গ্রামের জনাব আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের (সাবেক মন্ত্রী) বাড়ী ইতিমধ্যে পাকিস্তানী বাহিনী জ্বালিয়ে দেয়। অবস্থায় গ্রামবাসী মুক্তিযোদ্ধা বুলুকে গ্রাম থেকে সরে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে পারে এ আশঙ্খা করে বুলু বাবুগঞ্জ চলে আসেন। বাবুগঞ্জ থেকে চর কমিশনায় চলে আসেন। সেখান থেকে জুলাই মাসের ১৫ তারিখ নৌকাযোগে বরিশাল রওয়ানা দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের হোসনাবাদ গ্রামের আনোয়ার হোসেন। আনোয়ার বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন সৈনিক। বৃষ্টি ও বাতাস প্রতিকূলতার জন্য নৌকা এগুতে পারছিলো না। ভোর বেলায় বাটাজোর পুল অতিক্রম করার সময় পুলিশ নৌকাটি থামাতে বাধ্য করেন এবং নৌকা সার্চ করায় অস্ত্রসহ তাঁরা পুলিশের

কাছে ধরা পড়েন। পুলিশ বুলু, আনোয়ার ও মাঝিকে একটি বাসে করে গৌরনদী পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে বসে কিছু মারধর করে। তারপর পুলিশ ফাঁড়ি থেকে গৌরনদী কলেজে পাকবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যায়। গৌরনদী কলেজে দু'শ' থেকে আড়াই শ' পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ক্যাম্প ছিলো। কলেজের একটি নির্জন কক্ষে নিয়ে তিন জনের প্রতি অমানসিক অত্যাচার শুরু করে। সমস্ত শরীর মোটা পাহাড়ী বেত মেরে ফাটিয়ে দেয়। ছাঁদের কড়ার সাথে বেঁধে মাথা নিচু করে বেত মারা হয়। পায়ের তালুতে বেত মেরে ফুলিয়ে দেয়া হয়। তারপর নামিয়ে পায়ের তালু বেনওয়েট দিয়ে কেঁচে দেয়। সমস্ত পিটে বেওনেট দিয়ে ২০/২৫টি টান দিয়ে কেঁচে দেয়। আনোয়ারের গেঞ্জিতে আর্মির লেখা ছাপ ছিলো বিধায় তাঁকে বেদম প্রহর করে। মাঝি এবং আনোয়ার বেহুশ হয়ে পড়ে। বুলুর দু' কানে জোড়া থাপ্পর মারায় বাম কান ফেঁটে রক্ত বাহির হয় (বাম কানটি নষ্ট হয়ে যায়)। নৃশংস অত্যাচারের মাঝে বার বার জিজ্ঞেস করছিলো জলিল কাহা, মঞ্জু উকিল কাহা ?

এমনি অত্যাচারের মাঝে হঠাৎ নাটকীয় এক পরিবর্তনে তিন জনকে একই হ্যান্ডকাপে বেঁধে ১টি ছাউনিবিহীন ভেনে করে বরিশালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিলো। বহনকারী আর্মিরা একটি ত্রিফলের নীচে বসে এবং ওদেরকে খালি জায়গায় শুয়িয়ে রাখা হয়। পা, পিটসহ সমস্ত শরীর দিয়ে রক্ত ঝড়ছিলো। তখন গায়ে এক ফোঁটা বৃষ্টি যেন এক একটি তীঁর বিঁধছিলো। কেউ একটু মাথা উঁচু করলে বা কিছু বলার চেষ্টা করলে ভিজা রশি দিয়ে বাড়ি মারত যাতে আরো ভীষণ জ্বালাতন করে। গাড়ীটি জোরে চালাচ্ছিল, প্রচন্ড বাতাস ছিলো। যা বলতে গিয়ে বুলু বার বার বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এমনি নৃশংস অত্যাচারের মাধ্যমে তাঁদেরকে বরিশালের ওয়াপদা কলোনীতে কর্নেল আতিকের সামনে হাজির করা হলো। ১৭ তারিখে তাঁদের স্টেটমেন্ট নেয়া হয়। ঐদিন অত্যাচার শেষে রাতে আনোয়ার এবং বুলুকে পাশাপাশি মেঝেতে শুইয়ে রাখে। শেষ রাতেই আনোয়ার মারা যান (ইন্না..........রাজেউন)। এরূপ নৃশংস অত্যাচারে আমাদের মাঝ থেকে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হারিয়ে গেল। আনোয়ারের মৃত্যুদেহ ওরা নদীতে ফেলে দেয়। তিন দিন পরে বুলু ও মাঝিকে ওরা নাস্তা খেতে দেয়। ৫ দিনের দিন মাঝিকে ছেড়ে দেয়া হয়।

১৯ দিনের দিন বুলু ও আরো কয়েকজন অচেনা আসামীকে গাড়ীতে করে যশোর ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। ক্যান্টনমেন্ট থেকে বুলুকে যশোর সেন্ট্রাল জেলে পাঠান হয়। জেলে যাবার পর বুলুর দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। কিছু দিন পর আবার আস্তে-আস্তে চোখ সুস্থ হয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান।

যশোর জেলে বসে ইসলামী পুস্তক পড়াশুনা করেন এবং ধর্মের বিষয় ব্যাপক চিন্তা-ভাবনায় প্রচুর জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন। দীর্ঘদিন যশোর জেলের মধ্যে তাঁর জীবন-যাপন, অভিজ্ঞতা ও বোধের কাহিনীও অনুপ্রেরণাদায়ক।

পরম করুণাময়ের অশেষ রহমতে ২১শে অক্টোবর '৭১, ১লা রমজান যশোর জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। জেল থেকে তাঁকে ২২ টাকা প্রদান করে। যশোর থেকে খুলনা এসে জনৈক ভদ্রলোকের সহায়তায় রকেটে চড়ে বরিশাল এসে পৌঁছেন।

৪ দিন বরিশালে নিজ বাড়ীতে অবস্থান করার পর আবার কিছু ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছেন বুঝতে পেরে পুনরায় অসুস্থ শরীর নিয়ে যুদ্ধের জন্য শহর ছেড়ে বাহির হন। প্রথমে কর্ণকাঠি, সেখান থেকে কাউখালী হয়ে সেখেরহাট ক্যাপ্টেন বেগের শ্বশুরবাড়ী যান। ওখানে ১ রাত থাকার পর পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় পুনরায় চর কমিশনায় চলে আসেন। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত পাতারহাট, উলানিয়া এলাকায় অবস্থান করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর বরিশাল শহরে চলে এসে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করেন।

যুদ্ধাহত এ বীর মুক্তিযোদ্ধা হিজলা থানার বড় জালিয়া গ্রামে আবুল হাশেম সিকদারের নাত্নী মেহেরুন্নেছা লাইলীকে ১৯৭৮ সালে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেন। দু'ছেলে ও ১ মেয়ের পিতা। স্বাধীনতার ১৬ বৎসর পর ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১,৪৪০/- টাকা প্রতি মাসে আহত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সরকারী ভাতা পাচ্ছেন। বরিশাল মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে ঘিরে বর্তমান জীবন কাটিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে কালিবাড়ী রোডস্থ শীতলাখোলা পৈত্রিক বাসভবনে পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করছেন।

নবম সেক্টরে বরিশালবাসী

সেক্টর কমান্ডার মেজর এম, এ, জলিল, সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন নূরুল হুদা হিরু, মেজর শাজাহান ওমর, মেজর মেহেদী আল ইমাম, মেজর জিয়াউদ্দিন আহমেদ, এডজুট্যান্ট ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক, প্রশিক্ষক ক্যাপ্টেন সুলতান আহমেদ, ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ খুরশীদ, মুঃ বাদশা মিয়া, কমান্ডার লেঃ নূরুন্নবী, লেঃ সৈয়দ কামাল উদ্দিন ফিরু, লেঃ শচীন কর্মকার, লেঃ মোহাম্মদ আলী, লেঃ শাহ আলম ও লেঃ মইন। সার্বিক দায়িত্বে ওবায়দুর রহমান মোস্তফা, গণসংযোগ কর্মকর্তা আলতাপ হোসেন খান, রাজনৈতিক প্রশিক্ষক নুরুল ইসলাম মঞ্জু, আ, স, ম, ফিরোজ, চিকিৎসক ডাঃ শাহজাহান ও ডাঃ হাসান।

নৌ-কমান্ডার সৈয়দ আবুল বাসার, সুইসাইডাল স্কোয়াড কমান্ডার রেজাই সাত্তার ফারুক।

বৃহত্তর বরিশাল জেলা নিয়ে বরিশাল সাব-সেক্টর গঠন করা হয়েছিল। সাব-সেক্টরে কয়েকজন বেইস কমান্ডার নিয়োগ করা হয় এবং বেইস কমান্ডারের সাথে কয়েকজন কমান্ডার দায়িত্ব পালন করেছেন। যাঁরা বেইস কমান্ডার ও কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা হলেন সর্বজনাব আব্দুল মন্নান, আঃ ওহাব খান, অধ্যাপক আবদুস ছত্তার, কুদ্দুস মোল্লা, আঃ মজিদ খান, কুতুব উদ্দিন, আনোয়ার হোসেন, মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন, মুহম্মদ আঃ অদুদ সরদার, হাবিবুর রহমান, নিজাম উদ্দিন, বেনুলাল দাসগুপ্ত, সুলতান মাষ্টার, সেকান্দার আলী, সুবেদার এম.এ. জলিল, আবুল কালাম আজাদ, আলতাপ হোসেন, আব্দুল মজিদ, আঃ আজিজ, জাহাঙ্গীর বাহাদুর, হাবিবুর রহমান, সুবেদার আঃ কাদির, আঃ আজিজ, কাজী আফতাব উদ্দিন, আলী আকবর, সিদ্দিকুর রহমান, মুহাম্মদ ইব্রাহিম, আঃ হাই পান্না, নূরুল ইসলাম, মোকতার আলী, শাজাহান, আরিফ হোসেন আরো অনেকে।

মুক্তিযুদ্ধকে শক্তিশালী করার জন্য সম্পূর্ণ দলীয়ভাবে "বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স" (বি এল এফ) গড়ে তোলা হয়েছিলো। বাংলাদেশকে ৪ টি সেক্টরে বিভক্ত করে জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক (মন্ত্রী), জনাব তোফায়েল আহমেদ(মন্ত্রী), জনাব শেখ ফজলুল হক মনি (শহীদ) এবং জনাব সিরাজুল আলম খানকে দায়িত্ব প্রাদন করা হয়েছিল। প্রতিটি জেলায় 'জেলা কমান্ডার' এবং প্রতিটি থানায় 'থানা কমান্ডার' নিয়োগ করা হয়েছিল। বরিশাল জেলা কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বরিশালের কৃতি সন্তান আলহাজ্ব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ (বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ)

বরিশালে পদক প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা

ক্র: নং	নাম	ঠিকানা	খেতাব
১.	শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর	-বাবুগঞ্জ	বীরশ্রেষ্ঠ
২.	শহীদ সেপাই মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল	- দৌলতখাঁ	বীরশ্রেষ্ঠ
৩.	মেজর (অবঃ) শাহজাহান ওমর	- সারেঙ্গল	বীর উত্তম
৪.	ল্যান্স নায়েক আব্দুস সাত্তার	- বরিশাল	বীর উত্তম
৫.	সুবেদার ফজলুর রহমান	-বাকেরগঞ্জ	বীর উত্তম
৬.	মাহবুব উদ্দীন আহমেদ	- আমানতগঞ্জ	বীর বিক্রম
৭.	শহীদ আলতাপ হোসেন	- উজিরপুর	বীর বিক্রম

৮.	মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন আহমেদ	- ভোলা	বীর বিক্রম
৯.	শহীদ আতাহার মল্লিক	- চরামদ্দি	বীর বিক্রম
১১.	মেজর (অবঃ) মেহেদী আলী ইমাম	-মঠবাড়ীয়া	বীর বিক্রম
১২.	সুবেদার আব্দুল হক	- গৌরনদী	বীর বিক্রম
১২.	লেঃ কর্নেল দেলওয়ার হোসেন	- রাজাপুর	বীর প্রতীক
১৩.	লেঃঃ কামরুল ইসলাম সেলিম	- চরামদ্দি	বীর প্রতীক
১৪.	মেজর (অবঃ) ওয়ালীউল ইসলাম	- বটতলা	বীর প্রতীক
১৫.	লেঃ কর্নেল খন্দকার নজমুল হুদা	-বগুড়া রোড	বীর বিক্রম
১৬.	ফ্লাইট সার্জেন্ট রত্তন শরীফ	- বাবুগঞ্জ	বীর প্রতীক
১৭.	এ. কে. এম. হান্নান	-দূর্গাপুর,বাকেরগঞ্জ	বীর প্রতীক
১৮.	এ.কে.এম. মহিউদ্দীন মানিক	- ঝালকাঠি	বীর প্রতীক
১৯.	কুদ্দুস মোল্লা	-মুলাদী	বীর প্রতীক
২০.	আনোয়ার হোসেন	- মুলাদী	বীর প্রতীক
২১.	খোকন	-ঝালকাঠী	বীর প্রতীক
২২.	আঃ ছত্তার	-বাবুগঞ্জ	বীর প্রতীক
২৩.	রফিকুল আহসান বাদশা	- দূর্গাপাশা	বীর প্রতীক

স্বাধীনতাযুদ্ধে বীরত্বসূচক পুরস্কারপ্রাপ্ত 'বীরউত্তম' আব্দুস সাত্তার

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র ২৭ বছর পর আমরা ভুলতে বসেছি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। ভুলতে বসেছি সে-সব বীর যোদ্ধাদের যাদের বুকের রক্তে উর্বর হয়েছে এদেশের মাটি। ভুলতে বসেছি সে-সব মুক্তিপাগল যোদ্ধাদের, যাঁদের অবিস্মরণীয় অবদানে এদেশ হয়েছে শৃঙ্খলমুক্ত। আমরা কেউই তাঁদের খবর রাখি না। খবর রাখি না তাঁরা কে, কোথায় কেমন আছেন!

বীর উত্তম আবদুস সাত্তার

মহান মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে আত্মত্যাগ ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার বীর শ্রেষ্ঠ, বীর উত্তম, বীর বিক্রম ও বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করেছেন। বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবধারী কেউ বাংলা মায়ের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারে নি। আর ৬৮ জন বীরউত্তম খেতাবধারীর মধ্যেও অনেকে ইতোমধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মাত্র ৮/৯ জন এখন জীবিত আছেন। বরিশাল জেলার কোতয়ালী থানার কাশিপুর ইউনিয়নের গণপাড়া গ্রামের আব্দুস সাত্তার এঁদের মধ্যে একজন। জীবনযুদ্ধে পরাজিত বীরউত্তম আব্দুস সাত্তার। তাঁর পিতার নাম মৌঃ মোঃ রহম আলী হাওলাদার। কাশিপুর হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। সংসারে চরম অভাব অনটন লেগেই থাকত। পড়াশুনা খরচ চালানো সম্ভব নয় বিধায় একদিন এক বন্ধুর সাথে বাড়ী থেকে চলে যান ঢাকা শহরে। চাকরি নেন তেজগাঁও গ্লাস ফ্যাক্টরীতে।

পেপারে বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারেন ফায়ার সার্ভিসে লোক নিয়োগ করা হবে। ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি নেন ফায়ার ব্রিগেডে। তৎকালীন ইপিআর-এ লোক ভর্তি করা হবে শোনে পিলখানায় ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে হাজির হন। কিন্তু উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি না হওয়ায় বাদ পড়ে যান। তখন একজন পাঠান অফিসারকে অনুনয়-বিনয় করে ব্যান্ড পার্টিতে ভর্তি হন। কয়েক মাস পর মাথায় নেশাচাপে বাদ্যযন্ত্র ছেড়ে অস্ত্র হাতে নেবার। উর্ধতন

কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করায় তাঁর ইচ্ছা পুরণ হল এবং বদলি হয়ে সশস্ত্র বিভাগে যোগদান করেন ১৯৬৬ সালে। কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি মোতাবেক দীর্ঘদিন চাকরি করেন। নিজ খরচা বাদে উপার্জিত অর্থ সবই পাঠাতেন গ্রামের বাড়ী মা-বাবার কাছে। ১৯৭১ সালের প্রথম দিকে ছুটিতে আসলে বাবা-মায়ের অনুরোধে চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের মুকুন্দপট্টি নিবাসী জনাব আব্দুল ওহাব হাওলাদার-এর দ্বিতীয় কন্যা রেহানা বেগম-এর সাথে শুভ (আকদ) বিবাহ হয়। কিন্তু বউ তুলে আনা হয় নি। কিছুদিন পর বেশী করে ছুটি নিয়ে এসে বউকে তোলে আনবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। তাই নববিবাহিতা বউর সাথে দেখা পর্যন্ত হলো না তাঁর। চলে গেলেন কর্মস্থল রাজশাহীতে।

এক মাস পরেই শুরু হলো স্বাধীনতা যুদ্ধ। একাত্তরের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে শান্তাহার হয়ে সৈয়দপুর গিয়ে আর্মির ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন তিনি। ৩য় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন লেঃ কর্ণেল সাফায়াত জামিল, সহকারী কমান্ডার ছিলেন মেজর মহসিন উদ্দিন ও প্লাটুন কমান্ডারের দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। ৩য় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল ২নং সেক্টরের অধীনে । যার সেক্টর কমান্ডার ছিলেন কর্ণেল খালেদ মোশাররফ। আর্মি, বিডিআর,পুলিশ সব এক কাতারে সামিল হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

সিলেটের কোদালকাঠীতে মুক্তিযুদ্ধে প্রথম দুঃসাহসীক অভিযান চালান আব্দুস সাত্তার। অস্ত্র বোঝাই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর একটি জাহাজে মাইন চার্জ করে ধ্বংস করে দেন। জীবনের প্রথম ঘাতকদের জাহাজ ধ্বংস করে খুশিতে আত্মহারা হন আব্দুস সাত্তার। এরপর বেশ কয়েকটি সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সব কয়টিতে জয়লাভ করেন। সর্বশেষ অপারেশন চালান স্বাধীন হবার মাত্র ১৬ দিন আগে ছাতকের গোয়াইনঘাট এলাকায়। এ ঘাঁটিতে প্রায় ১ ব্যাটালিয়ান পাক আর্মি অবস্থান করত। ১ মাস আগে থেকে ঘাতকের এ ঘাঁটি আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয় এবং বিভিন্নভাবে র‍্যাকি করা হয়। পরিকল্পনা মোতাবেক রাতে শত্রু ছাউনিতে সবাই পৌঁছে যান, কিন্তু গুপ্তচরের মাধ্যমে শত্রুরা কৌশলে তাঁদের ছাউনির ভেতরে ঢোকার সুযোগ দেন । বিনা বাঁধায় ছাউনি এলাকায় প্রবেশ মাত্রই চারিদিক থেকে গর্জে উঠে শত্রুদের অস্ত্র। অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধারা লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। মাত্র কয়েক জন আত্মরক্ষা করে প্রতিপক্ষের উপর পাল্টা গুলি চালাতে সক্ষম হন। আব্দুস সাত্তারের কাছে থাকা গ্রেনেড ছুঁড়ে বেশ কয়েক জন আর্মিকে হত্যা করেন। এক পর্যায় ছাত্তারের ডান পায়ে একটি গুলী লাগে। সাথে সাথে পাশের একটি ডোবায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সহযোদ্ধাদের মৃতদেহের পাশে বসে রাইফেল দিয়ে শত্রুদের উপর আক্রমণ চালিয়ে বেশ কয়েক জনকে হত্যা

করতে সক্ষম হন। হঠাৎ পাশেই এক আহত সহযোদ্ধাকে দেখতে পেয়ে তাঁকে বাঁচানোর তাগিদে একহাতে অস্ত্র অপর হাত দিয়ে আহত মুক্তিযোদ্ধাকে কাঁধে তুলে অবশ পা টেনে টেনে শত্রু ছাউনি থেকে নিজেদের ঘাঁটিতে রওয়ানা হন। এমনি সময় ঘাতকরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ে। তলপেটে, বুকের বামপাশে ও কোমরের কাছে তিনটি গুলী গলাগলে সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। কয়েক মিনিট অচেতন থাকার পর কিছুটা চেতনা ফিরে আসলে আবার অস্ত্র হাতে নিয়ে ঘাতকের লক্ষ্য করে গুলী চালাতে থাকেন।

শরীরে বুলেটবিদ্ধ ৪টি ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝড়ায় দুর্বল হয়ে পড়েন। এ সময় অপর পাশে অবস্থানরত সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন চৌধুরী আত্মরক্ষার জন্য ইশারায় ঘাঁটিতে ফিরে যেতে বলেন। আব্দুস সাত্তার ঐ নির্দেশ পেয়েও আরও কিছু সময় অবস্থান নিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলী ছুঁড়ে শত্রু ছাউনি লক্ষ্য করে। আহত সহযোদ্ধার অবস্থার অবনতি এবং নিজের শরীরও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বুঝে সহযোদ্ধাকে কাঁধে তুলে ৪টি বুলেটবিদ্ধ অবস্থায় একহাতে অস্ত্র নিয়ে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে এসে কর্নেল সাফায়াত জামিলের সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেনও ইতিমধ্যে ঘাঁটিতে চলে আসেন। তিনি আব্দুস সাত্তারের সাহসিকতা সম্পর্কে সকল অফিসারদের নিকট বিবরণ দেন ও দ্রুত চিকিৎসার জন্য অন্য কোথাও পাঠানোর জন্য পরামর্শ দেন। তখনকার যুদ্ধকালীন অফিসিয়াল কাগজপত্রেও তাঁর বীরত্বপূর্ণ অবদানের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়। তখন তাঁকে এক বিশেষ কার্ড প্রদান করা হয়। আনোয়ার হোসেন চৌধুরী কর্তৃক দেয়া সেই কার্ডটিই তাঁর বীরত্বের একটি প্রাথমিক সার্টিফিকেট। অপারেশনে যে দুঃসাহসিক ভূমিকা রাঁখেন মুলতঃ এর স্বীকৃতিস্বরূপই তাঁর ভাগ্যে জুটেছে “বীরউত্তম” বিরল খেতাবটি।

কিছু সময় এ ঘাঁটিতেই প্রাথমিক চিকিৎসা চলে। দেহ থেকে গুলী বের করা হয়। এরপর অবস্থা খারাপ দেখে হেলিকপ্টারযোগে অন্যান্যদের সাথে পাঠিয়ে দেয়া হয় ভারতের শিলং হাসপাতালে। শিলং হাসপাতালে ৩ মাস যাবত চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠেন। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তাঁকে আর্মিতে যোগ দেবার কথা বলা হয়। তিনি আর্মির ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের চট্টগ্রাম সেনানিবাসে যোগদান করেন। চট্টগ্রামে চাকরিস্থলে যোগ দিয়ে ছুটি নিয়ে সোজা চলে আসেন গণপাড়া নিজ বাড়ীতে। বাড়িতে পৌঁছলে এলাকাবাসীর ভীড় জমে উঠে তাঁকে এক নজর দেখার জন্য। মানুষ যাতে সহজে দেখতে পায় তাই দাঁড় করানো হয়েছিল বাড়ীর উঠানে টেবিলের উপর । কারণ এলাকার সবাই জানত তিনি যুদ্ধে মারা গেছেন।

আবদুস সাত্তারের জীবনের ট্রাজিটির সময়কাল হলো মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস। রণাঙ্গণের দুঃসাহসিক ভূমিকা অপর দিকে একই সময়ে বাড়ীতে তাঁর পারিবারিক দুঃখজনক ঘটনাবলী। দীর্ঘ ন'মাস অতিবাহিত হয় যুদ্ধ করে। বাড়ীতে বাবা-মা ও অন্যান্য ভাইর চোখে ঘুম ছিলো না। একমাত্র বোন চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের উলালঘুনি নিবাসী আলম মাস্টারের স্ত্রী ভাইয়ের জন্য কেঁদে কেঁদে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। মা ছেলের জন্য চোখের অশ্রু ফেলতে ফেলতে প্রায় অন্ধ হয়ে যান।

অন্য দিকে তাঁর শ্বশুর ও শ্যালকরা ধারণা করেন আবদুস সাত্তার যুদ্ধে মারা গেছেন। তাই তারা স্ত্রী রেহানা বেগমকে অন্যত্র বিয়ে দেয়ার জন্য চেষ্টা করেন। বাবা পুত্রবধুকে নিজেদের বাড়ীতে আনতে গেলে তাঁর শ্বশুর বউকে না দিয়েই ফিরিয়ে দেন। তবে তাঁর স্ত্রী রেহানা বেগম ছিলেন স্বামীর প্রতি অগাধ আস্থাশীল। স্বামীকে ফিরে পাবার জন্য এক মাস রোজা রাখেন রেহানা বেগম। তার বিশ্বাস ছিল স্বামী বেঁচে আছেন এবং একদিন ফিরে আসবেন। তাই বাবা ও ভাইয়ের অন্যত্র বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হন নি।

আল্লাহর মহিমায় স্ত্রীর স্বপ্ন সত্যি সত্যিই বাস্তবরূপ নিল একদিন। আবদুস সাত্তার ছুটি নিয়ে বাড়ী এসেই ফিরে পান তাঁর স্ত্রীকে। তাঁকে নিয়ে আসেন নিজ ঘরে। সেই থেকে শুরু হয় সংসার জীবন। মা ও বাবার সেবার কথা চিন্তা করে তিনি কোন দিন তাঁর স্ত্রীকে চাকরি স্থলে নিয়ে থাকেন নি।

স্বাধীন দেশে চাকরিতে যোগদানের পর জ্যৈষ্ঠতার ভিত্তিতে হাবিলদার হন। বীরউত্তম পদবী পেলেও যুদ্ধের পর তাঁকে এ জন্য কোন পদোন্নতি দেয়া হয় নি। চাকরি থেকে অবসর নেয়ার আগে পারিবারিক দৈন্যতার কথা জানিয়ে এক বছর এক্সটেশনের জন্য আবেদন-নিবেদন করেছিলেন কিন্তু কর্তৃপক্ষ সাড়া দেননি। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কোন ভাতা বা সরকারী কোন সাহায্য আজ পর্যন্ত মেলে নি। চাকরি জীবনে পাকিস্তান ফেরত সেনা ও অফিসারদের নিগ্রহ সইতে হয়েছে। বীরউত্তম পদকপ্রাপ্ত জীবিত বীর যোদ্ধাদের মধ্যে একমাত্র আবদুস সাত্তারই সম্ভবতঃ সবচেয়ে দরিদ্র।

১৯৮৭ সালে অবসর গ্রহণের পর তিনি অর্থকষ্টে পড়ে পেটের দায়ে একটি চাকুরীর আশায় ছুটে গিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধকালীন তাঁর শ্রদ্ধেয় সাব-সেক্টর কমান্ডার (বর্তমানে মেজর জেনারেল) আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (বীরপ্রতীক)-এর কাছে। তিনি একটি গার্মেন্টস-এর গার্ডের চাকরি করার প্রস্তাব দেন বীরউত্তম সাত্তারকে। তাই অভিমানে চলে আসেন নিরাশ হয়ে। কেউ তাঁকে মূল্যায়ন করে নি। এ ঘটনাগুলো তাঁর মনের মধ্যে প্রচন্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করে। দেশের জন্য যুদ্ধ করে কি উপাধি পেয়েছেন যা কোন কাজে লাগে না, এটাই তাঁর প্রশ্ন।

১৯৯২ সালে সরকার তাঁকে 'বীরউত্তম' পদক প্রদান করেন। বর্তমান সরকারও তাঁকে পদক প্রদান করেছেন। কিন্তু মনের দুঃখে কাউকে কিছু বলেন নি, কোন প্রকার প্রচারে উৎসাহ বোধ করেনি। প্রাপ্ত পদকগুলো সযত্নে রেখে দিয়েছেন বাক্সবন্দী করে। পদক নিয়ে কখন বাইরে যান নি এবং প্রাপ্ত সুযোগসুবিধাও গ্রহণ করেন নি কখনো। বীরউত্তম খেতাব ছাড়াও তিনি পেয়েছেন আরও ৭টি পদক। এগুলো হলো-রণতারকা, সমরপদক, মুক্তিপদক, জয়পদক, সংবিধানপদক, নিরাপত্তাপদকও জ্যৈষ্ঠপদক।

দু'ছেলে এক মেয়ের জনক তিনি। মেয়েটির বিবাহ দিয়েছেন ইতোমধ্যেই। দু' ছেলে, স্ত্রী ও বৃদ্ধ মাতাকে নিয়ে সংসার। সংসার চালাতে পারছেন না। বৃদ্ধ মা, স্ত্রী ও সন্তানদের প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় পর্যন্ত দিতে পারেন না। সেনাবাহিনী থেকে পেনশনের ৮ শ' টাকা দিয়ে সংসার চালাচ্ছেন কোনভাবে। দু'টো গাভী পালন করেন তিনি। গাভীর দুধ বিক্রী করে সংসারের টুকিটাকি খরচ চালাচ্ছেন। এত দুঃখ কষ্টে থেকেও কারোর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই তাঁর। বাংলা মায়ের স্বাধীনতা আনার জন্য তাঁর অবদানেই তিনি গর্বিত, এতেই খুশী।

প্রতি বছর সশস্ত্র বাহিনী দিবসে বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক হিসেবে তাঁর ডাক পড়ে সেনানিবাসে। সে অনুষ্ঠানে নিয়মিত যোগদান করেন। প্রচারনাবিমুখ এ ব্যক্তির বীরত্বগাঁথা বরিশালবাসীও এতদিন জানতো না। জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদেও তাঁর কোন নাম, ঠিকানা ছিলো না। বরিশাল বিভাগে শুধু 'বীরউত্তম' খেতাব প্রাপ্ত মেজর শাহজাহান ওমরের নাম জানতেন সবাই। সাত্তারের প্রতিবেশীরাও তাঁর খেতাব প্রাপ্তির কথা জানে না। তারা তাঁকে চেনেন হাবিলদার সাত্তার হিসেবে। দেশ মাতৃকার এই গর্বিত পুরুষ নীরবে নিভৃত কাটিয়ে দিয়েছেন এতটি বছর। বঞ্চিত হয়েছেন যাবতীয় স্বীকৃত প্রাপ্ত থেকে।

. ১৯৯৭ সালের শেষ দিকে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল তাঁকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব দিলেন বরিশাল জেলা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিটকে। বহু চেষ্টা করে মুক্তিযোদ্ধা এনায়েত হোসেন চৌধুরী তাঁর ঠিকানা পেলেন এবং নিয়ে এলেন বরিশাল শহরে। অভাব, ক্ষোভ ও দুঃখে আবদুস সাত্তার নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারলেন না। এতদিনে বরিশালবাসী জানল তাঁর বীরত্বগাঁথা এবং মানবেতর জীবন যাপনের করুণ কাহিনী। ২৭ বছরের মাথায় খুঁজে পেলেন বরিশালের এ কৃতি সন্তানকে। এ বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বরিশাল জেলা প্রশাসন থেকে সংবর্ধনা প্রদান করেন ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৯৭ । আব্দুস সাত্তার এক গর্বিত সন্তান। একজন বীর যোদ্ধা। যার রক্তে ভেজা ভূ-খন্ডই আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সমাজ ও সরকারের দায়িত্ব এ ধরণের বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পুনর্বাসনের। কে নেবে এ দায়িত্ব ?

স্বাধীনতাযুদ্ধে বীরত্বসূচক পুরস্কার

স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের আত্মত্যাগ ও বীরত্ব জাতির জন্য এক বিরল ও গৌরবময় দৃষ্টান্ত । মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জাগরুক রাখতে হলে এবং জাতীয় মর্যাদাবোধ সমুন্নত রাখতে হলে দেশের এই বীর সন্তানদের অবদান জাতিকে বারংবার কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করতে হবে।

সশস্ত্র সংগ্রামে প্রশংসনীয় ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ বীর শ্রষ্ঠ, বীরউত্তম, বীরবিক্রম, বীরপ্রতীক পদক প্রদান করা হয়েছে। যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাহসিকতা দেখিয়েছেন এমন পরিস্থিতিতে যেখানে নিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকি ছিলো, তাঁদের অসীম সাহসিকতা ও চরম আত্মত্যাগের কারণে শত্রুপক্ষের দ্বারা বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা প্রতিহত অথবা শত্রুপক্ষের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধন করা হয়েছে, তাঁদেরকে সর্বোচ্চ বীরত্বের পুরস্কার বীরশ্রেষ্ঠ, যাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অথবা বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও প্রশংসনীয় সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদেরকে বীর উত্তম ও বীর বিক্রম পুরস্কার দেয়া হয়েছে। যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদেরকে পুরস্কার দেয়া হয়েছে বীরপ্রতীক ।

বীরশ্রেষ্ঠ, বীরউত্তম, বীরবিক্রম এবং বীরপ্রতীক এই চার শ্রেণীতে মোট ৬৭৬টি খেতাব দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৭টি বীর শ্রেষ্ঠ, ৬৮টি বীরউত্তম, ১৭৫টি বীরবিক্রম এবং ৪২৬টি বীরপ্রতীক খেতাব রয়েছে।

বীরশ্রেষ্ঠ

বাংলাদেশ সেনাবহিনী

	র‍্যাংক (তদানীন্তন)	নাম
১.	ক্যাপ্টেন	মহীউদ্দিন জাহাংগীর ,ইঞ্জিনিয়ার (শহীদ)
২.	ল্যান্স নায়েক	মুন্সী আবদুর রব,ইবিআর (শহীদ)
৩.	সিপাহী	হামিদুর রহমান (শহীদ)
৪.	সিপাহী	মোহাম্মদ মোস্তফা (শহীদ)

বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী

	র‍্যাংক (তদানীন্তন)	নাম
৫.	ইঞ্জিনরুম আর্টিফিশিয়াল প্রথম শ্রেণী	মোঃ রুহুল আমীন (শহীদ)

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

	র‍্যাংক (তদানীন্তন)	নাম
৬.	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	মতিয়ুর রহমান (শহীদ)

প্রাক্তন ইপিআর

	র‍্যাংক (তদানীন্তন)	নাম
৭.	ল্যান্স নায়েক	নূর মোহাম্মদ (শহীদ)

বীর উত্তম

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

	র‍্যাংক (তদানীন্তন)	নাম
১.	লেঃ কর্ণেল	মোহাম্মদ আব্দুর রব (অবসরপ্রাপ্ত)
২.	মেজর	কাজী মোহাম্মদ শফিউল্লাহ
৩.	মেজর	জিয়াউর রহমান (পরবর্তীতে শহীদ)
৪.	মেজর	চিত্তরঞ্জন দত্ত
৫.	মেজর	কাজী নুরুজ্জামান (অবসরপ্রাপ্ত)
৬.	মেজর	মীর শওকত আলী
৭.	মেজর	খালেদ মোশাররফ (মরহুম)
৮.	মেজর	মোহাম্মদ আব্দুল মঞ্জুর (মরহুম)
৯.	মেজর	আবু তাহের (মরহুম)
১০.	ক্যাপ্টেন	এ.এন.এম. নুরুজ্জামান
১১.	ক্যাপ্টেন	মুহম্মদ রফিকুল ইসলাম
১২.	ক্যাপ্টেন	আব্দুস সালেক চৌধুরী (মরহুম)
১৩.	মেজর	মোহাম্মদ আমিনুল হক
১৪.		খাজা নিজামুদ্দিন (শহীদ) (এইচ.কিউ,নং-৪ সেক্টর)
১৫.	ক্যাপ্টেন	হারুন আহমেদ চৌধুরী
১৬.	মেজর	এ.টি.এম. হায়দার
১৭.	ক্যাপ্টেন	এম.এ. গাফ্ফার হালদার
১৮.	মেজর	শরীফুল হক
১৯.	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ শাহজাহান
২০.	ক্যাপ্টেন	মেহবুবুর রহমান

২১.	মেজর	মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন (অবঃ)
২২.	ক্যাপ্টেন	আফতাব কাদির (শহীদ)
২৩.	ক্যাপ্টেন	মাহবুবুর রহমান (শহীদ)
২৪.	ক্যাপ্টেন	সালাউদ্দীন মমতাজ, ২-ই বেঙ্গল (মরহুম)
২৫.	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ আজিজুর রহমান,২-ই বেঙ্গল
২৬.	লেফটেন্যান্ট	এস.এম. ইমদাদুল হক (শহীদ) ৮-ই বেঙ্গল
২৭.	সেকেন্ড লেফটেনন্যান্ট	মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন (শহীদ) ১-ই,বেঙ্গল
২৮.	সে: লেফটেন্যান্ট	আবু মইন মোহাম্মদ সামাদ (শহীদ)
২৯.	সুবেদার	আফতাব আলী
৩০.	সুবেদার	ফয়েজ আহম্মদ (শহীদ)
৩১.	নায়েক সুবেদার	বেলায়েত হোসেন (শহীদ)
৩২.	নায়েক	সুবেদার মইনুল হোসেন (শহীদ)
৩৩.	নায়েব সুবেদার	হাবিবুর রহমান ৩-ই বেঙ্গল
৩৪.	হাবিলদার	মোহাম্মদ শাহ আলম (শহীদ)
৩৫.	হাবিলদার	নুরুল আমিন
৩৬.	হাবিলদার	নাসিরউদ্দিন (শহীদ)
৩৭.	নায়েক	আবদুল মান্নান (শহীদ)
৩৮.	ল্যান্স নায়েক	আবদুল লতিফ (শহীদ)
৩৯.	ল্যান্স নায়েক	আবদুল সাত্তার
৪০.	সিপাহী	নূরুল হক (শহীদ)
৪১.	সিপাহী	মোঃ সামসুজ্জামান (শহীদ) ৮-ই বেঙ্গল
৪২.	সিপাহী	সাফিল মিয়া (শহীদ) ৯-ই বেঙ্গল
৪৩.	সুবেদার	ফজলুর রহমান (শহীদ)
৪৪.	নায়েক	সুবেদার মজিবুর রহমান (শহীদ)
৪৫.	নায়েক	শফিক উদ্দিন চৌধুরী (শহীদ)
৪৬.	সিপাহী	আবু তালেব (শহীদ)
৪৭.	সিপাহী	মো: সালেহ উদ্দিন আহমেদ
৪৮.	সিপাহী	আনোয়ার হোসেন (শহীদ)
৪৯.	সিপাহী	এরশাদ আলী (শহীদ)

বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী

	র‍্যাংক (তদানীন্তন)	নাম
৫০.	নেভাল কমান্ডো	মোজাহার উল্লাহ্
৫১.	এল.এস.	মোঃ জালাল উদ্দিন
৫২.	ই. আর. এ.	মোঃ আফজাল মিঞা
৫৩.	এম.ই. ১	মোঃ বদিউল আলম
৫৪.	এ.বি.	মোঃ সফিউল মাওলা
৫৫.	সাব-লেফটেন্যান্ট	আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী
৫৬.	-	মতিউর রহমান
৫৭.	নেভাল কমান্ডো	মোহাম্মদ শাহ আলম

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

	র‍্যাংক (তদানীন্তন)	নাম
৫৮.	গ্রুফ ক্যাপ্টেন	আব্দুল করীম খন্দকার,পি.এস.এ
৫৯.	উইং কমান্ডার	মোহাম্মদ খাদেমুল বাসার (মরহুম)
৬০.	স্কোয়াডন লীডার	সুলতান মাহমুদ
৬১.	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	সামসুল আলম
৬২.	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	বদরুল আলম
৬৩.	ফ্লাইট অফিসার	লিয়াকত এ. খান

গণবাহিনী

র‍্যাংক (তদানীন্তন)		নাম
৬৪.	ক্যাপ্টেন	শাহাবুদ্দীন (প্রাক্তন পি.আই.এ)
৬৫.	ক্যাপ্টেন	আকরাম (প্রাক্তন পি.আই.এ)
৬৬.	ক্যাপ্টেন	শরিফউদ্দিন (প্রাক্তন প্লান্ট প্রোটেকশন ফ্লাইট)
৬৭.	জিবি	এম.এইচ.সিদ্দিকী (অবৈতনিক সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট) ইঞ্জিনীয়ার তদানীন্তন ওয়াপদা)
৬৮.	জিবি	আবদুল কাদের সিদ্দিকী (সেক্টর নং-১১)

চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতি

চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের আয়তন প্রায় ২০ বর্গমাইল। চরবাড়ীয়া ইউনিয়নটি মূলতঃ বরিশাল শহর-সংলগ্ন তিনদিকে আড়িয়ালখাঁ নদী দ্বারা বেষ্টিত। উত্তরে নদীর ওপার শায়েস্তাবাদ ইউনিয়ন। পূর্বে ও পূর্ব-দক্ষিণে নদী ও নদীর ওপারে চরমোনাই ও চরকাউয়া ইউনিয়ন। দক্ষিণে বরিশাল পৌরসভা, পশ্চিমে কাশিপুর ইউনিয়ন-এর সাথে সংযুক্ত এবং উত্তরে বাবুগঞ্জ থানার চাঁদপাশা ইউনিয়ন।

চরবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের জনাব মৌঃ এছহাক আলী মাতুব্বর চেয়ারম্যান থাকাকালীন, উলালঘুনীর বাসিন্দা আলহাজ্ব আয়নাল আবেদীন হাওলাদার এবং তাঁর ভাইর ছেলে জনাব সেকান্দার আলী হাওলাদার ইউনিয়ন পরিষদের নামে ০.৩২ শতক জমি দান করেন এবং এই জমির উপর ১৯৫৯ সালে চরবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ স্থাপিত হয়। এর পূর্বে প্রেসিডেন্ট ও চেয়ারম্যানদের নিজ নিজ বাড়ীতে অফিসের কাজ পরিচালিত হতো।

১৯৯১ সনের আদম শুমারী অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ২৯,১৬১ জন। ১৯৯৬ সনে জানুয়ারি মাসে ইউনিয়ন পরিষদের তথ্যানুযায়ী পুরষ- ১৬,৩৩৭ জন এবং মহিলা ১৫,৭১৫ জন, সর্বমোট=৩২,০৫২ জন। ১৯৮১ সালে জনসংখ্যা ছিলো ২৪,৮০০ জন। ১৯৪৮ সালে ১১,৪০০ জন। বর্তমানে প্রায় ৫,৪৫১টি বসতী ঘর আছে। গ্রামের সংখ্যা হলো ১৯ এবং মৌজার সংখ্যা ১৪টি।

ইউনিয়নে মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা ৫টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা- ১০টি, রেজি: বে-সরাকরী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩টি, মাদ্রাসা ২৫টি, মসজিদ ৬৭টি (পাকা- ৩১টি), মন্দির ২টি, ক্লাব/পাঠাগার ৮টি, হাট-বাজার ৬টি, শিক্ষা উন্নয়ন ট্রাষ্ট ৪টি, কলকারখানা (ছোট) ৮টি, পাকাপুল ১২টি, জেলা পরিষদ রাস্তা ৩টি, লোকাল রাস্তা ২২টি, ভেরীবাঁধ ১টি, কৃষি ব্যাংকের শাখা ১টি, তহশিল অফিস ১টি, ক্লিনিক ১টি, খাল ৫টি (ইহার কিছু শাখা/প্রশাখা আছে), দীঘি ৩টি (মতাসার দীঘি, নীলখোলার দীঘি ও মিয়ার দীঘি) এবং সাব-পোস্ট অফিস ১টি।

পঞ্চায়েত, প্রেসিডেন্ট ও চেয়ারম্যান

চরবাড়ীয়া ইউনিয়নে পঞ্চায়েত হিসেবে চরবাড়ীয়া নিবাসী মধু খান পঞ্চায়েত হতে পঞ্চায়েতের কর্মকান্ডের তথ্য পাওয়া যায়। তারপর উলালঘুণী নিবাসী জনাব হাচন উদ্দিন হাওলাদার, এরপর চরআবদানীর জনাব আব্দুল মজিদ হাওলাদার, মতাসর নিবাসী জনাব কেস্ট রায় (মাত্র দু'বছর), সর্বশেষ উলালঘুনির জনাব গোলাম রহমান নাজির চরবাড়ীয়ার পঞ্চায়েত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব গোলাম রহমান পঞ্চায়েতের পর চরবাড়ীয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রথম প্রেসিডেন্ট-এর দায়িত্ব পালন করেন। খাজনা আদায় করাই তখনকার পঞ্চায়েতদের মূল দায়িত্ব ছিলো। পঞ্চায়েত-এর দায়িত্ব পালন করায় তাঁদের বাড়ীটি পঞ্চায়েত বাড়ী হিসেবেই গণ্য করা হয়। জনাব গোলাম রহমান দীর্ঘ ২০/২২ বছর এই পদে বহাল ছিলেন। জনাব গোলাম রহমান বরিশালের কালেক্টরীতে নাজিরের চাকরি করতেন। তৎকালে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে তিনি অফিসে যেতেন। নাজিরের চাকরি করতেন বিধায় বাড়ীর নাম হয় নাজির বাড়ী। তিনি ব্যক্তি হিসাবে একজন সৎ মানুষ ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায়ই ১৯৩১ সালে উলালঘুনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় । তাঁর কর্মকান্ডে তৎকালীন ব্রটিশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে 'যুবলী' পদক প্রদান করেন। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ সালে নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। ১৩০৭ সালে চরবাড়ীয়া ইউনিয়নে ট্যাক্স ছিলো ২৭০০/- টাকা। জনাব গোলাম রহমান প্রেসিডেন্ট হয়ে এডুকেশন-সেচ, কর বৃদ্ধি করে ৩২০০/-টাকায় উন্নীত করেন । ১৩ জন চৌকিদারকে ৫/- হিসেবে বেতন দেয়া হতো । বাকী টাকা শুধু রাস্তাঘাটের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হতো।

জনাব গোলাম রহমানের পর জনাব মোহম্মদ আলী খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ব্রটিশের শাসন থেকে মুক্ত হয়ে ভারত-পাকিস্তানের জন্ম হয় । পাকিস্তান দ'ুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নাম ধারণ করে।

পাকিস্তান লাভের পর ইউনিয়নে প্রথম প্রেসিডেন্ট হন জনাব এসাহাক আলী মাতুব্বর। তিনি ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট এবং ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বরিশাল শহরে একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী হিসেবে জনাব এসাহাক আলী মাতুব্বরের সুনাম ছিলো। তিনি প্রতিটি নির্বাচনে

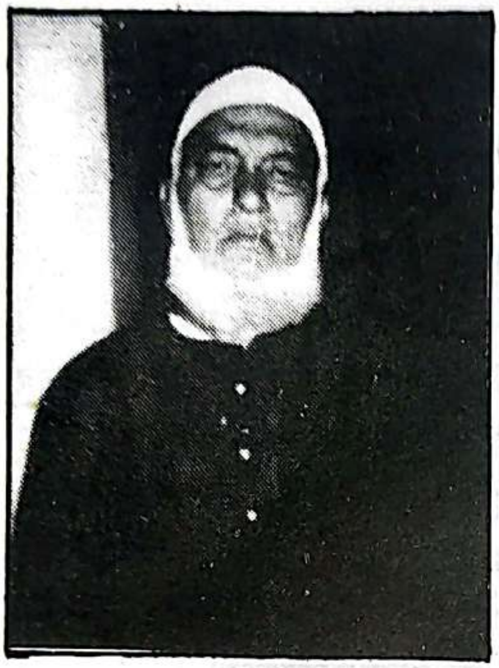

মোঃ এছাহাক আলী মাতুব্বর

বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেন। কোন কোন নির্বাচনে ইউনিয়নের প্রতিটি খানায় একখানা শাড়ী বা লুঙ্গি খয়রাত হিসাবে বিতরণ করেছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে ইউনিয়নে ক্ষতিগ্রস্থদের নিজ তহবিল থেকে প্রচুর সাহায্য-সহযোগিতাও করেছেন। কোতয়ালী থানার ১০ জন ইউনিয়ন চেয়ানম্যানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়ে পুরস্কার লাভ করেছেন। ১৫ই এপ্রিল ১৯৯৮ সালে তিনি বিষপানে ইন্তেকাল করেন (ইন্না...রাজেউন)।

সাপানিয়া গ্রামের মতলেব নাজির দীর্ঘ ২০ বছর যাবত ইউনিয়ন পরিষদের তহশিলদার হিসাবে ট্যাক্স আদায়ের কাজ করে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

১৯৭১ সালে দীর্ঘ ন'মাস মুক্তি যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয় । স্বাধীন বাংলাদেশে চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের মনোনিত প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে ডাঃ সৈয়দ জাফর আলী দায়িত্ব পালন করেন। তখন প্রতিটি গ্রামে রিলিফ কমিটি ছিলো এবং ইউনিয়ন পর্যায়ও একটি রিলিফ কমিটি ছিলো। এ রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যানই ইউনিয়ন পরিষদের কার্য সম্পাদন করতেন এবং ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত একজন কর্মচারী। চরবাড়ীয়া ও শায়েস্তাবাদসহ এ অঞ্চলে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে সবার কাছে পরিচিত। ব্যক্তি হিসেবে একজন সরল মানুষ। ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করায় রাজাকারদের সহযোগিতায় তাঁকে ধরে নিতে এলে, তাঁকে না পেয়ে তাঁর ঔষধের দোকান লুঠ করে সব কিছু নিয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য তিনি ১৯৯৬ সনে জেলা প্রশাসক-এর কাছ থেকে প্রশংসাপত্র পেয়েছেন। বর্তমানে ইউনিয়ন কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।

ডাঃ সৈয়দ জাফর আলী

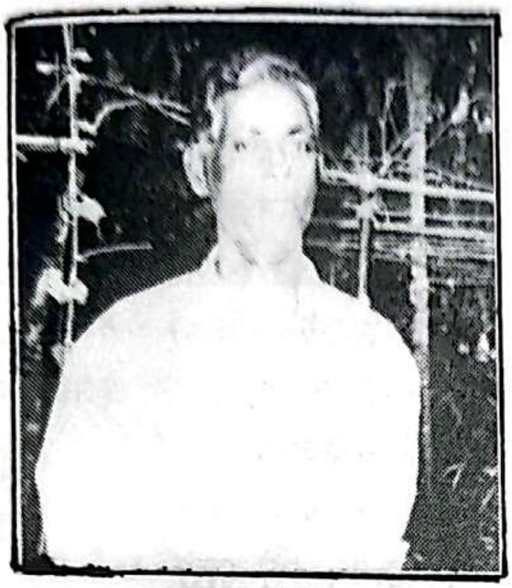

খালেকুজ্জামান

১৯৮১ সালে অসুস্থতার কারণে জনাব এসাহাক আলী মাতুব্বর চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করায় উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে জনাব আঃ সত্তার নেগাবানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জনাব খালেকুজ্জামান চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। জনাব খালেকুজ্জামান কাগাশুরা নিবাসী এবং কাগাশুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক। এককালে খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ এবং কৌতুক অভিনেতা হিসেবে প্রখ্যাত ছিলেন।

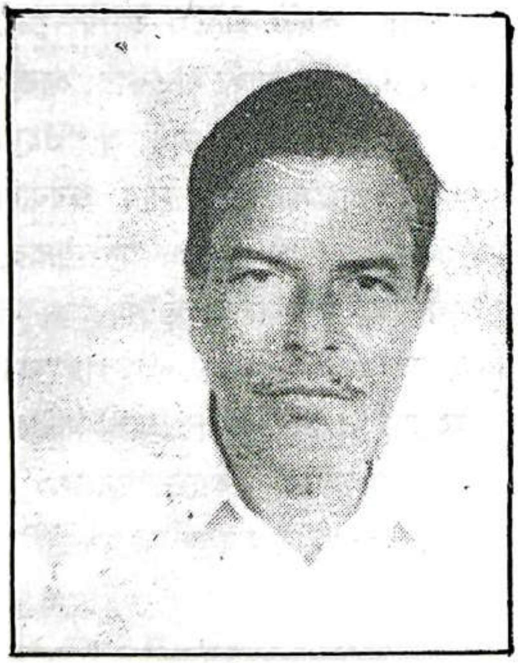

মোঃ মোশাররফ হোসেন মাতুব্বর

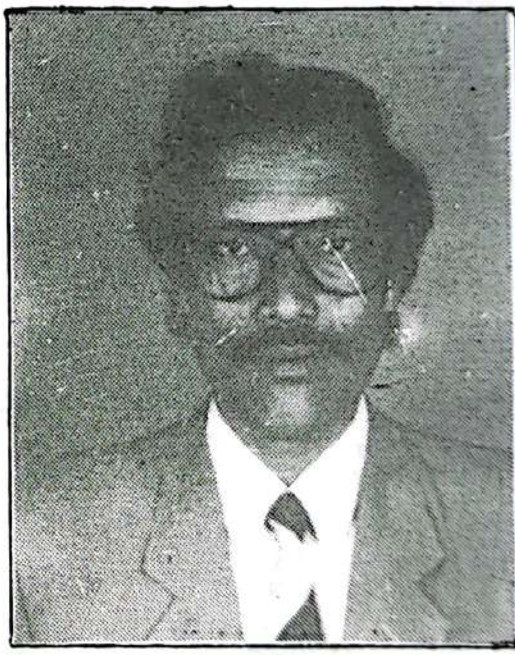

মোঃ মজিবুল হক

ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ শেষে পুনরায় সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনাব খালেকুজ্জামান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৮৫ সালে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের অনাস্থার প্রেক্ষিতে তাঁর চেয়ারম্যান পদ বাতিল ঘোষণা করা হয় এবং উপ-নির্বাচনে জনাব মোশার্‌রফ হোসেন মাতুব্বর চেয়ারম্যান নির্বা চিত হন।

তিনি ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত চেয়ারম্যান ছিলেন। বরিশালে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে জনাব মোশার্‌রফ হোসেন মাতুব্বরের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি৫৯ বৎসর বয়সে ২১শে অক্টোবর ১৯৯৫ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। ১৯৯২ সালে সাধারণ নির্বাচনে জনাব মোশার্‌রফ হোসেন মাতুব্বর-এর সাথে

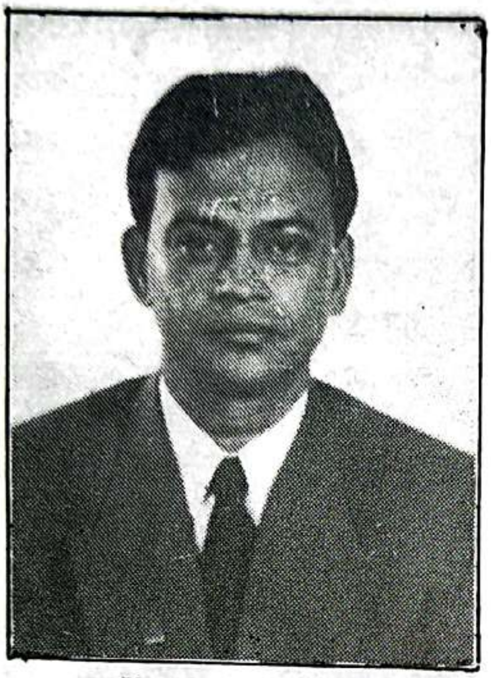
ক্যাপ্টেন (অবঃ) শাহ আলম বাচ্চু

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জনাব মজিবুল হক চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে লামচরী নিবাসী ক্যাপ্টেন (অবঃ) শাহ আলম বাচ্চু বিপুল ভোটে জয়লাভ করে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সমাজকর্মী, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি

সর্বজনাব কাজী হাতেম আলী, মোঃ গোলাম রহমান, এছহাক আলী মাতুব্বর, আরজ আলী মাতুব্বর, মোহাম্মদ আলী খান, আঃ ওহাব খান, দলিলউদ্দি হাওলাদার, জনাব জয়নাল আবেদীন হাওলাদার, আব্দুল লতিফ হাওলাদার, মোহম্মদ আলী মিয়া, আদলশা ভূঁইয়া, আবুল কাশেম মুন্সী, আব্দুল করিম পেশকার, সেক্রেটারী আব্দুল জব্বার মিয়া, সাইদুর রহমান খান, আব্দুল জব্বার মিয়া, নজর আলী মাষ্টার, জোনাব আলী মাষ্টার, আরব আলী মাষ্টার, জেন্নাত আলী মাষ্টার, জোনাব আলী খান, এ.বি.এম. সৈয়দ আহমদ এবং আরো অনেকে ।

ব্যবসায়ী

সর্বজনাব মৌঃ এসাহাক আলী মাতুব্বর, স্বরুপ আলী হাওলাদান, সাহেদ আলী নেগাবান, কোব্বাত আলী মিয়া, মোশাররফ হোসেন মাতুব্বর, মতিয়র রহমান চাঁন মিয়া, আমজাদ সিকদার, মোবারক আলী গাজী, হুজ্জত আলী নেগাবান, আব্দুল আজিজ হাওলাদার, ছত্তার নেগাবান, হুমায়ুন রাড়ী, আঃ লতিফ হাজী, জনাব রফিকুল ইসলাম।

ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য

সর্বজনাব আব্দুল গণি হাওলাদার, আবদুল ওয়াজেদ খান, মোঃ রহম আলী মৃধা, আদম আলী সরদার, হাতেম আলী মল্লিক, আব্দুল জব্বার মিয়া, আব্দুল জব্বার সেক্রেটারী, আব্দুল গনি, কলমদার খান, ফজলুর রহমান, আয়নাল আবেদীন হাং, হাশেম

মুন্সী, জোনাব আলী খান, আয়নাল শরীফ, কলমদার খাঁ, আঃ রাজ্জাক তালকুদার, আঃ বারেক ফকির, মোহাম্মদ আলী সরদার, মোঃ হাবিব হাওলাদার, আব্দুল ওহ্যব খান, আঃ মান্নান হাং, হোসেন চাপরাশী, এ,বি, এম, সৈয়দ আহমদ, আব্দুল ওয়াহেদ সিকদার, আরো অনেকে ।

বিশিষ্ট মুক্তিযাদ্ধা

সর্বজনাব এ, এম, জি, কবীর বুলু, মোখলেছুর রহমান, সৈয়দ জাফর আলী, কাজী হাবিবুর রহমান, জনাব আবদুল মন্নান খলিফা, জনাব আবদুল খালেক, লতিফ জোমাদ্দার, মোঃ হানিফ হাওলাদার, আলহাজ্ব আব্দুল মন্নান ও জয়নাল আবেদীন আরো অনেকে ।

শিক্ষা

চিরাচরিত ভাঙ্গাগড়ার নিয়মে নদীবেষ্টিত চরবাড়ীয়া ইউনিয়নবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বরাবরই অসচ্ছল ছিল। বৃটিশ আমলে জ্ঞান অর্জনের জন্য আনুষ্ঠানিক কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলো না। পাড়ায় পাড়ায় কিছু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে নিজ নিজ বাড়ীতে মক্তবের প্রচলন ছিল। এ-সব মক্তবে স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণসহ ছিপাড়া (আমপাড়া) পড়ান হতো। মক্তবে যাঁরা পড়াতেন তাঁদেরকে 'মেয়াছাব' বলা হতো। মেয়াছাবগণ আবার মসজিদে ইমামতি করতেন বলে মুন্সীও বলা হতো। সাপানিয়ার মুন্সী হাতেম আলীকে বড় মেয়াছাব বলা হ'ত। রহম আলী ও আলী আজিম খানকে মুন্সী বলা হতো।

উনিশ শতকের শেষ দিকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় চরবাড়ীয়া বোর্ড প্রাইমারী স্কুল। এ স্কুলে যাঁরা পড়াতেন তাদেরকে বলা হ'ত পন্ডিত। যতদূর জানা যায় নোয়াখালী থেকে আগত রেহান উদ্দিন ছিল প্রথম এবং মুন্সী আলী আজিম খান ছিলেন দ্বিতীয় পন্ডিত। তাঁদের কাছে যাঁরা পড়তেন, তারা হলেন-হাবিবুর রহমান, মকবুল হাওলাদার, জুলমত খান, ওয়াজেদ মিয়া, আমজেদ মিয়া, জয়নাল আবেদীন, চান মিয়া, জোনাব আলী খান প্রমুখ। এ স্কুলকে কেন্দ্র করেই এলাকায় পড়াশুনা ও জ্ঞানচর্চা শুরু হয়। কালিহাতার মেয়াছাব, আরব আলী মাস্টার, কেরামত আলী মাস্টার, জোনাব আলী মাস্টার, জেন্নাত আলী মাস্টার ও খন্দকার হুসাইন মাস্টার এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

বোর্ড স্কুলে শুধু চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের ছাত্ররাই পড়াশুনা করতো না। পার্শ্ববর্তী শায়েস্তাবাদ থেকেও নদী পাড় হয়ে ছত্ররা এখানে এসে পড়াশুনা করতো। ইউনিয়নের দূরবর্তী এলাকার ছাত্ররা স্কুলের নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করতো। শায়েস্তাবাদ ইউনিয়নের আব্দুল মোতালেব আকন, রহম আলী বেপারী, মকবুল হোসেন এবং গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুর রহমান বিশ্বাস-এ স্কুলেই পড়াশুনা করেছেন। প্রেসিডেন্টে আব্দুর রহমান বিশ্বাস হলেন এ স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে ১ম উচ্চ প্রাইমারী বৃত্তিপ্রাপ্ত মেধাবী ছাত্র।

চরবাড়ীয়া ইউনিয়নে প্রথম মাধ্যমিক বিদ্যালয় কাগাশুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। জনাব কাজী হাতেম আলী এবং জনাব মোহাম্মদ আলী খানসহ এলাকার বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ১৯৪৭ সালে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের সাবেক রাষ্ট্রপতি জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস অত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন।

চরবাড়ীয়া ইউনিয়নে প্রথম মেট্রিক পাস করার কৃতিত্ব অর্জনকারী উলালঘুনি নিবাসী নাদের আলী খন্দকার। তিনি ১৯০৯ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করেন। কর্মজীবনে প্রথমে বৃটিশ সরকারের অধীনে পুলিশ বিভাগে চাকরি করেন। পরবর্তীতে কোলকাতা থেকে মোক্তারী পরীক্ষা দিয়ে সনদ নিয়ে বরিশালে মোক্তারী পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।

প্রথম বি, এ, ডিগ্রী লাভ করেন মৌঃ মোঃ হুজ্জত উল্লাহ্। কাগাশুরা গ্রামে এক দরিদ্র কৃষিজীবী পরিবারে তাঁর জন্ম। ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তি লাভ করেন। ঢাকায় আলীয়া মাদ্রাসা হতে এস, এস, স ও এইচ, এস, সি পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের তিনিই প্রথম ছাত্র। আরবী বিষয়ে ১ম শ্রেণীতে বি, এ, অনার্স পরীক্ষায় ১৯৩৬ সনে পাস করেন। বরিশাল কালেকটরীতে ক্লার্ক হিসেবে ১৯৩৭ সালে কর্মজীবন শুরু করেন। ৩ মাস পর পুলিশ বিভাগে সাব-ইন্সপেক্টর-অব-পুলিশ পদে চাকরি নেন। দীর্ঘদিন চাকরি করার পর এ, এস, পি, হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে ১৯৬৭ সনে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি অতি দারিদ্র্যের মধ্য থেকে মেধা ও অধ্যবসার গুণে শিক্ষা লাভ করেন এবং এ জন্য সর্ব মহলের সহযোগিতা তিনি লাভ করেছিলেন।

লামচরী নিবাসী মোঃ ফজলুর রহমান মৃধা ১৯৩৭ সনে বি, এম, কলেজ থেকে বি,এ, ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৩৭ সনে কোলকাতা গিয়ে ক্লার্ক হিসেবে রেলওয়ে বিভাগে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৪১ সনে মিলিটারী একাউন্টস-এ যোগদান করেন। ডেপুটি কন্টোলার-অব-মিলিটারী একাউন্টস হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে ১৯৭৩ সালে

অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ৫ই ডিসেম্বর ১৯৯৭ সনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না............রাজেউন)।

নিম্নবিত্ত কৃষিজীবী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে দেড় বছর বয়সে পিতাকে হারিয়ে সহায় সম্বলহীন হয়ে, জীবন সংগ্রাম শুরু করে সকল বাঁধাকে অতিক্রম করে কৃতিত্বের সাথে পড়াশুনা যিনি শেষ করেন, তিনি হলেন চরবাড়ীয়া গ্রামের মুহাম্মদ ইসমাইল হুসায়েন। ১৯২৮ ইং সনে ২রা নভেম্বর তাঁর জন্ম। পিতার নাম ময়েজউদ্দীন আহম্মদ। পিতার মৃত্যুর পর সংসারে রইলো শুধু সাড়ে তিন বছর বয়সের বড় বোন এবং বিধবা মা। ১৯৩৭ সনে ৪র্থ শ্রেণীর উচ্চ প্রাইমারী বৃত্তি লাভ করে বরিশাল জিলা স্কুলে ৫ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। বৃত্তির পরিমাণ ছিলো মাসিক টাঃ ৩/-। এতেই বইপত্র এবং আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের খরচ করে গড়ে মাসিক জমা থাকতো টাঃ ২/-, পোস্টাল সেভিংস একাউন্টে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে দু'বছর উচ্চ প্রাথমিক বৃত্তি ভোগ করার পর ৭ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য ট্রাস্টফান্ড স্কলারশীপ মাসিক টাঃ ৪/- থেকে টাঃ ৫/- ভোগ করে ১৯৪৪ সনে ম্যাট্রিক পাস করেন, ১ম বিভাগে আরবী ও ভারতীয় শাসন পদ্ধতিতে লেটারসহ। বরিশাল বি, এম, কলেজে থেকে কৃতিত্বের সাথে আই, এ, এবং বি, এ পাস করেন।

সায়েস্তাবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা দিয়েই কর্মজীবন শুরু। ঢাকাস্থ মতিঝিল কেন্দ্রীয় সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময়ে ইংরেজী বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য যুক্তরাজ্যের কমস্‌ওয়েল্‌স বাসারী স্কীমে বৃত্তি নিয়ে ইউনিভারসিটি অব-এক্সেটার প্রশিক্ষণ লাভ করেন। দেশে ফিরে পদোন্নতি পেয়ে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাদের বাংলা মিডিয়াম বালক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। সেখান থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী বিষয়ে শিক্ষা অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। স্বাধীন বাংলাদেশ জন্মলাভের পর দেশে ফিরে ঝালকাঠী সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পদোন্নতি পেয়ে বিভাগীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক (খুলনা) হিসেবে বরিশালে যোগদান করেন। '৮১ সালে পদোন্নতি পেয়ে উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তর, চট্টগ্রামে যোগদান করেন এবং '৮৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহণ করেন। '৯৩ থেকে '৯৭ পর্যন্ত ঢাকাস্থ হলি ফ্যামিলি রেড্ ক্রিসেন্ট হাসপাতালে উপ-পরিচালক (প্রশাসন) হিসেবে চাকরি করার পর স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে চট্টগ্রাম ও বরিশালে অবস্থান করছেন।

চরবাড়ীয়া ইউনিয়নে ১ম এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেন কাজী গোলাম কাদির। তিনি ১৯৪৭ সালে দর্শন শাস্ত্রে কোলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে কৃতিত্বের সাথে এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেন। বি, এম, কলেজে দীর্ঘ দিন অধ্যাপনা করে জীবন কাটিয়েছেন। তিনি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর যুক্তিবিদ্যার পুস্তক রচনা করেছেন।

বি, সি, এস, পরীক্ষায় ইউনিয়নে ১ম কৃতিত্ব অর্জনকারী ও প্রথম প্রশাসনিক ক্যাডারের কর্মকর্তা এম, এ, শুকুর। কাগাশুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ও প্রধান শিক্ষক, বরিশাল জিলা স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক এবং গৌরনদী কলেজের দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করার পর ১৯৭০ সনে অনুষ্ঠিত বিশেষ ইপিসিএস পরীক্ষায় সফলতার ভিত্তিতে ১৯৭৪ সনে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে অন্তর্ভূক্তি হন। ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা প্রশাসক, থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপ-পরিচালক, সচিব, সিটি কর্পোরেশন ঢাকাসহ সরকারী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে ১৯৯৭ সালে অবসর গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে একটি সরকারী উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক-এর দায়িত্ব পালন করছেন। বেশ কয়েকজন আত্মীয় ও এলাকার যুবকদের কর্মসংস্থানে তিনি বিশেষ সাহায্য ও সহযোহিতা প্রদান করেছেন।

চরবাড়ীয়া নিবাসী মোঃ আব্দুর রশিদ খানের পুত্র মোঃ আকতারুজ্জামান খান বি, সি,এস, (শিক্ষা) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বরিশাল সরকারী মহিলা কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করে কর্মরত আছেন।

আইনজীবী

খন্দকার সামছুদ্দিন আহমেদ প্রথম আইনে ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি উলালঘুনি নিবাসী নাদের আলী খন্দকারের বড় ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন সরকারী উচ্চপদে চাকরি শেষে ঢাকায় অবসর জীবন কাটাচ্ছেন।

চরবাড়ীয়া নিবাসী জনাব এম.এ. মান্নান হাওলাদার পিতা মরহুম মৌলভী জয়নাল আবেদীন হাওলাদার একজন খ্যাতনামা সফল আইনজীবী। ২৪ শে জুলাই ১৯৩৫ সালে তাঁর জন্ম। ১৯৫৯ সালে বি. এ. এবং ১৯৬৩ সালে কৃতিত্বের সাথে এল. এল. বি পরীক্ষায় পাস করেন। পারিবারিক স্বচ্ছলতা না থাকায় মেট্রিক পাস করার পরই ১৯৫১ সালে বরিশালে স্টীমার কোম্পানীতে চাকরি করেন। পরবর্তীতে এস. এ. ডিপার্টমেন্ট এবং এ.জি. অফিসে চাকরি করেন। এল. এল. বি. পাস করার পর ১৯৬৫ সালে বরিশাল বারে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন। ১৯৬৯ সালে এ. পি. পি, ১৯৭৩ সালে পি. পি, ১৯৭৬ সালে মার্শল'ল পি. পি, ১৯৮৪ সালে পাবলিক প্রোসিকিউটর হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব

পালন করেন। ১৯৮৬ সালে বরিশাল বার সমিতির নির্বাচিত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

পারিবারিক স্বচ্ছলতা না থাকলেও জীবনে সততা ও কঠোর অধ্যবসয়ের মাধ্যমে চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের কৃতি সন্তান আইনজীবী হবার কৃতিত্ব অর্জন করায় তাঁর স্বীকৃতি স্বরূপ তৎকালিন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মৌঃ এছহাক আলী মাতুব্বর ইউনিয়নবাসীর পক্ষ হতে গণসংবর্ধনা প্রদানের আয়োজন করেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সমস্ত আয়োজন শেষ এবং যথারীতি এলাকার লোকজনসহ বরিশাল শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সভায় উপস্থিত, এমনি মুহূর্তে হীন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ঘনিস্ট আত্মীয়দের স্বার্থপরতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণ একটি মহল চক্রান্ত করে গোলযোগ সৃষ্টি করে সভা পন্ড করে দেয়। একটি মহৎ উদ্দেশ্যকে প্রতিহিংসাপরায়ণ মহল কিভাবে ভন্ডুল করে ইউনিয়নবাসীর জীবনে কালিমা লেপন করে দিলো, সে প্রশ্নের জবাব আজও পাওয়া যায় নি। মহৎ কিছু করা বা সৃষ্টির পেছনে একটি মহল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে অনেক উদীয়মান জীবন অংকুরে বিনষ্ট করে দিতে পারে, গ্রামগঞ্জে তার যথেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া বিচিত্র নয়।

আইনজীবী হিসেবে চরবাড়ীয়া নিবাসী আব্দুর রশিদ হাওলাদারের নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি ও তাঁর স্ত্রী ২৫শে এপ্রিল '৭১ সনে পাকবাহিনীর গুলীতে আহত হন এবং ৮ মাসের শিশু পুত্র পলাশ শহীদ হয়েছেন। এ ছাড়াও বর্তমানে বেশ কয়েকজন ল' পাস করে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত আছেন।

ডাক্তার

চরবাড়ীয়া ইউনিয়নে প্রথম এম.বি.বি.এস. ডাক্তার চরবাড়ীয়া গ্রামের জনাব সোবাহান হাওলাদারের পুত্র মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন। মেধাবী ছাত্র হিসেবে খ্যাত মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তি লাভ করেন। বরিশাল বি.এম. কলেজ হতে আই.এস.সি. পাস করে '৭০ সালে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। '৭৭ সালে ডাক্তারী পাস করে ১ বৎসর ইন্-সার্ভিস ট্রেনিং করার পর মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে তজুমদ্দিন থানা হেল্থ কমপ্লেক্স-এ যোগদান করেন। তারপর কিছুদিন মেহিন্দিগঞ্জে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজে সিনিয়র স্টোর অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন।

উলালঘুনী নিবাসী জনাব মোঃ লুৎফর রহমানের পুত্র মোঃ তৌফিক-উর-রহমান এম.বি.বি.এস. পাস করে মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে সরকারী চাকরিতে কর্মরত আছেন।

রাড়ীমহল গ্রামের জনাব মফিজুর রহমান (মানিক) মিয়ার ছেলে মোঃ আনিসুর রহমান (শাহিন) শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯৯৬ সালে পাস করে বর্তমানে মির্জাপুর কুমুদীনি হাসপাতালে কর্মরত আছেন।

কাগাশুরা নিবাসী জনাব আব্দুল মান্নান মিয়া (খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তা বর্তমানে অবসারপ্রাপ্ত)-এর দ্বিতীয় কন্যা মাহবুবা বেগম লাইজু শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯৯৭ সনে ডাক্তারী পাস করেন।

বি.এস.সি. ইঞ্জিনীয়ারিং

চরবাড়ীয়া ইউনিয়নে প্রথম বি. এস. সি. ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী লাভ করেন উলালঘুনি নিবাসী মকবুল হাওলাদারের পুত্র আফতাব উদ্দিন সুরুজ। বি.এস.সি ইঞ্জিনীয়ারিং (সিভিল) ১৯৭৭ সালের পরীক্ষা ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৮০ সালে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে পানি উন্নয়ন বোর্ডে যোগদান করেন। বর্তমানে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী হিসেবে ডিজাইন সার্কেল-২, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকায় কর্মরত আছেন।

কাগাশুরা নিবাসী আব্দুল মান্নান মিয়ার পুত্র ডঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম বি.এস.সি. ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী লাভ করেন। পরে পি. এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন ব্যাংকক থেকে। বিআইটি খুলনায় প্রভাষক হিসেবে চাকরিতে যোগদান করেন। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় কর্মরত আছেন এবং সপরিবারে সেখানে অবস্থান করছেন।

চরবাড়ীয়ার মরহুম এম. ফজলুর রহমানের ছেলে মোঃ রফিকুল ইসলাম বাচ্চু ১৯৯০ সালে বি.এস.সি. ইঞ্জিণীয়ারিং পাস করে ঢাকাতে কোন এক বিখ্যাত কোম্পানিতে কর্মরত আছেন।

সাপানিয়া নিবাসী মরহুম অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির-এর পুত্র কাজী গোলাম নাছির বি.এস.সি ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করে ঢাকায় গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে উচ্চপদে কর্মরত আছেন।

চরবাড়ীয়া গ্রামের মোঃ চেরাগ আলী মিয়ার পুত্র মোঃ আবদুল জব্বার ১৯৯৪ সালে বি.এস.সি. ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বর্তমানে বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে কর্মরত আছেন।

চরবাড়ীয়া নিবাসী হাবিবুর রহমান ইউসুফ-এর পুত্র সুলতান আহম্মদ (খোকা) বি. এস. সি. ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী লাভ করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত আছেন।

স্বাধীনতার পূর্বে চরবাড়ীয়া ইউনিয়নে চাকরিজীবীর সংখ্যা ছিলো খুবই কম। স্বাধীনতার পর বেশ কিছু ব্যক্তি সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংকে, বীমাসহ বেসরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে চাকরি নিয়ে কর্মরত আছেন।

লেখক ও সাংবাদিক

কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক তাঁদের চিন্তা-ধারণার ফসলরূপে লিখিত আকারে কিছু রেখে যান। আর তাঁদের ইতিহাস রচিত হয় তাঁদের মৃত্যুর পরে। কিন্তু এ সমস্ত ব্যক্তিবর্গের মূল্যায়ন তাঁদের জীবদ্দশায় হওয়া উচিত। আমাদের সমাজে যাঁরা ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধে ওঠে মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন, তাঁদের কথা লিখে রাখা উচিত সমাজের অন্য দশজনের জন্যে এবং আগামী প্রজন্মের জন্যে, যেন এসব ত্যাগী পুরুষের জীবন অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকে সকল মানুষের কাছে। এ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কর্ম প্রয়াসের মূল্যায়ন আবশ্যক।

লামচরী গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে আরজ আলী মাতুব্বর জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় নিঃস্ব মাতুব্বর সাহেব তাঁর যা কিছু ছিলো তার সবই মানবকল্যাণে দান করেছেন, এমনকি নিজেকেও। মানুষকে মানবকল্যাণে ব্যবহারের এর চেয়ে উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে!

একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও কঠোর অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করে সাংবাদিকতা ও সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন জনাব এ. বি. এম. সৈয়দ আহমদ। তিনি বহু সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার লেখা "ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ" (জীবনগ্রন্থ) এবং "বিফল বসন্ত" (উপন্যাস) দু'খানা বেশ সুনাম কুড়িয়েছে। তিনি বরিশাল প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তাঁর সাহিত্য সাধনা এখনও অবিরাম।

রাড়ীমহল গ্রামের মরহুম আরব আলী মাস্টারের পুত্র মফিজুর রহমান একজন স্বনামধন্য সাহিত্যিক। তাঁর লেখা 'গ্রামের মেয়ে', 'জীবনতরী' ,'স্মৃতিকণা', 'মাটির দেয়াল', 'দাবাগ্নী', 'তীরভাঙ্গা ঢেউ', শিলাপটে আকাঁ', তরুনদের বঙ্গবন্ধ' প্রবন্ধ-উপন্যাস

প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অনেক লেখা প্রবন্ধ-উপন্যাস অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। তিনি ছাত্র জীবন থেকে লেখালেখি করে আসছেন। সাহিত্য সাধনা এখনও অবিরাম।

মতাসার নিবাসী আব্দুল মন্নান ফকিরের পুত্র মজিবুর রহমান জমির একজন উদীয়মান লেখক। সম্প্রতি তাঁর লেখা উপন্যাস "সেই রাতের অপেক্ষায়" বইখানা ছাপা হয়েছে।

সাংবাদিক ও আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ইসমাইল হোসেন নেগাবান '৯৩ সালে বরিশাল প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারী এবং ৯৬ সালে সভাপতি নির্বাচিত হন। এছাড়া তিনি বাংলাবাজার পত্রিকা ও অভজারভার পত্রিকার বরিশাল প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বপালন করছেন। বর্তমানে আইনজীবী পেশায় নিয়োজিত আছেন।।

উলালঘুনী নিবাসী মোঃ মতিয়ার রহমান-এর পুত্র মোঃ মফিজুর রহমান (মোক্তার) সাংবাদিকতায় এম, এ, ডিগ্রীপ্রাপ্ত। ঢাকায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাথে তিনি জড়িত। সাংবাদিকতায় বেশ সুনাম রয়েছে।

বাটনা নিবাসী সাংবাদিক রেজা রায়হান বুলবুল "সাপ্তাহিক মানচিত্র" নামে একটি পত্রিকা ঢাকা থেকে নিয়মিত প্রকাশ করছেন।

চরবাড়ীয়া নিবাসী হাবিবুর রহমান খানের পুত্র মাহমুদ মেনন খান দৈনিক মানবজমিন এর স্টাফ রিপোর্টার এবং বিসিডিজেসি-এর সাথে বহুদিন যাবত জড়িত আছেন।

রাজনীতিবিদ

চরবাড়ীয়া গ্রামের মরহুম আলহাজ্ব আবদুল লতিফ-এর পুত্র এ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম মানিক একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক। তিনি ১৯৬৮ সালের পর দু'বার ছাত্রলীগের বৃহত্তর বরিশাল শাখার সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি বরিশাল অঞ্চলের মুজিব বাহিনীর ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন। স্বাধীনতার পর আওয়ামী যুবলীগের জেলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বরিশাল আওয়ামী লীগের অন্যতম কর্ণধার, চরবাড়ীয়ার কৃতিসন্তান জনাব সিরাজুল ইসলাম মানিক গত ২২-১১-৯৮ইং তারিখ রোজ রবিবার দিবাগত রাতে ৫৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বস ত্যাগ করেন (ইন্না.......রাজেউন)। তিনি স্ত্রী, ২ কন্যা, ১ ভাইসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

প্রবীন দার্শনিক ও সমাজ সংস্কারক আরজ আলী মাতুব্বর

জনাব আরজ আলী মাতুব্বর আমাদের মতই একজন সাধারণ মানুষ। মানব জীবনের সামান্য আয়ুষ্কালের মধ্যে কিভাবে তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও মহিয়ান হয়ে উঠলেন তারই ঘটনাবহুল জীবনের কিছু অংশ পরিবেশন করছিঃ

আরজ আলী মাতুব্বর

বরিশাল জেলাধীন চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের লামচরী গ্রামে এক দারিদ্র কৃষক পরিবারে ৩রা পৌষ ১৩০৭ সনে আরজ আলী মাতুব্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম এন্তাজ আলী মাতুব্বর। তাঁর তিন পুত্র ও চার কন্যা । চার বছর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। লাকুটিয়ার রায় বাবুরা তাঁদের সম্পত্তি বাকী খাজনার দায়ে নীলাম করে নিলেন কিন্তু তাঁর মাকে বাড়ী থেকে তাড়ালেন না। আট বছর বয়সে নীলামে সর্বহারা হয়ে বিধবা মায়ের আঁচল ধরে দশ দুয়ারের সাহায্যে কাটিয়েছেন শৈশব কাল। স্বামী হারা, বিত্তহারা ও গৃহহারা মায়ের সাথে তিনি অকুল দুঃখের সাগরে ভাসতে থাকেন।

গুয়া পাতার ছাউনি, মাদারের খাম, খেজুর পাতার বেড়ার চার হাত প্রস্থ ও পাঁচ হাত দৈর্ঘ্য একখানা ঘরে বসবাস করতেন। ঘরের মধ্যেই রাখতেন ভাতের হাড়ি,পানির কলস, পাকের চুলা, কাঁথা-বালিশ সবই। রাতে পা গুটিয়ে শুতেন । ঘুমের ঘোরে কখনো পা মেলে ফেললে হয়তো ভাতের হাড়ি কাত হয়ে পড়তো বা জলের কলসী পড়ে গিয়ে কাঁথা-বালিশ ভিজে যেতো। বলতে গেলে দু' বেলা পান্তা ভাত খেয়েই দিন কাটত।

ছোটবেলা থেকে লেখাপড়া শেখার আগ্রহ ছিলো প্রবল। লামচরী গ্রামে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলো না । স্থানীয় মরহুম মুন্সী আব্দুল করিম সাহেব একখানি মক্তব খোলেন তাঁর বাড়ীতে ১৩২০ সালে। অবৈতনিকভাবে তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন প্রথম পাঠ স্বরবর্ণ-

ব্যঞ্জনবর্ণ ও বানান-ফলা পর্যন্ত। কিন্তু ছাত্র বেতন অনাদায়ী হেতু ১৩২১ সালে মক্তবটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে । এরপর বিভিন্ন উপায়ে সংগ্রহ করে জয়গুন সোনাবান, জঙ্গনামা, মোক্তাল হোসেন ইত্যাদি পুঁথি পড়েছেন। তৎকালে বরিশালে পড়ুয়া ছাত্রদের কাছ হতে পুরান বই সংগ্রহ করে পড়তেন। কৃষি কাজ শুরু করেছিলেন ছোটবেলা থেকেই। মাঠের কাজের ফাঁকে ফাঁকে পাঠের চর্চা করতেন নিজের ঘরে বসেই। কৃষি কাজের সাথে সাথে জরীপ কাজও (আমিনতি) করেন ১৩৩২ সাল থেকে।

১৩৩৯ সালে তাঁর মা মারা যান, তিনি মাকে খুব ভালবাসতেন । বিধবা মা সন্তানের পড়াশুনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। মায়ের মৃত্যু ছিলো তাঁর জন্য এক অসহনীয় আঘাত। মার মুখকে, মার সাহচর্যকে চিরজীবন্ত রাখার চেষ্টায় বরিশাল থেকে একজন ফটোগ্রাফার আনিয়ে তাঁর মৃত মায়ের ছবি তোলেন। এই ছবি তোলার কথা শুনে মায়ের জানাযা দিতে যারা এসেছিলেন তারা লাশ ফেলে রেখে চলে যান। তাদের বক্তব্য ছিল ছবি তোলা হারাম। এই ঘটনা তাঁর মনে ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে জন্ম নেয় অনেক প্রশ্ন। মায়ের জানাযা দেয়া কেন হলো না, মায়ের দোষ কি ? ছবি তোলা যদি হারাম হয় তবে তার দায় ভাগী তো যে ছবি তোলেন বা তোলান। মা কী দোষ করেছে ? এমনি ধরনের অনেকগুলো প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে তিনি উতলা হন। এক কঠিন সংকটের মুখোমুখি হলেন আরজ আলী মাতুব্বর। মার প্রতি ভালবাসার সঙ্গে প্রবল দ্বন্দ্ব ধর্মীয় বিধানের। আত্মীয়-স্বজনদের সহায়তায় কোন রকম মায়ের দাফন- কাফন করলেন। তাঁর মনের সংকট কাটল না। তাঁর এ যাবৎকালের সব বিশ্বাস ধারণার ভিত্তি এমন প্রবল আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলো। তিনি ভাবলেন, বুঝতে হবে.জানতে হবে, শিখতে হবে- কোন্‌টি সত্য আর কোন্‌টি মিথ্যা, কোন্‌টি যুক্তির আর কোন্‌টি অন্ধত্বের। এসময় থেকেই সত্যের সন্ধানে তাঁর যাত্রা শুরু।

ধর্মীয় এহেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কি করা যায় সে লক্ষ্যে পুনরায় জ্ঞান চর্চা শুরু করেন । বরিশাল হ'তে ৭/৮ মাইল দূরে লামচরী নিজ গ্রামে বসবাস করলেও ১৩৪৪ সাল থেকে বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরী থেকে বই বাড়ীতে এনে পড়াশুনা শুরু করেন। মিউনিসিপাল এলাকার বাইরে কোন পাঠককে তার বাড়ীতে বই দেবার নিয়ম ছিল না বলে তৎকালীন বরিশালে বসবাসরতঃ টুপীর ব্যবসায়ী জনাব ওয়াজেদ আলী তালুকদারের নামে বই সংগ্রহ করে পড়তেন। বরিশাল শঙ্কর লাইব্রেরী থেকে দুই-তিন বছর, অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির সাহেবের সহায়তায় ১৩৫৪ সাল থেকে বরিশাল বি. এম. কলেজের লাইব্রেরী থেকে, ১৩৫৭ সাল থেকে বরিশাল ব্যাপটিস্টমিশন লাইব্রেরী থেকে বই এনে পড়েছেন। জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে আরো বই সংগ্রহ করে তিনি দিন রাত

পড়াশুনা করেছেন। অন্তরের জ্ঞান পিপাসা বারবার তাঁকে বহু মানুষের কাছে নিয়ে গেছে। তিনি বলেছেন যার কাছেই গিয়েছেন কেউ, তাঁকে বিমুখ করেন নি। পড়াশুনার মাধ্যমে তিনি বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে তাঁর ভেতর এক অনুভূতির উদয় হয় যে, সাধারণ মানুষের কল্যাণের ক্ষেত্রে কিছু করা যায় কিনা ? যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭৪ সালে "সত্যের সন্ধান" এবং ১৯৭৮ সালে "সৃষ্টির রহস্য" নামক দু'খানা পুস্তক রচনা করেন। এই বইতে তিনি ধর্মের, তথাকথিত পল্লী গ্রামের মানুষের সামাজিক কুসংস্কারের বিষয় আশ্চর্য আশ্চর্য সব প্রশ্ন তুলে ধরেছেন এবং পরবর্তীতে তিনি নিজেই তাঁর সমাধান দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই সদিচ্ছা, আত্ম-উপলব্ধি ও দার্শনিক যুক্তিসমূহ সকল মানুষকে বিমুগ্ধ করেছে। পরবর্তীতে 'মুক্তমন', 'মিথ্যার সন্ধানে অনুমান' দু'খানা বই রচনা করেছেন।

সত্যের জন্য, জ্ঞানের দিগন্তকে আরো প্রসারিত করতে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নতুন করে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চেয়েছেন তিনি তাঁর লেখনির মাধ্যমে। যে-সব কুসংস্কার দানা বেঁধে যুক্তিকে পঙ্গু করে দিয়ে আমাদের মনকে মোহাচ্ছন্ন করেছে, তার একটি তালিকাও তিনি তৈরি করেছেন। মনের বিদ্যমান যাবতীয় ধ্যান-ধারণাকে সংশয়ের মাপকাঠিতে তাঁর সত্যের সন্ধান বই রচনার বিষয় করেছেন। তিনি এটাও প্রমাণ করলেন যে, স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক শিক্ষালাভ না করলেও যথার্থ দার্শনিক হওয়া যায়। তিনি প্রগতিবাদী, প্রজ্ঞাবান ও যুক্তিবাদী দার্শনিক। মানব কল্যাণে বিশ্বাসী স্ব-শিক্ষিত মাতুব্বর সাহেব একজন সত্যিকারের মানবতাবাদী দার্শনিক হিসেবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

লেখালেখি করতে গিয়ে আরজ আলী মাতুব্বরকে "কম্যুনিজমে"র অপরাধে ফৌজদারী মামলার আসামী হতে হয়েছে। বরিশালের তদানিন্তন ল'ইয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাব্‌লিগ জামাতের আমির এফ, করিম হঠাৎ একদিন তার বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন এবং তাঁকে তাঁর জামাতভূক্ত হবার আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে মাতুব্বর সাহেব বললেন যে, ধর্মজগতের কতগুলো নীতি-প্রথা-সংস্কার ইত্যাদি এবং ঘটনার বিবরণ প্রচলিত আছে, যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নহে এবং এগুলো দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অনেক ক্ষেত্রে বিপরীতও বটে। ধর্ম দর্শন ও বিজ্ঞান এই তিনটি মতবাদের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে চিন্তা করতে যেয়ে আমার মনে কতগুলো প্রশ্নের উদয় হয়েছে। ঐগুলি সমাধানে অক্ষম হয়ে এক বিভ্রান্তির মধ্যে আছি। এ প্রশ্নগুলোর সুষ্ঠু সমাধান পেলে জামাতভূক্ত হওয়া যায়। প্রশ্নগুলি তিনি পাঠ করলেন এবং সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। তার কিছুদিন পরই ফৌজদারী মামলার আসামী হয়ে তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। তিনি বলেছেন কাঠগড়ায় দাঁড়ালেও তাঁর প্রশ্নের জবাব পান নি।

কেহ কেহ মনে করেছেন যে, তিনি ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। কিন্তু তাঁর জেহাদ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, চিৎকার করেন নি, আঘাত করেন নি কারো ধর্ম বিশ্বাসে। তিনি অধার্মিক নন। ধর্মের মধ্যে যে অংশেটি রূপকথা অথবা অতিকথা তাকে তিনি পৃথক করতে চেয়েছেন ধর্ম থেকে।

জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছেন ভেবে ষাট বছরের কর্মজীবন শেষে তাঁর সমস্ত স্থাবরাস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি তাঁর ওয়ারিশদের দান ও বন্টন করে দেন। তারপরও নিষ্কর্ম বসে থাকে নি তিনি। দিন মজুরী করেছে মাঠে মাঠে আমিনরূপে। এক পর্যায় প্রাপ্ত মজুরী অর্থ দিয়ে কিছু জমি খরিদ করেন। ১৯৮০ সালে সেই জমি বিক্রয় অর্থ দিয়ে ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে পল্লী অঞ্চলের জ্ঞানপিপাসু জনগণের জ্ঞানপিপাসা মিটানোর জন্য লামচরী গ্রামে গড়ে তুলেন "আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরী"। লাইব্রেরী নির্মান করতে ব্যয়হ্রাসের জন্য তিনি শ্রমিকদের সাথে ইট বহন করেছেন, মজুরদের সাথে ইট ভেঙ্গে খোয়া বানিয়েছেন । একদিন খোয়া বানাতে গিয়ে বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখটি ছিঁড়ে পরে গিয়েছিল হাতুরীর আঘাতে। প্রতিষ্ঠা কাজে এলাকার মজুরদের সাহায্য পেয়েছেন কিন্তু স্থানীয় বিত্তবানদের কোনরূপ সাহায্য সহানুভূতি পান নি বলে তিনি আক্ষেপ করেছেন। বই কেনার উদ্দেশ্যে এভাবে কায়িক শ্রম করে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করতেন।

আশি বছরের বৃদ্ধাবস্থায় দেহ খাটিয়ে আমিনতী করে যে অর্থ উপার্জন করেন তা সবই জনকল্যাণমূলক কাজে দান করেন। লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করার পর এলাকার গরীব ছাত্রদেরকে পড়াশুনার সাহায্য দেবার জন্য একটি "শিক্ষা ট্রাস্ট" গঠন করেন। ট্রাস্টের সভাপতি পদাধিকার বলে বরিশাল জেলা প্রশাসক। এই ট্রাস্ট হ'তে প্রতি বছর গরীব ছাত্রদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।

মাতুববর সাহেবের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো তিনি জীবিত অবস্থায় লাইব্রেরী ভবনের সামনে একটি পাকা সমাধি নির্মান করেছেন, যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেণ। তাঁর ধারণা লঞ্চডুবি, ট্রেন দুর্ঘটনা ইত্যাদি কারনে এমনভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটতে পারে, যাতে ওয়ারীশগণ তাঁর মৃত্যু দেহ দাফন করার জন্য সুযোগ নাও পেতে পারে। তাই শবদেহটি সমাধিস্থ করার জন্য তাঁর দেহের মৃত অংশ সমূহ যথা- চুল, দাঁড়ি, নখ ও কিছু সংখ্যক দাঁত আনুষ্ঠানিকভাবে তন্মধ্যে সমাধিস্থ করেছেন। এমন দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি। সমাধিটি সমতল স্লাবের উপর আর একখানা চৌচালা স্লাব দ্বারা নির্মিত এবং স্লাবটি নারাচাড়া ও নাম ফলক স্থাপন করার জন্য একটি বাঁকানো রড সংযুক্ত। সমাধিটির নিচ ও চারদিক পাকা

দেয়াল দিয়ে নির্মান করা হয়েছে বলে জনসমাজে বিভিন্ন গুজব ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম দিকে তাই দূর-দূরান্ত থেকে কৌতুহলী দর্শকগণ সমাধিটি দেখতে আসত।

মহত্তর উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর জীবদ্দশায় ছাত্রদের গবেষণায় ব্যবহারের জন্য তাঁর মরদেহ উইল করে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে দান করে গেছেন এবং মৃত্যুর পর তাঁর চোখ দু'টিও চক্ষু ব্যাংকে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ভোগে নয়, ত্যাগেই মানুষ বড় হয়। প্রায় নিঃস্ব মাতুববর সাহেব তাঁর যা-কিছু ছিলো তাঁর সবই মানবকল্যানে দান করেছেন,এমনকি নিজকেও। মানুষকে মানবকল্যাণে ব্যবহারের-এর চেয়ে উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে?

তাঁর সারা জীবনের সাধনা ও পুণ্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ উদীচী, বরিশাল ১৯৮২ সালে মুক্ত চিন্তার অধিকারী যুক্তিবাদী মন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আর প্রগতিশীল মননধারার দিশারী হিসেবে গুণীজন সংবধনা '৮২ প্রদান করেন।

২৪ শে চৈত্র ১৩৮৫ বাংলাদেশ লেখক শিবির গতানুগতিক চিন্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং জীবন ও জগতকে যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে মানবতার অকুণ্ঠ জয়গানের জন্য " হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার" ১৩৮৪ প্রদান করেছেন।

পহেলা বৈশাখ ১৩৯২ সালে বাংলা একাডেমী তাঁকে এক সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছে - বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন-প্রবীণ দার্শনিক, চিন্তাবিদ এবং মননশীল লেখক, আপনার দর্শন, সাহিত্য এবং বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ সমুহ মুক্ত চিন্তাকে অনুপ্রাণিত করে। আপনি সম্পূর্ণভাবে স্ব-শিক্ষিত, কৃষি জীবনের সংগে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত থেকে জ্ঞান চর্চার দিগন্তকে সম্প্রসারিত করেছেন। আপনাকে নববর্ষের এই দিনে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করতে পেরে বাংলা একাডেমী গৌরবান্বিত।

কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমী, একাডেমীর সম্মানিত ফেলোশীপ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যা বাংলা একাডেমীর সচিব জনাব মইনুল হাসান ৩০-১২-৯১ ইং তারিখের ২৯৪/নং পত্রে মাতুব্বরকে অবহিত করেছেন।

চরবাড়ীয়ার কৃতি সন্তান, মহান দার্শনিক, চরবাড়ীয়ার গৌরব, জ্ঞান তাপস ১লা চৈত্র ১৩৯২ বাং তারিখ মৃত্যুবরণ করে আমাদের মাঝে মৃত্যুঞ্জয় হয়েছেন (ইন্না..........রাজেউন)।

ট্রাস্ট

চরবাড়ীয়া ইউনিয়নে "আরজফান্ড", কাজী হাতেম আলী স্মৃতি তহবিল, আফছরউদ্দিন স্মৃতি ট্রাস্ট এবং আব্দুর রহমান সোনাবান বিবি শিক্ষা ট্রাস্ট নামে চারটি ট্রাস্ট আছে।

আরজফান্ডঃ

চরবাড়ীয়ার গৌরব, মানবতাবাদী দার্শনিক, লামচরী গ্রামের বাসিন্দা জনাব আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর দেহ খাটিয়ে, দিন মজুরীলব্ধ উপার্জিত অর্থ হ'তে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ব্যাংকে সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে আমানত রেখে 'আরজফান্ড' নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করেন। এই সংরক্ষিত তহবিলের লভ্যাংশের টাকা হ'তে এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার আনন্দ ও উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তি প্রদান করা হয়। ১৩৮৬ সাল থেকে এই বৃত্তির প্রবর্তন করা হয়। তহবিলের অর্থ বৃদ্ধি পাইলে উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা নির্দ্ধারিত নিয়মে বৃত্তি দানযোগ্য বিদ্যালয় সংখ্যা বাড়ানো যাবে। এই ফান্ডের বিষয় ট্রাস্টনামা নামীয় রেজিষ্ট্রীকৃত দানপত্র দলিল জনাব আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর জীবদ্দশায় সমাধান করে গেছেন। মাতুব্বরের জন্ম মাস পৌষের শেষ রবিবার বৃত্তি প্রদানের দিনও ধার্য করে গেছেন। ১৯৭৯ সালে দু'টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বৃত্তি প্রদান করা হয়। ১৯৮০ সালে পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের চরমোনাই (মাদ্রাসা) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ তিনটি বিদ্যালয় বৃত্তি প্রদান করা হয়।

এই তহবিলের স্থায়ী সভাপতি হলেন, পদাধিকার বলে মাননীয় বরিশাল জেলা প্রশাসক এবং অন্যতম সদস্য হলেন অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির, অধ্যাপক মোঃ হানিফ এবং কোষাদক্ষ চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোশাররফ হোসেন মাতুব্বর। ১৯৮৫ সালে জনাব আরজ আলী মাতুব্বরের মৃত্যু পর পরিচালনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। পরিচালনা কমিটির সম্মানিত সদস্য অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির এবং কোষাদক্ষ জনাব মোশাররফ হোসেন মাতুববর ইতোমধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছেন (ইন্না............রাজেউন) । বর্তমানে ট্রাস্টের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে বলে জানা যায়।

কাজী হাতেম আলী স্মৃতি তহবিল

সাপানিয়া নিবাসী মরহুম কাজী হাতেম আলী সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। বড় মেয়াছাব হিসেবে বহুল পরিচিত। দীর্ঘদিন যাবত চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের পবিত্র ঈদুল ফেতর এবং ঈদুল আহযার বৃহৎ জামাত অনুষ্ঠিত হতো কাগাশুরা

উচ্চ বিদ্যালেয়র সম্মুখ ঈদগাহ মাঠে। আজীবন এই বৃহৎ জামাতে ইমামতি করেছেন কাজী হাতেম আলী সাহেব। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রেরণায় এলাকার বহু গরীব ছেলে-মেয়ে শিক্ষার আলো পেয়েছেন। চরবাড়ীয় ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আলী খান তাঁর বেয়াই ছিলেন। তিনি ও তাঁর বেয়াই মিলিত প্রচেষ্টায় কাগাশুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সুযোগ্য সন্তান অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের প্রথম এম, এ, পাস করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

এলাকাবাসীসহ তাঁর সুযোগ্য ছাত্রগণ তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে কাগাশুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ১৯৮০ সালে গঠন করেন কাজী হাতেম আলী স্মৃতি তহবিল। ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা মূলধন নিয়ে সংরক্ষিত তহবিল গঠন করা হয়। মূলধন বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। তহবিল সংগ্রহের জন্য কোন সাহায্য চাওয়া হয় না বলে এটাকে বোবা তহবিল হিসেবে ধরা যায় । তবে যদি কেহ নিজে উৎসাহী হয়ে সাহায্য করেন সেটা গ্রহণযোগ্য। প্রতি বছর কোরবানী ঈদের পরে দিন বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন অনুদান হিসেবে অর্থ সংগ্রহ হয়ে থাকে। চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের প্রায় সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মাসিক হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রথম দিকে সীমিত থাকলেও আস্তে আস্তে এর কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এই তহবিল হতে প্রায় ১৮টি বৃত্তি প্রদান করা হয়।

আফছার উদ্দিন স্মৃতি ট্রাস্ট

চরবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এককালের মেধাবী ছাত্রী জনাব শিরিন আকতার তার পিতা জনাব খন্দকার আফছারউদ্দিন-এর নামে ১৯৯২ সনে এ ট্রাস্ট গঠন করা হয়। জনাব আফছার উদ্দিন চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের প্রথম দিকে বি, এ, পাস করার কৃতিত্ব অর্জনকারী একজন সুযোগ্য ব্যক্তি। সরকারী চাকরি করে বর্তমানে অবসর গ্রহণ করেছেন। শিরিন আকতার ব্যক্তিগতভাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান করে সংরক্ষিত তহবিলের মাধ্যমে এই ট্রাস্টের তহবিল গঠন করেন। সংরক্ষিত তহবিলে হতে প্রতি বছর প্রাপ্ত লভ্যাংশ থেকে এলাকার গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়। গরীব ছাত্রদের এস, এস, সি পরীক্ষার ফি'র বিষয়টি সবচেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। চরবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই ট্রাস্টের কার্যক্রম চলছে। প্রতি বছর নভেম্বর মাসে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান করা হয় ।

আব্দুর রহমান সোনাবান বিবি শিক্ষা ট্রাস্ট

চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের কৃতি সন্তান বি, সি, এস পরীক্ষায় ইউনিয়নে প্রথম কৃতিত্ব অর্জনকারী ও প্রথম প্রশাসনিক কাডারের কর্মকর্তা জনাব এম, এ, শুকুর তার পিতা এলাকার ছোট মিয়াছাব হিসেবে খ্যাত মুন্সী আঃ রহমান ও মাতা সোনাবান বিবির নাম অনুসারে ১৯৯৫ সাল থেকে এই ট্রাস্ট গঠন করেন। এটি কাজী হাতেম আলী স্মৃতি তহবিলের একটি সম্পূরক তহবিল। ট্রাস্টের তহবিলের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে পারিবারিকভাবে ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রদান করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৫,০০০/-(পনর হাজার)টাকা প্রদান করেন এবং পর্যায়ক্রমে এক লক্ষ টাকায় উন্নীত করে তহবিলের কলেবর বৃদ্ধি করা হবে। তহবিলে লভ্যাংশ হতে প্রতি বছর ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকার বই এলাকার গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিতরণের মধ্য দিয়ে ট্রাস্টের কার্যক্রম শুরু করা হয় । মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বই বিতরণ করা হয়। ট্রাস্টের কার্যক্রম বর্তমানে সীমিত থাকলেও পর্যায়ক্রমে প্রসারিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যেই বাৎসরিক খরচ ৭,০০০/- টাকায় উন্নিত করে শ্রেণীভিত্তিক ১ম ও ২য় স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ।

১৯৯৫ সাল থেকে কাগাশুরা গ্রামে ক্ষুদ্র-লোন প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প চালু করেছেন জনাব এম. এ. শুকুর । গরীব, দিনমজুর, শ্রমিকদের সহজ শর্তে এই প্রকল্প থেকে লোন প্রদান করা হয়ে থাকে। বাৎসরিক মাত্র শতকরা দশ ভাগ সার্ভিস চার্জ ভিত্তিক তদারকীপূর্ণ এ ক্ষুদ্র প্রকল্প এলাকার খেটে খাওয়া লোকদের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে বলে জানা গেছে। এলাকাভিত্তিক এর প্রচলন কাম্য।

ধমীয় প্রতিষ্ঠান

মোগল আমলে প্রায় দু'শ' মসজিদ নির্মিত হয়েছে বরিশালে । ১৮ শতকে শিয়া প্রভাবে এ অঞ্চলে শতাধিক জোড়-মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং এ মসজিদ এক গম্বুজ বিশিষ্ট। কারুকার্য বিহীন ছাঁদ খানজাহান আলীর স্থাপত্যের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। শাহ সুজা মগদের দমন করে ভূমি ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করেন। তিনি বাকলা চন্দ্রদ্বীপে কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদগুলো এক গম্ভুজবিশিষ্ট। কথিত আছে তার সাথে নেয়ামত শাহ নামে এক দরবেশ বাক্‌লায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে আসেন। এ ছাড়াও বহু নাম নাজানা পীর দরবেশ এ অঞ্চলে ধর্ম প্রচারে আসেন এবং পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং এই অঞ্চলেই থেকে যান।

চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের প্রাচীন আমলের তিনটি মসজিদের স্মৃতি পাওয়া গিয়েছে। একটি ভাটিখানা জোড় মসজিদ হিসেবে পরিচিত। মসজিদটি বর্তমানে মেরামত করে দু'টি মসজিদকে একত্র করে একটি মসজিদ করা হয়েছে।

উলালঘুনি বিশ্বাস বাড়ীর দরজায় এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ আছে। এ মসজিদটিও সময়মত মেরামত করায় মসজিদটি অক্ষত অবস্থায় বর্তমানে আছে। এ মসজিদটিকে কেন্দ্র করে এখানে একটি মদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অপর মসজিদটি সাপানিয়া আইনউদ্দিন ফকির বাড়ীতে অবস্থিত। সময়মত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মসজিদটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কিছুদিন আগে মূল মসজিদটি ভেংগে ফেলে একটি সাধারণ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কোন প্রকার নামাজ আদায় করা হচ্ছে। এলাকার জনসাধারণ খুব গরীব এবং সঠিক তত্ত্বাবধানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদগুলো আকারে খুবই ছোট।

কাগাশুরা হাজী বাড়ীর সামনে নির্মিত মসজিদটি বেশ পুরনো আমলে তৈরী।

চরবাড়ীয়া ইউনিয়নে বর্তমানে সবচেয়ে বৃহৎ মসজিদ 'তালতলী জামে মসজিদ'। চরবাড়ীয়া মৌজায় জনাব এন্তাজউদ্দিন এর বাড়ীর সামনের এ মসজিদটি তালতালীতে স্থানান্তর করা হয়। সম্ভবতঃ ১৯৪০ সালে এই মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনবার সর্বনাশা তালতলী নদীতে ভাঙ্গনের পর বর্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমান স্থানে মসজিদের অনুকূলে ১২ শতাংশ জমি আছে। পেয়দা বাড়ীর জনাব গফুর পেয়দা একমাত্র ছেলে জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার (লেখকের মামা) এবং তাঁর ৩ বোন জমির দানপত্র প্রদান করেন। দীর্ঘদিন এ মসজিদে ইমামতি করেছেন মুন্সী আলী আজিম খান । এরপর ইমামতি করেছেন জনাব মাওলানা আঃ খালেক সাহেব, সহকারী শিক্ষক চরবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ১৯৭১ সাল থেকে প্রতি বছর তারাবির নামাজ পড়াতেন হাফেজ কারী মাওলানা আব্দুল খালেক সাহেব। ১৯৭৪ সাল হইতে তাঁকেই মসজিদের নিয়মিত ইমাম হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি তিনি কর্মরত আছেন। মাহ্‌মুদিয়া মদ্রাসা থেকে হাফেজ ও এলমে কেরাত এবং হাটাজারী মদ্রাসা থেকে দাওরা হাদীস পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। বর্তমানে খেলাফত প্রাপ্ত। বাংলাদেশের জবানার দ্বীণই উজ্জ্বল নক্ষত্র, ইমামে তরীকত, পীর-এ কামেল হযরত মাওলানা সুলতান আহম্মদ নানুপুরী সাহেব ১৯৮১ সনের রমযান মাসে খেলাফত দান করেন। সিস্তিয়া ছাবেরীয়া তরিকায় খেতমত করার এজাজত দান করেন। বর্তমানে সারা দেশে তাঁর শত শত মুরীদান আছেন।

জনাব কদম আলী হাওলাদার, জনাব হুচান্ আলী খান, আব্দুল ওহাব খান, জনাব দলিল উদ্দিন হাওলাদার, জনাব জেন্নাত মাস্টার, জনাব মজিদ মাস্টার, জনাব

আক্রাম গাজী, জনাব গোপাল খান, জনাব জোনাব আলী খান মসজিদ পরিচালনা কমিটির উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন। বর্তমানে মসজিদ কমিটির সভাপতি হলেন জনাব আঃ আজিজ মিয়া এবং সেক্রেটারী ডাঃ সৈয়দ জাফর আলী । বর্তমানে মসজিদের উন্নয়ন কাজ চলছে।

বহু বুজর্গেনদীন বিভিন্ন সময় এই মসজিদে তসরিফ আনেন । তাঁরা হলেনঃ-

- হযরত মাওলানা মহম্মদ মোস্তফা আল মাদানী , বরিশাল।
- হযরত মাওলানা সামসুল হক সাহেব, ফরিদপুরী।
- হযরত মাওলানা সফিউল্লাহ সাহেব, চানপুরী ।
- হযরত মাওলানা সুলতান আহমেদ সাহেব, নানুপুরী, চট্রগ্রাম।
- হযরত মাওলানা মহম্মদ উল্লাহ সাহেব, হাফেজী হুজুর, ঢাকা।
- হযরত মাওলানা ফজলুল করিম সাহেব, পীর সাহেব, চরমোনাই।
- হযরত মাওলানা জাফর আহমেদ সাহেব, জৈনপুরী ।
- হযরত মাওলানা আজিজুল হক সাহেব, সাইখুল হাদীস, ঢাকা।
- হযরত মাওলানা আব্দুল হক আব্বাসী, গোয়ালন্দ, ফরিদপুর।

পুরাকীর্তি

পুরাকীর্তি মানব সভ্যতার মুকুর বিশেষ। তাই মুকুরে যেমন তার অতীত প্রতিফলিত হয়, তেমনি ভবিষ্যতের পথও নির্দেশ করে। পুরাকীর্তি যে-কোন জাতির অতীত গৌরব সামনে তুলে ধরে। তার গতিতে যেমন প্রাণ সঞ্চার করে অন্য দিকে তাকে নতুন আশায় উদ্বুদ্ধ করে তার পথ চলাকে সহজ করে তোলে। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা সহজেই এই বক্তব্যের সারবত্ত্বা ও যথার্থতা বুঝতে পারি।

পুরাকীর্তির প্রাচীন দালান-কোঠা, দীঘি, মুদ্রা, মূর্তি, সমাধি, মন্দির, গীর্জা অন্তর্ভূক্ত। আমাদের ইউনিয়নে তেমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

শায়েস্তাবাদের রাজাপুর গ্রামে ৩৬০টি দীঘি ছিলো। অনেক আগে তালতলী নদীতে ভেঙ্গে গেছে।

মুকুন্দপট্টি গ্রামের পূর্ব-উত্তর কোণে নীলকরদের ১টি কুঠিবাড়ী ছিলো। যতদূর জানা যায় এ অঞ্চলে নীল চাষ হতো এবং নীল কঠিয়ালদের বাসস্থান হিসেবে এ কুঠিবাড়ী ব্যবহৃত হতো। ষাট দশক পর্যন্ত কুঠিবাড়ীর নিদর্শন স্বরূপ ধ্বংসাবাশেষ দেখা গিয়েছে। কুঠিরের ও পুকুর ঘাটের ইট, সুরকী এলাকার বাসিন্দারা তুলে নিয়ে গেছে। বর্তমানে পুকুরটিও ভরাট হয়ে গিয়েছে। কুঠিবাড়ীর উত্তর পাশ সংলগ্ন খালটি কুঠির খাল নামে পরিচিত। এই গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে নীলখোলার দীঘিটি আজও বিদ্যমান।

তালতলীর অদূরে কাগাশুরা গ্রামে মঠবাড়ীয়া নামে একটি বিরাট দূর্গ ছিলো। প্রাচীন দালান-কোঠা ছিলো এখানে। এখানে সেনাবাহিনী ছিলো এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। দূর্গটি হতে এ অঞ্চলের রাজা-বাদশাদের দরবারের সাথে সড়ক পথে যোগাযোগ ছিলো। পঞ্চাশ ও ষাট দশকে দূর্গটি নদী ভাঙ্গনে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। দূর্গটি ভাঙ্গনের সময় বহু প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। হিন্দু ধর্মের ব্যহৃত বিভিন্ন বাসন-কোসন ও পাত্র সহ প্রচুর ইট পাওয়া গিয়েছে।

একটি বিরাট স্বম্ভও পাওয়া গিয়েছে। স্তম্ভটি প্রথমে তালতলী বন্দরে এবং পরবর্তীতে বি, এম, কলেজের সামনে রাখা হয়েছিলো। বর্তমানে ঢাকা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ মনে করেন যে, নবম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্যের আর্বিভাবের পর হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণকালে ভারতের চারিদিকে সনাতন ধর্মের এলাকা নির্দিষ্ট করে তিনি যে চারিটি স্বম্ভ নির্মাণ করেছিলেন সম্ভবতঃ সেই স্তম্ভগুলোর দক্ষিণ দিকের স্তম্ভ ছিল মঠবাড়ীয়ার সেই স্তম্ভটি। কেউ বলেন যে, এলাকায় হিন্দু ও বৌদ্ধদের অধিপত্যকে কেন্দ্র করে এই স্তম্ভটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। আসলে কোণ বক্তব্যটি সত্য আজও বুঝা যাচ্ছে না। আরো একটি বড় পাথর পাওয়া গিয়াছে। পাথরটি তালতলী মসজিদের সামনে রক্ষিত ছিলো। তালতলী মসজিদটি নির্মানের জন্য সরানো হলে পাথরটি ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষণ করা হয়।

মঠবাড়ীয়াকে কেন্দ্র করে বহু কল্প-কাহিনী এ অঞ্চলে শোনা যায়। কথিত আছে যে, এক হিন্দু রাজা বিরাট এক দীঘি খনন করেন। জন্মের পরে মায়ের দুধ খেয়ে যে ঋণ তাঁর কাছে হয়েছে, সে ঋণকে পরিশোধের জন্য দীঘিতে প্রচুর দুধ ঢেলে দেয়া হয়। এর ফলে দীঘির একপাড় ভেঙ্গে নদীর সাথে মিলিত হয়ে দুধ নদীতে চলে যায় এবং নদীর ভাঙ্গনের কবলে পড়ে। দীঘিটি পরে নদীতে বিলীন হয়ে যায়। এ দীঘিকে দুধপুকুর বলেও অনেকে বলতো। জন্মদাতা বাবার ঋণ পরিশোধের জন্য একটি বড় মঠ তৈরী করেন। মঠটি তৈরী শেষ হবার পরেই মাটির নীচে ডেবে যায়। পরবর্তীতে নদী ভাঙ্গনের সময় উক্ত মঠের ইটসহ মালামাল পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এগুলো কল্পকাহিনী ছাড়া আর কিছুই না।

দীঘি

প্রাচীন বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে মোগল আমলে প্রায় দু'হাজার দীঘি ছিলো। পুরান দীঘিকে অঞ্চলিক ভাষায় অনেক সময় আন্দিও বলা হয়। শায়েস্তাবাদের রাজাপুর গ্রামে তিন শ' ষাটটি দীঘি ছিলো। অনেক আগে তালতলীর নদীতে ভেঙ্গে গেছে। দীঘি সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় কমলার দীঘি এবং দূর্গাসাগর দীঘির কথা। দীঘি খনন এবং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন কাল্পনিক কাহিনী বিরাজমান। প্রাচীন বাক্‌লা ও চন্দ্রদ্বীপ

যাঁরা শাসন করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই জনকল্যাণমূলক কাজ হিসেবে দীঘি খনন করেছেন। প্রাচীন কালে নদী ও খালের পানি লবনাক্ত ছিলো। পানীয় ব্যবহার জন্য নলকূপের কোন ব্যবস্থা ছিলো না। তাই প্রায় বিভিন্ন প্রকার রোগ মহামারীর প্রাদুর্ভাবে অসংখ্যক জনসাধারণ মারা যেত। জনসাধারণের জন্য কল্যাণমূলক কাজের মধ্যে সর্ববৃহৎ ছিলো বড় বড় দীঘি খনন করা। রাজকার্য যাঁরা পরিচালনা করতো তাঁরা বড় বড় দীঘি খনন করে জনসাধারণের মাঝে অমর হতেন। বরিশাল জেলার ইতিহাসে দেখা যায় প্রচুর দীঘি খনন করা হয়েছে এ এলাকায়। দীঘিগুলো আজ আর নেই। ভরাট হয়ে গেছে। বর্তমানে এতে কৃষি কাজ হচ্ছে। নদী ভাংগনে বিলীন হয়েছে অনেক প্রখ্যাত দীঘি। দীঘিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে বহু কল্পকাহিনী। রানী কমলাদেবীর দীঘি এবং দূর্গাসাগরের দীঘি এ এলাকায় আলোচিত দীঘি।

চরবাড়ীয়া ইউনিয়নে ৩টি দীঘি আছে। মতাসার, নীলখোলা ও মিয়ার দীঘি। মতাসার গ্রামে মতা নামে এক ব্যক্তি বসবাস করতেন। হঠ্যাৎ তিনি অনেক টাকা-পয়সার মালিক হন। একদা স্বপ্নে দেখলেন তিনি যেন একটি দীঘি খনন করেন। তাই ঠিক করলেন দীঘি খনন করার। দেশী-বিদেশী বহু লোকজন খবর দেয়া হলো। কয়েক মাস মাটি কেটে দীঘি কাটা হলো। সারাদেশে সারা জাগলো। বিরাট উঁচু পাড় তৈরি হলো। দীঘি কাটতে লাখ লাখ টাকা খরচ হলো কিন্তু দেখা গেল দীঘিতে পানি উঠছে না। সবাই আশ্চর্য হলেন কি ব্যাপার ? মতা চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। বিভিন্ন গণক ডেকে জিজ্ঞেস করা হলো। কাঙ্গালী ভোজ দেয়া হলো কিন্তু দীঘিতে তবুও পানি উঠলো না।

তিনি পুনরায় স্বপ্নে দেখলেন, যদি তিনি লাল ঘোড়ার পিঠে চড়ে পুকুরের ভেতর চারিদিক সাত বার প্রদক্ষিণ করেন তাহলে দীঘিতে পানি উঠবে। মতা লাল ঘোড়া নিয়ে দীঘিতে নামলো। বহু লোকজন পাড়ে জমায়েত হলো। ঘোড়ার দৌঁড় শুরু করলো। হঠ্যাৎ চারিদিক থেকে পানি আসছে। পানির ভেতর ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। পাড়ের নিকটস্থ লোকজন তাকে উঠে আসবার জন্য বললো কিন্তু তিনি উঠে আসতে পারলো না। পানিতে দীঘি পূর্ণ হয়ে গেল এবং ঘোড়াসহ তিনি আস্তে আস্তে দীঘির পানিতে ডুবে গেলেন। কথিত আছেন দীঘির পাড় ভেঙ্গে তিনি ঘোড়াসহ নদীতে গঙ্গাদেবীর কাছে চলে গেছেন। এই চলে যাবার পথটিই মতাসার খাল হিসেবে পরিচিত। মতার নাম অনুসারে নাম রাখা মতাসার দীঘি এবং খালের নামও মতাসার খাল হয়েছে। এই কাহিনী এবং মতা ও ঘোড়ার মৃত্যুর ঘটনা আসলেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। মতা দীঘি খনন করেছে এটা ঠিক এবং মারা গেছেন এটাও হয়তো ঠিক। মতা যখন ঘোড়া পিঠে চড়ে দৌড়াচ্ছেন সম্ভবতঃ এ সময় দুষ্ট লোকেরা দীঘির একপাড় কেটে দেন এবং দ্রুত পানি চলে আসায় ঘোড়া ভীত হয়ে দ্রুত দৌঁড়াতে থাকলে পিঠ থেকে পড়ে

তিনি হয়তো মারা যান। হঠ্যাৎ মতার এ সলিল সমাধির এ ঘটনা নিয়ে হৃদয়বিদায়ক এক কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে পাড় উঁচু থাকলেও দীঘিটি মাটিতে ভরাট হয়ে চাষাবাদযোগ্য।

কাগাশুরা ও মুকুন্দপট্টি গ্রামে ইংরেজ আমলে নীল চাষ হতো। মুকুন্দপটি নীলকরদের ১টি কুঠি ছিলো। সম্ভবতঃ নীলখোলা দীঘিটি তারাই খনন করেছিলো। তাই নীলকরদের নাম অনুসারেই নীলখোলার দীঘি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

সাপানিয়া গ্রাসে মতলেব নাজির-এর বাড়ীর উত্তর পাশে মিয়ার দীঘি নামে একটি দীঘি আছে। বাখরগঞ্জ জেলার মিয়াজান নাজির-এর নামে অনুসারে এ দীঘির নাম মিয়ার দীঘি হয়েছে বলে জানা যায়। বর্তমানে দীঘিটি খনন করা হয়েছে। এছাড়া উলালঘুনি বিশ্বাস বাড়ীর দীঘিটি বেশ বড় দীঘি ।

তালতলী বন্দর

তিন দিকে নদীবেষ্টিত চরবাড়ীয়া ইউনিয়ন। ইউনিয়নের সাথে বরিশাল শহরের যোগাযোগ নদীপথ ছাড়া একটি মাত্র পাকা রাস্তা। রাস্তাটি শায়েস্তাবাদ সড়ক হিসেবে নাম থাকলেও তালতলী রাস্তা হিসেবেই সবাই মনে করে। শায়েস্তাবাদ জমিদার বাড়ীর সাথে এবং বরিশাল শহরে সাথে এই সড়কের যোগাযোগ বিধায় শায়েস্তবাদ সড়ক নামকরণ করা হয়েছে। পূর্ববাংলায় জমিদারী প্রথায় বৃটিশ আমলে প্রায় সবাই ছিলো হিন্দু জমিদার। মুসলিম জমিদারদের মধ্যে শায়েস্তবাদের জমিদারদের নাম এ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য ছিলো। এই জমিদার বাড়ীই হলো বাংলার প্রথম মুসলিম বরণ্য কবি এবং নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম সুফিয়া কামালের নানী বাড়ী। বেগম সুফিয়া কামালের বাল্যকাল কেটেছে এই শায়েস্তাবাদেই। বহু কবিতা রচনা করেছেন, কবি এখানে বসেই। জমিদার বাড়ীর শিক্ষিত গুণীজন তৎকালে তালতলী হতে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে বরিশাল শহরে যাতায়াত করতেন। জমিদার বাড়ী নদী ভাঙ্গনে আজ বিলীন।

রিকসা গাড়ী প্রচলনের পূর্বে পায়ে হেঁটে সাধারণ মানুষ শহরে বিভিন্ন কাজে যেত। তালতলী বন্দরে অল্প কয়েক খানা ঘোড়ার গাড়ী চলতো। তৎকালে এই ঘোড়ার গাড়ীতে করেই ইলিশ মাছ শহরে বহন করা হত। বর্তমানে যে স্থানটিতে মসজিদ ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার এককোণেই ছিলো পেয়াদাবাড়ীর ঘোড়ার আস্তাবল। ঘোড়ার গাড়ীর মালিক ছিলো গফুর পেয়াদা, মজিদ পেয়াদা (লেখকের নানা) ও ছত্তার পেয়াদা এবং কাছেম আলী। তার কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না আজ। সে যুগে নদী পথে শুধু রকেট ব্যতীত কোন যাত্রীবাহী লঞ্চ ছিলো না, ছিলো না সড়ক পথে কোন মটরগাড়ী। ঢাকা বরিশাল খুলনা হয়ে কোলকাতার পথে শুধু স্টীমার সার্ভিস চালু ছিলো। এই স্টীমারের যাত্রীরা তালতলী বাজারের ঘাঁট দিয়ে ওঠা-নামা করতো।

বাবুগঞ্জ, হিজলা, মুলাদী, পাতারহাট (মেহেন্দিগঞ্জ) ও পালরদি (গৌরনদী) থানার সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হলো নৌকা এবং গয়না। গয়নাই ছিলো সে যুগে আরামদায়ক বাহন। এটা ছিল এমন নৌকা যা চালাতে ৮/১০ জন মাঝির প্রয়োজন হতো। আকারে বিরাট এক ঘরের মত। সাধারণতঃ সন্ধ্যায় যাত্রীগণ গয়নায় উঠে ঘুমিয়ে থাকতো, আর সারারাত মাঝীমাল্লাগণ দাঁড় বেয়ে, গান গেয়ে সকালে এসে তালতলী ঘাটে পৌঁছত। শহরে কোর্ট-কাছারীতে মামলা চালাতে, উকিলের সাথে পরামর্শ করতে এবং বড় ধরণের কিছু কেনা-কাটা করতেই শহরে আসা হতো।

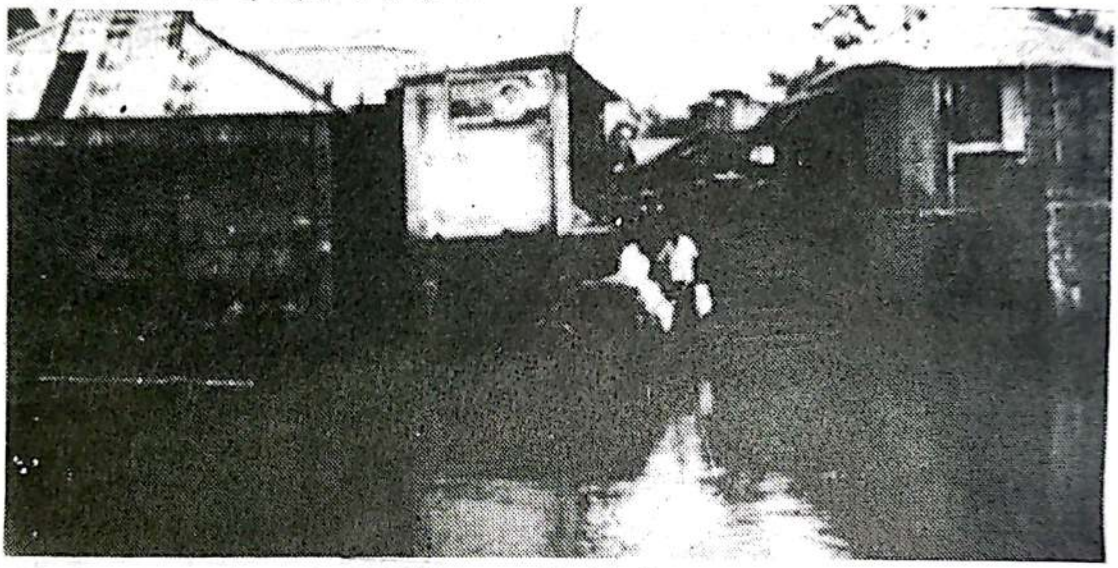

তালতলী বাজার ঘাট ❑ ছবি লেখক

তালতলী হতে পালরদীর গয়না লাইনটি ছিলো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। শরিকল, ছবিপুর, খাসেরহাট ও কাজিরচর থেকেও গয়ণা আসত। সন্ধ্যায় পালরদি থেকে যাত্রী নিয়ে গয়না তালতলীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে পরের দিন সকাল ৯/১০ টায় দিকে তালতলী এসে পৌঁছত। অনেক যাত্রীই তাদের রাতের ও ভোরের খাবার সাথে নিয়ে আসতো। এই সমস্ত গয়না প্রায়ই জলদস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হতো। একবার এমনিভাবে ডাকাতি সংঘটিত হলো যে, পাষন্ড ডাকাতরা ৮/১০ জন যাত্রীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই গয়ণাটি যখন তালতলী এসে পৌঁছায় এবং এক এক করে গয়না থেকে রক্তাক্ত লাশগুলো উপরে উঠানো হলো, তা দেখে কেউই চোখের পানি সংবরণ করতে পারে নি। এই ডাকাতি ছিলো তৎকালে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এ ঘটনা নদী পথে চলাচলে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এ ডাকাতির পর থেকেই আস্তে আস্তে গয়না চলাচল বন্ধ হতে থাকে এবং ইতোমধ্যেই বরিশাল হতে ফরিদপুর হয়ে খুলনা পর্যন্ত সি, এন্ড, বি'র মহাসড়ক চালু হয়। নদী পথেও কিছু কিছু একতলা লঞ্চ চালু হওয়ায়, গয়না প্রচলন একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

উত্তরাঞ্চলের সকল মানুষের চলাচলের জন্য তালতলী ছিলো একমাত্র নির্ভরযোগ্য পথ। এই অঞ্চলের সব মানুষের কাছেই তালতলী এলাকার মানুষ অতি পরিচিত ও প্রাণের মানুষ। নদী সমূহে যে সমস্ত মাছ ধরা হত তা তালতলী হয়ে শহরে যেত। এ অঞ্চলের তরিতরকারীসহ সমস্ত মালামাল এবং শহর থেকেও ঐ সমস্ত এলাকায় যে-সমস্ত মালামাল প্রয়োজন হয় তা তালতলী হয়েই আসা-যাওয়া করে থাকে। এ কারণেই তালতলী গড়ে ওঠে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজাররূপে। বর্তমানে সব সময় বাজারটি চালু থাকে। সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার দু'দিন হাট বসে। বর্তমানে বাজারে কয়েকটি স্টল নির্মিত হয়েছে। রাস্তাটি পিচ ঢালাই হবার পর এবং রিকসা গাড়ীর প্রচলন হওয়ায় বাজারের গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। তালতলী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করেই প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় যাত্রাগান, জারীগান, লাঠিখেলা ইত্যাদি। স্থানীয় যুবকদের উদ্দ্যোগে প্রতি বছর ২/১টি নাটকও মঞ্চস্ত হয়। ষাট দশকে চরবাড়ীয়া আজাদ ক্লাব ও পাঠাগারের উদ্যোগে নাটক মঞ্চস্থ হতো। স্বাধীনতার পর মিতালী যুবসংঘের উদ্দ্যেগে প্রায় প্রতি বছরই নাটক মঞ্চস্থ হতো। জবাবদীহি, সূর্যমূখী, রিক্সাওয়ালা, একটি পয়সা, কেদার রায়, পল্লীমঙ্গল, পল্লীশোষক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অভিনয় করতেন নান্নু, হারুন, জব্বার, ছত্তার, দুলাল, জুলফিকর, সামচু, নয়ন, কাজী নূরুল ইসলাম, মন্নান, মোতালেব, জব্বার খাঁ, আলম প্রমুখ। মিতালী

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী গনকবর জিয়ারত ❑ ছবি লেখক

যুব সংঘের উদ্যোগে ১৯৭৪ সালে বন্যা দুর্গতদের সাহায্যের জন্য বরিশাল টাউন হলে "রিক্সাওয়ালা" নাটক মঞ্চস্থ করে প্রচুর সুনাম অর্জন করে। পালিত হয়ে থাকে স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ২১শে ফেব্রুয়ারিসহ বিভিন্ন জাতীয় কার্যক্রম সমূহ। বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় লাঠিখেলা, জারীগান, বিচিত্রানুষ্ঠান। ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রতি বছরই হয়ে থাকে। ফুটবল খেলা পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা রাখেন সাবেক চেয়ারম্যান ও চরবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব মজিবুল হক ।

১৯৬২ সালে প্রচন্ড এক ঘূর্ণিঝড় হয়। এ ঘূর্ণিঝড়ে তালতলী বাজারের পশ্চিম পাশে জোনাব আলী খানের বাড়ীর সামনে ঢাকা থেকে বরিশালগামী একটি দোতলা লঞ্চ নদীর তীরে কাত হয়ে পড়ে । পাটের ছালা (বোস্তা) বোঝাই দু'টি প্লাট ও খালী দু'টি ফ্লাট নদীতে ডুবে যায়। এতে কোন লোক মারা যায় নি। লঞ্চটি এবং খালী দু'টি ফ্লাটকে কর্তৃপক্ষ তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু অন্য দু'টি জাহাজকে চেষ্টা করেও তোলা সম্ভব হয় নি। ফ্লাটে রক্ষিত ছালাগুলো ছুটে সমস্ত নদীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং কর্তৃপক্ষ এ এলাকার লোকদেরকে দিয়ে সংগ্রহ করে নিয়ে যায় । বস্তা সংগ্রহের কাজে নেতৃত্ব দেন জোনাব আলী খান। এ কাজে এলাকার লোকেদের অর্থের সংকুলন হয়। ডুবে যাওয়া জাহাজ দু'টির উপর বর্তমানে চর পড়ে গেছে। ১৯৬৫ সালের মে মাসে বরিশাল জেলার উপর দিয়ে ১০০ মাইল বেগে এক প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বহুলোক নিহত হয়। প্রায় ৯০ভাগ ঘর-বাড়ী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিলো। ঝড়ে লেখকের ঘর-বাড়ী বিধস্থ হয় ও ১টি হালের গরু মারা যায়। তালতলী নদী তীব্র খরস্রোত ছিলো। তীব্র স্রোতে মালবোঝাই অনেক নৌকা ডুবে যেত।

১৯৬৫ সালে কাশ্মিরকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের সীমানায় ভারতের বহু বাণিজ্যিক জাহাজ আটকা পড়ে। আটককৃত এ জাহাজগুলো তালতলী নদীতে বেঁধে রাখা হয়। অধিকাংশই ছিলো মালবাহী কার্গো বা ফ্লাট/বার্জ। এ জাহাজগুলোর মধ্যে একটি ছিলো অত্যাধুনিক বিদেশী জাহাজ। জাহাজটিতে ছেলে-মেয়েসহ একটি বিদেশী পরিবার বসবাস করতঃ। তারা প্রায়শঃই স্পীড বোট নিয়ে নদীতে ঘুরে বেড়াত। এ দৃশ্য এবং জাহাজগুলো দেখতে দূর-দুরান্ত থেকে বহু দর্শনার্থী আসতো। চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের পূর্বদিকে শায়েস্তবাদ ইউনিয়নের ভেতর দিয়ে একটি খালে হঠাৎ করে নদীর পানি ঢুকে ব্যাপক স্রোতের সৃষ্টি হয়। এ স্রোতের ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই খালটির দু'তীর ভেংগে বাড়ীঘরের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে দু'টি নদীর সংযোগ হয়ে যায়। এ সংযোগ স্থানটির নাম হলো 'ঝুণাহার'। ফলে পশ্চিম দিকে তালতলী নদীর স্রোত কমে যায় এবং দু'তীর ভাঙ্গন থেকে রেহাই পায়। তালতলী বাজারটিও ভাঙ্গন থেকে রেহাই পেয়ে স্থায়ীত্ব লাভ করে।

ষাট দশকে তালতলী বন্দরে বরুয়ার বাপ, হাশেম আলী মোল্লা, মৌজে আলী হাং, জোনাব আলী খান, বন্দে আলী খাঁ, ধলু মীর ও মজিদ মাস্টারের দোকান ছিল। বর্তমানে তালতলীতে ঔষদের দোকান ৫টি, হোমিও ডাক্তার খানা ৩টি, মুদিদোকান ২০টি, চায়ের দোকান ৬টি, হোটেল ৩টি, পানের দোকান ১৫টি, কাপড়েরর দোকান ৩টি, ষ্টেশনারী ৪টি, জুতার দোকান ১টি, টিনের দোকান ২টি, সার-কীটনাশক দোকান ১টি, টেইলার ৬টি, রিকসার গ্রেজ ৭টি, স্ব-মিল ৪টি, ধান ও গম ভাঙ্গার মিল-৪টি, সেলুন ৩টি এবং ফার্নিচারের দোকান ৪টি।

আমিরগঞ্জ হাট

এ অঞ্চলের সবচেয়ে পুরাতন হাট আমিরগঞ্জ । ব্রিটিশ আমলে জমিদারী প্রথায় দাঁড়িয়াল নিবাসী আমির আলী মিয়া বাটনা এলাকাসহ এতদাঞ্চলের জমিদারী লাভ করেন। খাজনা উঠানোর কাছরীঘর ছিলো নদীর সন্নিকটেই। এটাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীগণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পাটের ব্যবসায় জমজমাট ছিলো এখানে। ধান, চাল, সুপারীসহ কাঁচা মালের ব্যবসা ছিলো। আমির আলী মিয়া এটাকে হাটে রূপান্তরিত করেন এবং তাঁর নাম অনুসারে আমিরগঞ্জ হাট হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। আস্তে আস্তে হাটটি এতদাঞ্চলে বেশ প্রসিদ্ধ লাভ করে। আমিরগঞ্জ হাটে বড় বড় গুদাম ঘর ছিলো। হাটে কামার, কুমার, স্বর্ণকারসহ বিভিন্ন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ছিলো। সপ্তাহে দু'দিন হাট বসত। হাটে প্রচুর লোকের সমাগম হত। হাটকে কেন্দ্র করে দেশী বিদেশী বহু বানিজ্যিক সওদাগরী নৌকা আসত নিয়মিত।

তালতলী নদীতে প্রচন্ড খড়স্রোত থাকায় পঞ্চম দশকের প্রথম দিকে নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ে হাটটি। হাটের দোকানগুলো নদীর ভাঙ্গনে বিলীন হতে থাকে এবং হাটের গুরুত্ব কমতে থাকে। ইতোমধ্যে চারদিকে নূতন কয়েকটি হাট বসে। বাটনা গ্রামে পশ্চিমে এগুয়ে জনাব গণি মল্লিক হাটটি পুণঃস্থাপনের জন্য জমি প্রদান করেন। খালের পাশে এই জমিতে হাটটি স্থানান্তর করে পুনঃস্থাপন করা হয়। কিন্তু নাম আমিরগঞ্জই থেকে যায়। স্থানান্তরিত হাটটি আর জমজমাট হয় নি। সপ্তাহের রবিবার ও বৃহস্পতিবার হাট বসে। ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি বছর হাট ইজারা দিয়ে তা থেকে ৮/১০ হাজার টাকা পেয়ে থাকে। কিন্তু আজ অবধি হাটের উন্নতিকল্পে কোন কাজ হয় নি। কোন স্টল নির্মিত হয় নি। স্বল্প কয়েকখানা মুদি ও চায়ের দোকান নিয়ে হাটটি কোন রকম চলে আসছে। একটা জনাজীর্ণ ঔষদের দোকান আছে। স্বল্পকালীন খোলা থাকে। হাটটি পরিচালনার জন্য একটি কমিটি আছে। জানা গেল হাটের জমি নিয়ে কোন্দল । খোলা আকাশের নীচে রাস্তার উপরেই হাট বসে। কোতয়ালী ও বাবুগঞ্জ থানার মাঝখানে পল্লীতে হাটটি অবস্থিত। পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ আছে তবুও

লোকজন নিরাপত্তার অভাব বোধ করে থাকে। শহরের যোগাযোগ রক্ষার জন্য টেলিফোন এবং ১টি পুলিশফাড়ীর প্রয়োজন। এছাড়া বরিশাল টেক্সটাইল মিল্‌স থেকে আমিরগঞ্জ হয়ে বাবুগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তাটি পাকা হলে ৫০/৬০ হাজার লোক যাতায়াতে উপকৃত হত। এলাকাটিতে প্রচুর পান, কচু, আখসহ তরিতরকারী উৎপাদন হয়ে থাকে, যা থেকে এলাকার আর্থ সামাজিক অবস্থা আরো ভালো হতো।

তাঁতী সম্প্রদায়

বাটনা গ্রামে আমিরগঞ্জ হাটের পাশেই তাঁতী সম্প্রদায়ের বসবাস। শায়েস্তাবাদ ইউনিয়নে প্রাচীনকাল থেকে তাঁতীদের বসবাস ছিলো। তৎকালে তাঁতীরা এ এলাকায় যথেষ্ট প্রসিদ্ধ ছিলো। ১৯৪২ সালে নদী ভাঙ্গনে তাঁতীদের জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। সর্বনাশা নদী ভাঙ্গনে পতিত তাঁতী সম্প্রদায় চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের বাটনা গ্রামে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তাঁতের কাজ চালালেও বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে এসেও তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন আনতে পারি নি। এখানেই প্রায় ৫৫ বছর যাবত তাঁতের কাজ করছে। সরকারীভাবে কোন সুযোগই তারা লাভ করে নি। আর্থ-সামাজিক অবস্থা খারাপ থাকায় নিজেরাও কোন সমিতি গঠন করে কোন তহবিল গঠন করতে সক্ষম হয় নি। আধুনিক যন্ত্রপাতির ছোঁয়া এখানে লাগে নি এতটুকু। সরকারী পর্যায়ে বহু কর্মকর্তা এসেছে, জরীপ করেছে, অনেকে আশ্বাস দিয়েছে কিন্তু কোন প্রকার সহযোগিতা আজও তারা পায় নি।

বর্তমানে প্রায় ২৫ ঘর তাঁতী এখানে বাস করে। ৫০ খানা তাঁত চালু আছে। বেশকিছু তাঁত বন্ধ হয়ে আছে। এখানে গামছা তৈরী হয়, যা বরিশালের অন্যান্য এলাকার চেয়েও উন্নতমানের। সূতার দাম বৃদ্ধি ও অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ করতে না পারায় তাঁতগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শহরের সাথে এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল না। তাঁতী সম্প্রদায় বর্তমানে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন। আধুনিকতার ছোঁয়া না থাকায় ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে যাচ্ছে।

তালতলী সেতু

প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শায়েস্তাবাদ ইউনিয়নটি চারদিক নদী বেষ্টিত একটি ব-দ্বীপ। বরিশাল শহর সংলগ্ন চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের মূল ভূ-খন্ড হতে তালতলী নদী দ্বারা ইউনিয়নটি বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। শায়েস্তাবাদ ইউনিয়নের বৃহত্তর রাস্তাটি চর আইচা থেকে শায়েস্তাবাদ হাটখোলা পর্যন্ত পিচ ঢালাই (১৯৯৫-৯৬) হয়েছে। এ রাস্তায় বর্তমানে রিক্সা ও বেবীটেক্সী যাতায়াত করে। এ ইউনিয়নসহ উত্তরাঞ্চলের হাজার হাজার জনসাধারণ, চাকরিজীবী নদী পার হয়ে প্রতিদিন বরিশাল শহরে যাতায়াত করে। বরিশাল তথা এ অঞ্চলের কৃতি সন্তান জনাব আব্দুর রহমান বিশ্বাস ১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদের স্পীকার এবং গণ-প্রজাতন্ত্রী

বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তাঁর প্রচেষ্টায় এ অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবী তালতলী নদীতে সেতু নির্মাণের প্রকল্প অনুমোদ লাভ করে।

১৫২.৪০ মিটার দৈর্ঘ্য এই বেইলী সেতুটি গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ (২৫শে মাঘ-১৪০১ খৃঃ) নির্মাণ কাজ শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকালে বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রীসহ বেশ কয়েক জন মন্ত্রী, উর্ধতন কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সেতুর নির্মাণ কাজ খুব ধীর গতিতে চলছে।

বেলী সেতুটি নির্মাণের ফলে বরিশালের উত্তরাঞ্চলের জনসাধারণের চলাচলের সুবিধাসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।

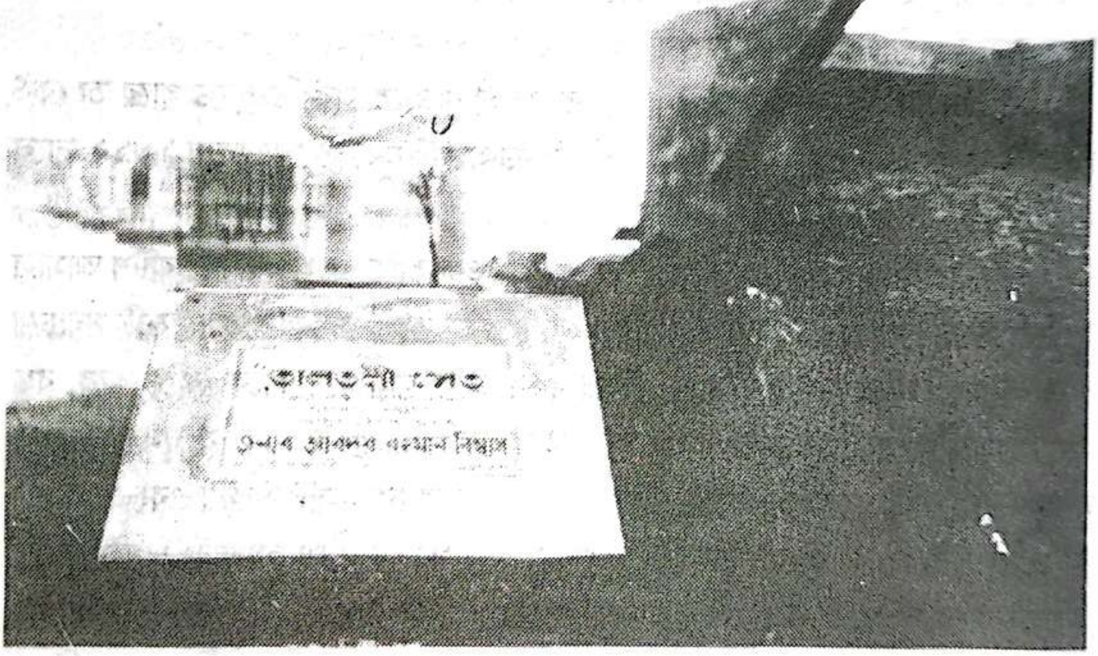

নির্মানাধীন তালতলী সেতু ❑ ছবি লেখক

হত্যাকান্ড

বহু পূর্ব হতে কোতয়ালী থানার চরবাড়ীয়া ও শায়েস্তাবাদ ইউনিয়নে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন সংক্রান্ত মামলা অন্য এলাকার চেয়ে অনেক কম ছিলো। স্বাধীনতার পূর্বে ৫০ ও ৬০ দশকে হিজলা, মুলাদী, মেহেন্দিগঞ্জ থানায় চুরি, ডাকাতি ও খুন হয়েছে অনেক। মামলা করতে প্রচুর লোক আসত শহরে। ওকালতি ব্যবসা তখন জমজমাট ছিলো। স্বাধীনতার পর ৭০ ও ৮০ দশকে কথিত সর্বহারা দলের নেতৃত্বের কোন্দলকে কেন্দ্র করে বাবুগঞ্জ, উজিরপুর, মুলাদী, হিজলা এলাকায় অনেকগুলো খুন হয়েছে। এ এলাকায়

দিনের বেলায় অস্ত্রের মহড়া চলত বলে শোনা যেত। এলাকার জনসাধারণ ভীত-সন্ত্রস্ত দিন কাটাত। চরবাড়ীয়ার লোকজন এলাকাকে নিয়ে গৌবরবোধ করত। এলাকার যুবকদেরকে প্রশংসা করা হতো। চরবাড়ীয়া, শায়েস্তবাদ এলাকার লোক নিরাপদ ছিল বলে প্রশংসা শোনা যেত। স্বাধীনতার পর পর চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডে দু'একটি ডাকাতি হলেও তা খুব একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে নি। ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে জমিজমা, এলাকার কোন্দল ও সংঘর্ষে কয়েকটি হত্যাকান্ড ঘটেছে।

'৯০ সাল থেকে চরবাড়ীয়া ইউনিয়নে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চরমে গিয়ে পৌঁছে এবং এতদাঞ্চলের সমস্ত ধারণা ধুলিসাৎ হয়ে যায়। এলাকার কতিপয় অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর শ্রমিক ও দিনমজুর যুবকরা চিহ্নিত সন্ত্রাসী হয়ে ওঠে। এদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপে ইউনিয়নের সর্বস্তরের মানুষই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। প্রতিপক্ষীয় বা অন্তর্দলীয় কোন্দলকে কেন্দ্র করে ১ নং ওয়ার্ডে বেশী খুন ও ডাকাতি হয়েছে।

চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের প্রাণকেন্দ্র তালতলী বাজারে ডাকাতি হ'তে পারে তা কেউ কোনদিন ভাবে নি। কিন্তু এলাকার কতিপয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী যুবকের সহায়তায় ১৯৯২ সালে বাজারে ডাকাতি সংঘটিত হয়।

ইউনিয়নের হত্যাকান্ড সম্পর্কীয় বিষয় পাওয়া তথ্যে দেখা যায় যে, বৃটিশ আমলে ১৯৩৪ সালে কাগাশুরা নিবাসী নোয়াব আলীর পরিবারের ৮ জনের হত্যাকান্ডটি সবচেয়ে হৃদয়বিদায়ক। বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে বন্ধুর সাথে সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে, বন্ধু অপর বন্ধুর পরিবারের মহিলা শিশুসহ সবাইকে বড় ঘাসকাটা দা দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় নৃশংসভাবে জবাই করে হত্যা করে। এ হত্যাকান্ডটি এলাকাকে কলঙ্কিত করে এবং এ অঞ্চলে ভীতিরও সৃষ্টি করে। খুনের মামলায় এ গ্রামের রজু মালের ফাঁসি হয় এবং ৮ জনের হয় যাবজ্জীবন কারাদন্ড। তৎকালে হত্যাকান্ড সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত ছিল। কাগাশুরা গ্রামের প্রথম বি, এ, পাস করে হুজ্জাত উল্লাহ্ পুলিশ বিভাগে চাকরি পেলে তাঁর বাড়ীর এক ব্যক্তি উক্ত মামলার আসামী ছিলো বিধায় চাকরির পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট খারাপ যাচ্ছিলো। শায়েস্তাবাদের নবাবের সুপারিশে পুলিশ সন্তোষজনক রিপোর্ট প্রদান করে।

১৯৫৭ সালে রাড়ীমহল গ্রামে উজির মাহমুদ-এর পুত্র ওয়াছিমদ্দিন হাং (৪০)-কে শহর থেকে ফেরার পথে বাড়ীর কাছেই দিনের বেলায় গলায় গামছা লাগিয়ে হত্যা করে ধান ক্ষেতের ভেতর কাদায় পুঁতে রাখে। এ হত্যাকান্ডটি ঘটায় এলাকায় জনগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পরেছিলো। বহুদিন যাবত ঘটনাটি মানুষের মুখে মুখে শোনা যেত।

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন তালতলী বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে মঠবাড়ীয়া নামক স্থানে নদীর পাড়ে বেশ কয়েকটি মৃত্যুদেহ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ গভীর রাতে বরিশাল শহর

অথবা অন্য কোথাও থেকে ধরে এনে নিঝুম এলাকা নদীর তীরে গুলী করে হত্যা করে ফেলে রাখা হয়। সকাল বেলা পথিকগণ লাশ দেখতে পেয়ে আশে-পাশে খবর নিলে জানা যায় রাতে গুলীর শব্দ পাওয়া গেছে। এ হত্যাকান্ডকে সবাই গুপ্তহত্যা বলে মনে করতো।

কাগাশুরা (আদাবাড়ী) ঝিলি নামে এক মহিলাকে একটি শিশুসহ জবাই করে কে বা কারা হত্যা করেছে কোন কিছু জানা যায় নি। মহিলা গর্ভাবস্থায় ছিলো ।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে বাটনা গ্রামের ইউ, পি, সদস্য ফজলুর রহমানকে সন্ধ্যায় হাট থেকে বাড়ী ফেরার পথে ওঁত পেতে থাকা দুষ্কৃতিকারীরা গুলী করে নৃশংশহভাবে হত্যা করে।

১৯৭৮ সালে ইউনিয়ন পরিষদে নারী লাঞ্চিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহাবাজের ইউ.পি. সদস্য আয়নাল আবেদীন-এর পুত্র আব্দুর রশিদ (২০) খুন হয়।

১৯৮১ সালে উলালঘুনী গ্রামের কুট্টি (১৮) দাসনগর বন্ধুদের সাথে বেড়াতে গেলে পুলের নিকটে কুপিয়ে হত্যা করে ।

১৯৮২ সালে উলালঘুনি (দাসনগর) আঃ মজিদ-এর পুত্র আঃ বারেক (৪০) নিজ বাড়ীতে খুন হন। রাতে ডাকাতরূপে ঘরে ঢুকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

১৯৮২ সালে চরবাড়ীয়া গ্রামের তালতলী বাজারের একটু পূর্ব পাাশে নদীর পাশে মৃত অবস্থায় অপরিচিত ১টি মৃতদেহ পাওয়া যায়।

১৯৮৪ সালে হাজী জোনাব আলী সরদারের বড় ছেলে সাবেক ইউ.পি. সদস্য মোঃ ওহাব সরদারকে বরিশাল শহর থেকে আসার সময় টলারঘাটে লোকজনের সামনে ধারালো রামদা' দিয়ে মাথা দ্বিখন্ডিত করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। মৃতদেহটি পাওয়া গেলেও মাথাটি পাওয়া যায় নি।

১৯৯৩ সালে চরবাড়ীয়া গ্রামের আকন বাড়ীর দক্ষিণ পাশে আম গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় পরিচয় হীন ১টি মৃত্যু দেহ পাওয়া যায়।

১৯৮৯ সালে চরবাড়ীয়া গ্রামের লিয়াকত আলী চৌকিদারকে হাট থেকে ফেরার পথে নৌকা ঘাঁটে ওঁত পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা নৃশংসভাবে রামদা' দিয়ে কোপিয়ে হত্যা করে।

১৯৮৯ সালে চরআবদানীর আদম আলীর পুত্র আঃ রব হাওলাদার খুন হয়েছে।

দক্ষিণ লামচরীর মোঃ ইয়াসিন আলী খানকে জমাজমি ও পারিবারিক সংঘর্ষে সময় কোপিয়ে হত্যা করে।

১৯৯৬ সালে জমাজমি দখলকে কেন্দ্র করে পূর্ব চরবাড়ীয়া গ্রামে কতিপয় সন্ত্রাসীকে ভাড়া করে আনা হয়। এ ঘটনা এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসী একত্রিত হয়ে সন্ত্রাসীদের ধাওয়া করে এবং কতিপয় সন্ত্রাসীকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। গণপিটানীতে ১জন

মারা যান এবং বিক্ষুব্ধ জনতা ৩ জনের চোখ তুলে ফেলে। এলাকার ৩০ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা চলছে।

১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চরবাড়ীয়া গ্রামের আফাজ উদ্দিন বেপারীর পুত্র মোঃ ফারুক বেপারী (১৮)-কে সন্ধ্যার পরে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। মারা যাবার কয়েক দিন পরে এইচ, এস, সি, পরীক্ষার ফল প্রকাশ পেলে দেখা যায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। ১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে । মামলা চলছে।

চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড এবং ২ নং ওয়ার্ডের পশ্চিমাংশে ১৯৯০ সালের পর হতে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তথাকথিত সর্বহারা দলের অঙ্গ সংগঠনের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। অন্তর্দলীয় কোন্দলকে কেন্দ্র করে কয়েকটি জীবনকে হারাতে হয়েছে, কয়েকজনের চোখ তুলে ফেলা হয়েছে, বহু লোক বাড়ীছাড়া হয়েছে, সর্বস্তরের লোকজন ভীতির মধ্যে কাটিয়েছে, অনেককেই বাড়ী ছেড়ে শহরে বসবাস করতে হয়েছে।

পার্শ্ববর্তী বাবুগঞ্জ থানার চাঁদপাশা ইউ, পি, চেয়ারম্যান জনাব আব্দুস সাত্তার হাওলাদার আমিরগঞ্জ হাট থেকে টেক্সটাইল হয়ে শহরে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। একদিন শহর থেকে বাড়ী যাচ্ছিলেন রিকসাযোগে । কাগাশুরা সেক্রেটারী জনাব আঃ জব্বার মিয়ার বাড়ীর কাছে পৌঁছলেই ওঁত পেতে থাকা কতিপয় অস্ত্রধারী রিকসা থেকে তাঁকে নামিয়ে বুকে রাইফেল ঠেকিয়ে গুলী করে হত্যা করে ।

১৯৯০ সালে মতাসর গ্রামের মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন তালুকদারের পুত্র মোঃ কবীর (৩০)-কে কাগাশুরা চৌমাথা থেকে অস্ত্রধারী কতিপয় যুবক ধরে নিয়ে যায়। তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানা গেলেও লাশ পাওয়া যায় নি।

১৯৯০ সালে মতাসর গ্রামের সামছুল ইসলাম লস্কর (৩৫) কে টেক্সটাইল মিলে ডিউটিশেষে বাড়ীতে আসলে বাড়ী থেকে অস্ত্রধারীরা ধরে নিয়ে হত্যা করে ।

১৯৯০ সালে সাপানিয়া গ্রামের নুরুজ্জামান তালুকদার-এর পুত্র আঃ রাজ্জাক তালুকদার (ইউ, পি, সদস্য) ৫০ কে বাড়ীর পার্শ্বেই মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায় করে বাহিরে আসার পরই ১০/১৫ জন অস্ত্রধারী তাঁকে ধরার চেষ্টা করে। দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করলেও অস্ত্রধারীরা দৌঁড়ে তাকে ধানক্ষেতের কাদা ও পানির মধ্যে পিটিয়ে হত্যা করে চলে যায়। পুরানপাড়ার বারেক বেপারীর পুত্র ইউনুছ হোসেন মোর্স্তজা (২০) কে বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে পিটিয়ে, পায়ের রগ কেটে হত্যা করে টেক্সটাইল মিলের পাশে ফেলে রেখে সন্ত্রাসীরা চলে যায়।

১৯৯৪ সালে মতাসর গ্রামের মোয়াজ্জেম হোসেন তালুকদারের পুত্র মোঃ

বেলায়েত হোসেন তালুকদার (২০)-কে হত্যা করে কে বা কারা টেক্সটাইল মিলের পাশে ফেলে রাখে। কাগাশুরা গ্রামের মিজান শরীফ (৩০) কে জনসাধারণ ধরে চোখ তুলে ফেলে। বিল্ববাড়ী গ্রামের রুস্তম আলী সিকদারের পুত্র মানিক সিকদারকে ধরে এনে কাগাশুরা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বসে দু'টি চোখ তুলে ফেলে দেয়া হয়। পুনরায় ২৫শে ডিসেম্বর/৯৭ সন্ধ্যার পরে মুকুন্দপট্টি গ্রামে রাস্তার কালভার্টের পাশে কে বা কারা খুন করে ফেলে রেখে যায়।

মুকুন্দপট্টি গ্রামে হোসেন আলী পুত্র ফজর আলীকে জীবন দিতে হয়েছে সন্ত্রাসীদের গুলীতে কিন্তু ফজর আলী একজন নিরাপরাধ ব্যক্তি। চিহ্নিত সন্ত্রাসীকে মারতে কতিপয় ভাড়াকরা সন্ত্রাসীরা ভুল করে তাকে গুলী করে হত্যা করে। পরে সন্ত্রাসীরা অবশ্য তাদের ভুল স্বীকার করেছে প্রচার পত্রের মাধ্যমে।

২০শে এপ্রিল ১৯৯৮ চরবাড়ীয়া গ্রামের আব্দুল আলী পেয়াদাকে (৮০) কে কোপিয়ে হত্যা করে কে বা কারা রাস্তার পাশে ফেলে রেখে যায়।

রাজনীতি

আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে যে, "বরিশাল আজ যা ভাবে বাংলার অন্যান্য জেলা তা আগামীকল্য ভাবে।" বরিশালে বহু রাজনীতিবিদের জন্ম। তাঁদের অবদান সর্বস্থানে সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান। তাই বরিশালের ইতিহাস একটি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের সংগ্রামের ইতিহাস। বিশ শতকের প্রথম দিকে রাজনীতি শহর কেন্দ্রিক ছিলো। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ, কৃষক-প্রজা আন্দোলন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধিকার আন্দোলন শহরভিত্তিকই অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলন শহর থেকে গ্রামে রাজনীতি ছড়িয়ে পড়ে। শহর কেন্দ্রিক রাজনীতির কিছু কারণ ছিলো যে, গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অসচ্ছল, শিক্ষার অভাব ও সমাজে তাদের মূল্যায়ন করা হতো না। রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতাহীন ছিলো। তারা আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানে তেমন কোন স্বাক্ষর রাখতে পারে নি। নিবেদিত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী সমাজে উপেক্ষিত, সারা জীবন রাজনীতি করে একজন নেতা বা কর্মী কি পায় - মিথ্যা অপবাদ ছাড়া ?

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে চরবাড়ীয়া ইউনিয়নে রাজনৈতিক সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। এ নির্বাচনে উলালঘুনি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোট কেন্দ্র হয়। এ কেন্দ্রের ভোট দেখার জন্য শহর থেকে রিকসাযোগে শেরে-বাংলা এ, কে, ফজলুল হক চরবাড়ীয়া আসেন। এ ঘটনা গৌরবের বিষয় ছিল যে সর্বজনপ্রিয় মহান নেতার পদধূলি লেগেছে এ ইউনিয়নে। এ মহান নেতাকে স্ব-চক্ষে দেখতে পেয়ে ইউনিয়নবাসী গর্ববোধ করেছে।

১৯৫৮ সালে সামরিক বাহিনী পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল এবং সারা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করায় তার কিছু প্রভাব গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন সামরিক আইন খুব কঠোরভাবে প্রতিপালন করা হতো। শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হতো, এমনকি গ্রামের কচুরিপানা ভর্তি পুকুরগুলোসহ নালা-ডোবা পরিষ্কার করা হতো। ১৯৬২ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের নামে ৮০,০০০ হাজার বি, ডি, মেম্বর নিয়ে গঠিত নির্বাচন মন্ডলীর বিষয়টিও গ্রামে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৬৫ সনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মার্শল 'ল প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান "গোলাপ ফুল" এবং ফাতেমা জিন্নাহ্ "হেরিকেন" মার্কার শ্লোগান গ্রাম মুখরিত হয়। ১৯৬৫ সালে হঠাৎ করে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া শহরে সীমাবদ্ধ না থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। গভর্ণর মোনায়েম খানের দুঃশাসনসহ বিভিন্ন ঘটনাবলী গ্রামে গ্রামে মুখরোচক হিসেবে শোনা যেত।

চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের তালতলী বন্দরে বেশ জাঁকজমকভাবে এসব ঘটনাবলী আলোচিত হতো।. শায়েস্তাবাদ, চাঁদপাশাসহ উত্তরাঞ্চলের লোকজন এ বন্দর দিয়ে চলাচল করে বিধায় লোকের সমাগম হতো। বন্দরে কয়েকটি রেডিও'র মাধ্যমে খবর শোনা যেত। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় এ বন্দরেও রাতে হেজাক লাইট জ্বালানো হতো না। কারণ গ্রামেও চলত নিষ্প্রদীপ মহড়া।

১৯৬৬ সালে ছয়দফা কর্মসূচী, ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯ আইয়ুব বিরোধী গণ আন্দোলন তালতলী তথা চরবাড়ীয়া ইউনিয়নে ছড়িয়ে পড়ে। বরিশাল শহর থেকে নেতৃবৃন্দ তালতলী বন্দরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনসভা আহবান করেন। আওয়ামী লীগের নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, আমির হোসেন আমু, আঃ মালেক খান, দেবেন ঘোষ, মহিউদ্দিন আহমেদ, ছাত্রনেতা আ, স, ম ফিরোজ উল্লেযোগ্য। ন্যাপের রাশেদ খান মেনন, অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী (বর্তমানে মন্ত্রী), মহিউদ্দিন, মজিবুর রহমান, গফুর মোল্লা উল্লেখযোগ্য।

১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ক্যান্টনমেন্টে বিচারধীন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত শায়েস্তাবাদের ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক (মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবিদ) গুলীতে আহত হবার বিষয়টি এ অঞ্চলে বেশ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবকে মুক্তির আন্দোলন, চরবাড়ীয়া ইউনিয়নে সভা এবং মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। চরবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব আবুয়াল ইসলাম খানের নেতৃত্বে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এলাকায় রাস্তায় রাস্তায় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং মুজিবের মুক্তির শ্লোগান প্রদান করা হতো। '৬৯-এর গণ আন্দোলনে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

বরিশালের কৃতি সন্তান সর্বজন শ্রদ্ধেয় আব্দুর রহমান বিশ্বাস প্রদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হন এবং পূর্ব পাকিস্তানের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী (শিক্ষা) ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে মন্ত্রী, স্পীকার ও রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রায়ই শায়েস্তাবাদ নিজ বাড়ীতে তালতলীবন্দর দিয়ে যাতায়াত করতেন এবং তালতলী এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণ রাজনৈতিক কথাবার্তা তার কাছ থেকে শোনাতে পেত। আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী, নবম সেক্টরের এডজুট্যান্ট, সাবেক এম, পি, আওয়ামী লীগ নেতা ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হকসহ আরো বেশ কিছু নেতৃবৃন্দ তালতলী দিয়ে আসা-যাওয়া করায় এলাকার জনগণ তাঁদের কাছ থেকে রাজনৈতিক বিষয় কথাবার্তা শোনতেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময় বহু রাজনীতিবিদ চরবাড়ীয়া এসেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বজনাব নিরোদ বিহারী নাগ, আমিনুল হক চৌধুরী, ইউসুফ হোসেন হুমায়নু, মোঃ আনোয়ার হোসেন মঞ্জু (মন্ত্রী), মতিয়ার রহমান(মন্ত্রী), ডঃ কামাল হোসেন (মন্ত্রী), আব্দুর রব সিনিয়াবাদ(মন্ত্রী), আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ্ (চীফ হুইফ), মোঃ নাসিম (মন্ত্রী), বি, চৌধুরী (মন্ত্রী), সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ।

পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন ও ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন গ্রামাঞ্চলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা ফিরে আসে। ১৯৭০ সনে সাধারণ নির্বাচনে জনগণ ভোট প্রদান করে নতুন স্বাদ পায় রাজনৈতিক অঙ্গণে। এলো বর্বর পাকিস্তনীদের অত্যাচার, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, প্রতিহত করলো মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ইউনিয়নের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে উঠে। তালতলী বন্দরে দলিল উদ্দিন হাওলাদার, ইসমাইল হোসেন ও মতলেব আলী সর্বসময় দেশের রাজনৈতিক খবরাখবর রাখতেন। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে তেমন কোন নেতা তৈরী না হলেও এরা এলাকার বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। আওয়ামী লীগের উল্লেখযোগ্য নেতা হলেন সর্বজনাব সৈয়দ জাফর আলী, আবুয়াল ইসলাম খান, মোহাম্মদ আলী খান, কাজী হাবিবুর রহমান, মোখলেছুর রহমান, আঃ মালেক হাং, নজরুল ইসলাম, ইকবাল মৃধা, মাহতাব উদ্দিন সুরুজ ও মোঃ জাহাঙ্গীর। বি, এন, পি'র সর্বজনাব খালেকুজ্জামান, মোঃ মজিবুল হক, আজাহার আলী খান, ছত্তার নেগাবান, সোহরাব নেগাবান, আলতাফ হোসেন গোলদার, সাইফুল ইসলাম আব্বাস, জিয়াউল ইসলাম সাবু, রফিকুল ইসলাম ও মোর্শেদ বাবুল। সবচেয়ে গর্বের বিষয় হলো আমাদের ইউনিয়নে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কোন প্রকার কোন্দল, রেষারেষি নেই বা প্রতিহিংসামূলক কোন ঘটনা আজ পর্যন্ত ঘটে নি। যে যে পার্টি করে না কেন সবাই সহ অবস্থানে বিশ্বাসী। ভবিষ্যতেও যেন যে-কোন সংঘাত এড়িয়ে এমনিভাবে পাশাপাশি অবস্থান নিয়ে দলীয় বক্তব্য পেশ করেন এটাই সকলের কাম্য।

চরবাড়ীয়া - একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ জনপদ

চরবাড়ীয়া একটি জনপদের নাম। সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামল বাংলার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাকৃতিক সম্পদ ও সমহিমায় উজ্জ্বল চরবাড়ীয়ায় যুগে যুগে জন্ম নিয়েছে মহান.মানব সন্তানেরা। তাঁরা রেখে গেছেন তাঁদের শৌর্য-বীর্য ও কীর্তির স্বাক্ষর। তবু সময়ের বিবর্তন ও চাহিদার প্রেক্ষাপটে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে সক্ষম হচ্ছে না এ চরবাড়ীয়া। এ জন্য প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে-কোন প্রকার বৈষম্য ভুলে সবাই এগিয়ে এসে হাতে হাত রেখে একযোগে কাজ করার।

ইতিহাসের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে সামান্য স্বার্থপরতা, প্রতিহিংসা-পরায়ণতা ও পরশ্রীকাতরতা পরিহার করে নিজকে ও সমাজের উন্নতিকল্পে এগিয়ে এসে সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাবার শপথ গ্রহণ করি।

শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা চরবাড়ীয়ার জনগোষ্ঠির অগ্রযাত্রার লক্ষ্যে সহায়ক কতিপয় প্রস্তাবসহ সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলঃ-

❒ গোটা চরবাড়ীয়াভিত্তিক একটি শিক্ষা ট্রাস্ট গঠন করা ।
(উচ্চতর পেশাভিত্তিক শিক্ষা সহয়তার জন্য)

❒ গোটা চরবাড়ীয়াভিত্তিক একটি কল্যাণ তহবিল গঠন করা ।
(সমবায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা)

❒ একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা ।

❒ তালতলী নদীতে একটি ব্যাপকভিত্তিতে মৎস্য চাষ প্রকল্প গড়ে তোলা।

❒ বেকার যুবকদের মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী, ডেয়ারীসহ বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য ১ টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

❒ টাইপ-রাইটার ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

❒ চিত্তবিনোদনের জন্য তালতলী এলাকায় একটি খেলার মাঠ তৈরী করা।

❒ ব্যাপকভাবে একটি ক্রীড়া সংগঠন গড়ে তোলা।

❒ শহীদদের গণকবর সংরক্ষণসহ ইউনিয়ন পর্যায়ে ১ টি শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠা করা।

❒ এলাকার মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

❒ মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ, আহত এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের নামে রাস্তার নামকরণ করা।

উল্লেখিত কার্যক্রম পরিচালনা এবং ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণের নিমিত্তে চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে "তালতলী বাজার"কে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা।

লেখক পরিচিতি

পহেলা জুলাই উনিশ শ' ছাপান্ন সনে বরিশাল জেলাধীন সদর থানার চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের চরবাড়ীয়া গ্রামে আলহাজ্ব আবদুল মন্নান জন্ম গ্রহণ করেন। শহীদ আব্দুর রহমান খান ও মোছাঃ রাহেলা খাতুন-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতামহ মুন্সী আলী আজিম খানও স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন বরিশাল সেচ প্রকল্পে অফিস সহকারী হিসেবে ১৯৭৭ সনে জানুয়ারী মাসে প্রথম চাকরিতে যোগদান করেন। পাঁচ বছর চাকরি করার পর ১৯৮২ সনে জানুয়ারী মাসে সৌদি আরব গমন করেন। দু'বছর কোরিয়ান কোম্পানী এবং তিন বছর রয়েল সৌদি এয়ার বেইজ-এর অপারেশন মেইনট্যানেন্স ডির্পাটমেন্টে চাকরি শেষে দেশে আগমন করেন। কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে ১৯৮৮ সনের জানুয়ারী থেকে ঢাকার উদয়ন প্রেসে চাকরিতে যোগদান এবং ঐ বছরই জুলাই থেকে খুলনা বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ে স্টেনো-টাইপিষ্ট হিসেবে যোগদান করে কম্পিউটার সেলে দীর্ঘদিন কর্মরত থাকার পর ২৬শে আগস্ট ১৯৯৮ থেকে বরিশাল বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় কর্মরত আছেন। খুলনার "দৈনিক পূর্বাঞ্চলে" কম্পিউটার সেলে কিছুদিন পারটাইম কর্ম সম্পাদন করেছেন। সত্তর দশকে "মিতালী যুব সংঘের" উদ্যেগে আয়োজিত বেশ কয়েকটি মঞ্চ নাটকে অভিনয় করেছেন। বর্তমানে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত রয়েছেন। কম্পিউটার বিষয়ে দু'টি লেখা খুলনা বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ের ত্রৈমাসিক 'মুখপত্রে' প্রথম প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৮২ সনে পবিত্র হজব্রত পালন। সহধর্মিণী মিসেস্ আলমতাজ এবং বাপ্পী, রাব্বী, আলবি পুত্র ও কন্যা।